প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় প্রাণীবিদ্যা

সাম্মানিক স্তর

পাঠ্যক্রম : পর্যায়

EZO 13 : 1

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	ড. বিভাস গুহ
একক 2	ড. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	ড. বিভাস গুহ
একক 3	ড. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	ড. বিভাস গুহ
একক 4	ড. ডালিয়া মুখার্জি	ড. বিভাস গুহ
একক 5	ড. ডালিয়া মুখার্জি	ড. বিভাস গুহ
একক 6	ড. জয়ন্ত কুমার দাস	ড. বিভাস গুহ
একক 7	ড. সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	ড. বুদ্ধদেব মান্না

পাঠ্যক্রম : পর্যায়

EZO 13 : 2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 9	ড. প্রদ্যুৎ কুমার মেদ্দা	ড. সুকন্যা সিন্‌হা
একক 10	ড. প্রদ্যুৎ কুমার মেদ্দা	ড. সুকন্যা সিন্‌হা
একক 11	ড. প্রদ্যুৎ কুমার মেদ্দা	ড. সুকন্যা সিন্‌হা
একক 12	ড. প্রদ্যুৎ কুমার মেদ্দা	ড. সুকন্যা সিন্‌হা
একক 13	ড. দীপক কুমার সোম	ড. সুকন্যা সিন্‌হা
একক 14	ড. সুকন্যা সিন্‌হা	ড. বিভাস গুহ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EZO – 13

প্রাণ শারীরবিদ্যা ও প্রাণ রসায়ন বিদ্যা

পর্যায় : 1 — প্রাণ শারীরবিদ্যা

একক 1 ❑ দেহজ তরল ও তার সংবহন 7-15

একক 2 ❑ অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক 16-27

একক 3 ❑ শারীরবৃত্তীয় শ্বসন 28-39

একক 4 ❑ রেচন 40-57

একক 5 ❑ স্নায়বিক সংবেদন 58-71

একক 6 ❑ প্রাণীদের চলন 72-79

একক 7 ❑ দৃষ্টি 80-86

পর্যায় : 2 — প্রাণ রসায়নবিদ্যা

একক 9 ❑ কোষের রাসায়নিক উপাদানসমূহ 87-97

একক 10 ❑ উৎসেচক 98-110

একক 11 ❑ কার্বহাইড্রেট বিপাক 111-139

একক 12 ❑ লিপিড বিপাক 140-160

একক 13 ❑ প্রোটিন বিপাক ও ইউরিয়া চক্র 161-183

একক 14 ❑ জৈব জারণ, ইলেকট্রন পরিবহণ শৃঙ্খল; অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন 184-196

একক 1 ☐ দেহজ তরল ও তার সংবহন

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
1.2 দেহজ রসের প্রকারভেদ
1.3 দেহজ তরলের বিবরণ
1.3.1 তরল প্রকোষ্ঠ ও তরল সাম্য
1.3.2 জল
1.3.3 তড়িৎ বিশ্লেষ্য
1.3.4 লসিকা এবং ইন্টারস্টিশিয়াল তরল
1.3.5 প্লাজমা বা রক্তরস
1.3.6 অন্যান্য ইন্টারস্টিশিয়াল তরল
1.3.6.1 সেরিব্রোস্পাইনাল তরল
1.3.6.2 পেরিকার্ডিয়াল তরল
1.3.6.3 পেরিলিম্ফ এবং এন্ডোলিম্ফ
1.3.6.4 পেরিটোনিয়াল তরল
1.3.6.5 সাইনোভিয়াল তরল
1.4 দেহজ তরলের সংবহন
1.4.1 সাধারণ আলোচনা
1.4.2 দেহজ তরলের সঞ্চালন
1.4.2.1 রক্তরস ও অন্তর্কোষীয় প্রকোষ্ঠে তরলের সঞ্চালন
1.4.2.2 অন্তর্কোষীয় প্রকোষ্ঠ ও আন্তর্কোষীয় স্থানের মধ্যে তরলের সঞ্চালন
1.5 প্রশ্নাবলি
1.6 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

জীবদেহের অন্যতম প্রধান সংগঠক বস্তু জল। দেহ অভ্যন্তরে জল বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান থাকে। দেহ আভ্যন্তরস্থ এই জল এবং তার মধ্যে দ্রবীভূত বস্তুসমূহকে দেহরস (body fluid) বলে। দেহজ রস কোষের অভ্যন্তরে বা কোষের বাইরের পরিবেশ উভয় স্থানেই থাকতে পারে। এই রস কোষের অভ্যন্তরে থাকলে তাকে আন্তর্কোষীয় তরল এবং কোষদেশের বাইরে থাকলে তাকে বহির্কোষীয় তরল বলে। দেহজ তরলের দুই-তৃতীয়াংশই আন্তর্কোষীয় ধরনের এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ বহির্কোষীয় ধরনের। দেহজ তরলের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রকার বস্তুর — (যেমন – O_2, CO_2, আয়ন, মূলক, খাদ্য, হরমোন ইত্যাদি) দ্রুত স্থানান্তকরণ সম্ভব হয়। বর্তমান অংশে দেহজ তরল এবং অন্তঃকোষীয় স্থান ও আন্তর্কোষীয় স্থানে এই তরলের সঞ্চালন আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন —

- দেহজ তরল সম্পর্কে ধারণা।
- বিভিন্ন প্রকার তড়িৎ বিশ্লেষ্যের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব।
- দেহজ তরলের সংবহন সম্বন্ধে।
- তড়িৎ বিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থ ঘটিত রোগসমূহ।

1.2 দেহজ রসের প্রকারভেদ দেখানো হল —

দেহজ রস

অন্তর্কোষীয় তরল (ICF)	বহির্কোষীয় তরল (ECF)
(কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং দেহজ তরলের $\frac{2}{3}$ অংশই এই প্রকৃতির হয়)	(অন্তর্কোষীয় তরল বাদে বাকি সব তরলই এই প্রকৃতির এবং তা দেহজ তরলের $\frac{1}{3}$ অংশ)
	উদাহরণ : (1) ইন্টারস্টিশিয়াল তরল
	(2) রক্তরস বা Plasma
	(3) লসিকা বা Lymph
	(4) সেরিব্রোস্পাইনাল তরল
	(5) গাত্রসন্ধির অন্তর্গত তরল
	(6) সাইনোভিয়াল তরল
	(7) অ্যাকুয়াস হিউমার (Aqueous humor)
	(8) পেরি এবং এন্ডোলিম্ফ
	(9) পিউরাল তরল
	(10) পেরিকার্ডিয়াল তরল
	(11) পেরিটোনিয়াল তরল
	(12) গ্লোমেরিউলাস পরিস্রুত তরল ইত্যাদি।

1.3 বিভিন্ন প্রকার দেহজ তরলের বিবরণ

1.3.1 তরল প্রকোষ্ঠ এবং তরল সাম্য (Fluid compartments and Fluid balance)

বিভিন্ন প্রকারের দেহজ তরল দেহ অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে। এই প্রকোষ্ঠ একটি ক্ষুদ্র কোষ থেকে শুরু করে বড় রক্তবাহ বা হৃৎপিণ্ডের মতো আকৃতি বিশিষ্টও হতে পারে। যদিও দেহজ তরল নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকে তবুও মনে রাখতে হবে যে প্রকোষ্ঠ থেকে প্রকোষ্ঠান্তরে এই দেহজরস অবিরামে চলমান অবস্থা বজায় রাখে। আদর্শ অবস্থায় বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত তরলের পরিমাণে সামান্য উভমুখী, পরিবর্তন সাপেক্ষে মোটামুটি একইরকম। যে শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি এই ঘটনা ঘটায় তাকে **হোমিওস্ট্যাসিস (Homeostasis)** বলে।

জল হল দেহজ তরলের প্রধান উপাদান। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে দেহের প্রয়োজন অনুসারে জল বর্তমান থাকলে আমরা তাকে তরল সাম্যাবস্থা (fluid balance) বলি। যে সমস্ত প্রক্রিয়াতে জল বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে অথবা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে নির্গত হয় তার মধ্যে অভিস্রবণ (Osmosis) প্রধান। এই জন্য তরল সাম্যাবস্থা

রক্ষার ক্ষেত্রে দেহজ তরলে অবস্থিত দ্রাব্যের (Solutes) পরিমাণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেহজ তরলে অবস্থিত দ্রাব্যের অধিকাংশই তড়িৎবিশ্লেষ্য (electrolyte) প্রকৃতির। এই কারণে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তরলের সাম্যাবস্থা এবং তড়িৎবিশ্লেষ্যের সাম্যাবস্থা একে অপরের পরিপূরক।

1.3.2 তরল

দেহের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছুর নিরিখে জল হল সবচেয়ে বড় একক উপাদান। অভিযোজন, স্বভাব এবং বাসস্থান, শারীরবৃত্তীয় অবস্থা — ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জলের পরিমাণ দেহভারের 45% থেকে 75% হতে পারে।

প্রধানত তিনটি পথে দেহের অভ্যন্তরে জল প্রবেশ করে বা জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এগুলি হল — (1) জলপান (ingested liquid), (2) খাদ্যগ্রহণ (ingested food) এবং (3) দেহের বিপাকীয় যজ্ঞ (Catabolism বা metabolic water)। যে পথে জল দেহের বাইরে নির্গত হয় সেগুলি হল (1) বৃক্ক (Kidney), (2) ত্বক (Integument), (3) ফুসফুস (Lung) এবং (4) খাদ্যনালি।

বিপাকীয় বা শারীরবৃত্তীয় কারণে শরীরে জলের পরিমাণ কম হলে (বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে) যে তৃষ্ণার উদ্রেক হয়, প্রাণী বিভিন্নপথে সেই জলগ্রহণে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে অ্যালডোস্টেরন এবং ADH-এর মাধ্যমে শরীর থেকে নিয়ন্ত্রিত জলবিয়োগ সংগঠিত হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে বর্তমান জলের পরিমাণগত তথ্যাদি নিম্নে (Table 1) দেখানো হল —

Table 1. বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহজ তরলের পরিমাণগত তথ্যাদি।

প্রাণী	শরীর মোট জলের পরিমাণ	আন্তঃকোষীয় জল (%)	অন্তঃকোষীয় জল (%)	রক্তের পরিমাণ (%)
স্কানড্রে	76	24	52	8.5
ডগফিশ	71	13	58	6.8
বড় মাছ (মিঠাজল)	71	15	56	3.0
ব্যাং	79	22	57	5.3
কুমির	73	15	58	5.1
গায়রু	—		—	9.2
ছাগল	76	27	40	9.9

সমস্ত পরিমাপ দেহওজনের শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে নির্ণীত।

1.3.3 তড়িৎবিশ্লেষ্য

বিভিন্ন তড়িৎ-বিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থ দেহজ তরলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এছাড়াও এরা ক্যাটায়ন (^{+}Ve) এবং অ্যানায়ন (^{-}Ve) বিশ্লেষিত অবস্থায় থাকতে পারে। দেহজ তরলের সাম্যাবস্থার জন্য উপযুক্ত অভিস্রবণের উপর তড়িৎবিশ্লেষ্য রাসায়নিকের প্রভাব অতড়িৎবিশ্লেষ্য রাসায়নিকের তুলনায় বেশি। রক্তরস (Plasma), অন্তঃকোষীয় (intracellular) তরলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎবিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। এইসব তড়িৎ-বিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থ মেরুদণ্ডীদের শরীর তিনটি প্রধান কাজ করে—

(1) বিপাকীয় কাজের নিয়ন্ত্রণ,

(2) প্রকোষ্ঠ থেকে প্রকোষ্ঠান্তরে দেহজ তরলের আদান প্রদানের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ, এবং

(3) দেহের বিভিন্ন অংশে pH এর নিয়ন্ত্রণে।

বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎবিশ্লেষ্যের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব Table 2-এ দেখানো হল—

Table 2. বিভিন্ন প্রকারের তড়িৎবিশ্লেষ্যের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব

তড়িৎ বিশ্লেষ্যের নাম	অবস্থান	কাজ	যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়
K^+	প্রধানত অন্তঃকোষীয়	(1) দেহে জলের পরিমাণ নির্ধারণ (2) স্নায়ু সংবেদনের পরিবহন (3) পেশি সংকোচন (4) pH নিয়ন্ত্রণ	অ্যালডোস্টেরন
Ca^{++}	প্রধানত অন্তঃকোষীয় (দাঁত ও হাড়ের ক্ষেত্রে)	(1) রক্ত জমন (2) এক্সোসাইটোসিস (3) পেশি সংকোচন (4) দাঁত ও হাড়ের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ	প্যারাথাইরয়েড এবং ক্যালসিটোনিন হরমোন।
PO_4^-	প্রধানত অন্তঃকোষীয় (দাঁত ও হাড়ের ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রে)	(1) নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA, RNA) সংশ্লেষণ (2) ATP, GTP, CTP TTP সংশ্লেষণ	প্যারাথাইরয়েড এবং ক্যালসিটোনিন হরমোন।
Mg^{++}	প্রধানত অন্তঃকোষীয়.	উৎসেচকের কাজ নিয়ন্ত্রণ	অ্যালডোস্টেরন

তড়িৎবিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থ ঘটিত রোগসমূহ

তড়িৎবিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে মানুষের দেহে নিম্নলিখিত রোগসমূহ হতে পারে—

হাইপোন্যাট্রেমিয়া (Hyponatremia)

অতিরিক্ত প্রস্রাবে, আগুনে পোড়া ইত্যাদি কারণে শরীরের Na^+ প্রবলভাবে কমে গেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় শরীরে দুর্বলতা, মাথাধরা, নিম্নরক্তচাপ (hypotension), ট্যাকিকার্ডিয়া, সংবহন শৈথিল্য (circulatory shock) ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় Na^+ কমে গেলে মানসিক দুর্বলতা এমনকি কোমাও হতে পারে।

হাইপোক্লোরেমিয়া (Hypochloremia)

অত্যধিক বমন, প্রস্রাব, জলশূন্যতা ইত্যাদি কারণে Cl^- অতিমাত্রায় কমে গেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় পেশিসংকোচন সংক্রান্ত সমস্যা, শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা এমনকি কোমাও হতে পারে।

হাইপোক্যালেমিয়া (Hypokalemia)

চারটি প্রধান কারণে হাইপোক্যালেমিয়া হয় — (1) বমন পেটের অসুখ (diarrhoea), খাদ্য বা অন্য সূত্রে অত্যধিক Na^+ গ্রহণ এবং বৃক্কের দুর্বলতা। প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি হল — (1) পেশির খিঁচুনি, (2) মানসিক-শৈথিল্য, (3) অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ এবং (4) ECG-এর অস্বাভাবিকতা।

1.3.4 লসিকা এবং ইন্টারস্টিশিয়াল তরল

রক্তের সমস্ত অংশ কখনই কলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু রক্তের মধ্যে অবস্থিত কিছু কিছু বস্তু রক্তজালিকার (ক্যাপিলারি) বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। স্তন্যবাহের বাইরে আসার পর রক্তরসের এই অংশকে ইন্টারস্টিশিয়াল তরল বলা হয়। এই ইন্টারস্টিশিয়াল তরল এবং লসিকা প্রায় সমতুল্য। লসিকা

এবং ইন্টারস্টিশিয়াল তরলের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, এই দুই প্রকার তরলের অবস্থান। কলার অভ্যন্তরে মুক্ত অবস্থায় থাকলে এর নাম ইন্টারস্টিশিয়াল তরল, আবার লসিকানালির মধ্যে অবস্থান করলে তার নাম লসিকা।

লসিকা এবং ইন্টারস্টিশিয়াল তরলের উপাদান প্রায় সমান হলেও নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ বর্তমান।

(1) রক্তরস বা প্লাজমার তুলনায় লসিকা বা ইন্টারস্টিশিয়াল তরলে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার প্রোটিনের পরিমাণ অনেক কম। এর কারণ, বড় প্রোটিন অণু সাধারণত রক্তবাহের বাইরে আসতে পারে না।

(2) শারীরবৃত্তীয় কাজের উপর নির্ভরতা সাপেক্ষে ইন্টারস্টিশিয়াল তরল এবং লসিকায় বর্তমান লিউকোসাইট বা শ্বেতরক্তকণিকার সংখ্যা প্লাজমা বা রক্তরসের তুলনায় পরিবর্তনশীল। এর প্রধান কারণ — (a) ডায়াপিডেসিস (diapedesis) পদ্ধতিতে শ্বেতরক্তকণিকা ইন্টারস্টিশিয়াল তরলে প্রবেশ করে এবং (b) লিম্ফয়েড কলা নিজেই অদানাদার শ্বেতরক্তকণিকা (agranular WBC) তৈরির প্রধানকেন্দ্র।

(3) ইন্টারস্টিশিয়াল তরল এবং লসিকায় উপস্থিত অন্যান্য জৈবরাসায়নিক পদার্থ কোন অঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

1.3.5 প্লাজমা বা রক্তরস

রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা (platelets or thrombocytes) ছাড়া রক্তের অবশিষ্টাংশই রক্তরস বা প্লাজমা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্লাজমা এবং সিরাম তুলনীয় হলেও এক জিনিস নয়। রক্ত তঞ্চনের পরে সমস্ত দ্রাব্য পদার্থ আলাদা করে ফেললে যে অংশটুকু পড়ে থাকে, তাই সিরাম। অর্থাৎ প্লাজমাতে রক্ততঞ্চনকারী প্রোটিনসমূহ বর্তমান, কিন্তু সিরামে তারা অনুপস্থিত। প্লাজমাতে প্রায় 91.5% জল এবং বাকি 8.5% বিভিন্ন দ্রাব্য পদার্থ থাকে। এই সকল দ্রাব্য পদার্থের মধ্যে তিন প্রকার জিনিস প্রধান — (1) বিপাকীয় পদার্থ, বর্জ্যপদার্থ এবং হরমোন, (2) বিভিন্ন রকমের তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং (3) নানাধরনের প্রোটিন।

1.3.6 অন্যান্য ইন্টারস্টিশিয়াল তরল

1.3.6.1 সেরিব্রোস্পাইনাল তরল

সেরিব্রোস্পাইনাল তরল কোরয়েড প্লেক্সাস নামক স্থানে উৎপত্তি লাভ করে। এই তরল যে সমস্ত স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয় তারা হল — (1) সাব অ্যারাক্নয়েড স্থান (Subarachnoidal space), (2) মস্তিষ্ক গহ্বর এবং (3) স্পাইনাল কর্ডের কেন্দ্রীয় নালিকা (Central canal of the spinal chord)। যে স্থানগুলি সেরিব্রোস্পাইনাল তরল শোষণ করতে সক্ষম তারা হল — (1) অ্যারাক্নয়েড ভিলাই (arachnoid villi এবং (2) সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস (superior sagital sinus)।

সেরিব্রোস্পাইনাল তরল মস্তিষ্কে নানাপ্রকারের প্রয়োজনীয় পদার্থ সরবরাহ করা ছাড়াও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এই তরল বিভিন্ন প্রকার আঘাত থেকে মস্তিষ্ককে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে।

মাত্রাতিরিক্ত সেরিব্রোস্পাইনাল তরল মস্তিষ্কে জমা হলে স্থানভেদে দুইরকমের রোগের সৃষ্টি হয়।

(1) হাইড্রোসেফালাস (hydrocephalus) — মস্তিষ্ক গহ্বরে সেরিব্রোস্পাইনাল তরল জমা হলে এই রোগ হয়।

(2) বহিস্থ হাইড্রোসেফালাস (external hydrocephalus) — সেরিব্রোস্পাইনাল তরল সাব অ্যারাক্নয়েড স্থানে জমা হলে এই রোগ হয়।

1.3.6.2 পেরিকার্ডিয়াল তরল

হৃৎপিণ্ডের পেরিকার্ডিয়াম এবং এপিকার্ডিয়ামের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে পেরিকার্ডিয়াল স্থান (Pericardial space) বলে। এই স্থানে যে তরল অবস্থান করে তার নাম পেরিকার্ডিয়াল তরল (Pericardial fluid)। হৃৎস্পন্দনের সময় হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগের বিভিন্ন পর্দার মধ্যে যে ঘর্ষণ হয় পেরিকার্ডিয়াল তরল তা অনেকাংশে প্রতিহত করে ও হৃৎপিণ্ডকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

1.3.6.3 পেরিলিম্ফ এবং এন্ডোলিম্ফ

অন্তঃকর্ণের মধ্যে যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নালিকা থাকে তার অভ্যন্তরে একটি অস্থিযুক্ত নালিকা (bony labyrinth) বর্তমান। এই নালিকার মধ্যে অবস্থিত তরলকে পেরিলিম্ফ বলে। অস্থিযুক্ত নালিকার অভ্যন্তরে থাকে পর্দাযুক্ত ল্যাবিরিন্থ বা **membranous labyrinth**। এই পর্দাযুক্ত ল্যাবিরিন্থের অভ্যন্তরে যে তরল থাকে তাকে আমরা এন্ডোলিম্ফ বলি।

1.3.6.4 পেরিটোনিয়াল তরল (Peritoneal fluid)

পেরিটোনিয়াম হল মেরুদণ্ডী প্রাণীর বৃহত্তম সেরাস (serous) ত্বক যা উদরগহ্বর এবং তার মধ্যে অবস্থিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আবৃত করে রাখে। পেরিটোনিয়ামের প্যারাইটেল (Peritcal) এবং ভিসেরাল (Visceral) অংশের মধ্যে যে ফাঁকা অঞ্চল থাকে তার থেকে নাম পেরিটোনিয়াল গহ্বর (Peritoneal cavity)। এই পেরিটোনিয়াল গহ্বরে বর্তমান তরলকে পেরিটোনিয়াল তরল বা Peritoneal fluid বলে।

1.3.6.5 সাইনোভিয়াল তরল (Synovial fluid)

দুই বা ততোধিক অস্থি যে সংযোগস্থলে পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকে সাইনোভিয়াল সংযোগস্থল (Synovial joint) বলা হয়। এইরকম সংযোগস্থলে যে ফাঁকা অংশ থাকে তার নাম সাইনোভিয়াল গহ্বর (Synovial cavity)। সাইনোভিয়াল গহ্বরে এক ধরনের তরল বর্তমান থাকে, যাকে আমরা সাইনোভিয়াল তরল বলি। এই তরল প্রধানত তিনটি কাজে ব্যবহৃত হয় — (1) সংযোগস্থলে ঘর্ষণজনিত বাধা কমানো (lubrication), (2) সংযোগস্থলে বর্তমান তরুণাস্থির (cartilage) পুষ্টিসাধন এবং (3) মাইক্রোবের আক্রমণ প্রতিহত করা।

1.4 দেহতরলের সংবহন

1.4.1 সাধারণ আলোচনা (General consideration)

সামগ্রিকভাবে দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর (যেমন — O_2, CO_2, আয়ন, মূলক, খাদ্য, হরমোন ইত্যাদি) দ্রুত স্থানান্তরণের কারণেই সংবহন তন্ত্রের উৎপত্তি। যদিও ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উপরিউক্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে, কিন্তু তাতে যেমন অনেক বেশি সময় লাগে তেমনই কাজটিও হয় অপ্রতুল। সাধারণভাবে সংবহনের কথা উঠলে আমরা O_2 বা CO_2 সরবরাহের কথা ভাবি। সংবহনতন্ত্র O_2 এবং CO_2 সরবরাহ করা ছাড়াও আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে — (1) বিভিন্ন দ্রব্যের স্থানান্তকরণ, (2) দেহ তাপের উপযুক্ত সঞ্চালন এবং (3) বিভিন্ন প্রকার বলের (force) সঞ্চালন। সংবহনতন্ত্রের বল সরবরাহের কারণেই নিম্নলিখিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে —

(1) দেহাংশ বা সম্পূর্ণ দেহের চলন ও গমন এবং

(2) বৃক্কের মাধ্যমে রক্তের পরিস্রবণ।

সংবহনতন্ত্রের আরও একটি আবশ্যিক শর্ত হল এই যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাওয়ার পর সরবরাহযোগ্য বস্তুসকল সংবহনতন্ত্রের বাইরে আসবে। পক্ষান্তরে, বিভিন্নস্থানে তৈরি হওয়া এবং সরবরাহযোগ্য এইসব বস্তুগুলির সংবহনতন্ত্রে প্রবেশাধিকার থাকবে।

সাধারণভাবে তিনটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সংবহনতন্ত্রকে চিহ্নিত করা হয় —

(1) সংবহনযোগ্য তরল যেমন লসিকা এবং রক্ত,

(2) সংবেষ্টন-প্রসারণশীল পাম্পসদৃশ অঙ্গ, যেমন পরিবর্তিত রক্তবাহ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি এবং

1.4.2 দেহজ তরলের সঞ্চালন (Movement of body fluid)

1.4.2 রক্তরস এবং অন্তর্কোষীয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে তরলের সঞ্চালন (Between plasma and intercellular compartments) :

রক্তরস এবং অন্তরকোষীয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে তরলের আদান-প্রদান ক্যাপিলারি গহ্বর মারফত হয়ে থাকে। দেহজ তরলের এই ধরনের সঞ্চালন প্রধানত চারটি শারীরবৃত্তীয় বলের (physiological pressure) উপর নির্ভরশীল।

(1) রক্তের জলজ চাপ (Blood Hydrostatic Pressure, BHP),

(2) ইন্টারস্টিশিয়াল তরলের জলীয় চাপ (Interstitial Fluid Hydrostatic Pressure, IFHP),

(3) রক্তের অভিস্রবণ চাপ (Blood Osmotic Pressure, BOP) এবং

(4) ইন্টারস্টিশিয়াল তরলের অভিস্রবণ চাপ (Interstitial Fluid Osmotic Pressure, IFOP)

এই বলগুলির মধ্যে যারা তরলকে রক্তরস থেকে বার করে দেয় (BHP এবং IFOP) এবং যারা তরলকে রক্তরসের মধ্যে প্রবেশ করায় (IFHP ও BOP), তাদের বিয়োগফলকে কার্যকরী পরিস্রবণ বল বলে। ধমনিপ্রান্তে ও শিরাপ্রান্তে এই Peff-এর মান যথাক্রমে 8.3 mm Hg এবং –6.7 mm Hg (প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে)। নিম্নে বর্ণিত BHP, IFOP, IFHP এবং BOP-এর প্রকৃত মানের সাহায্যে Peff-এর মান পাওয়া যায় :

$$\text{Peff (ধমনিপ্রান্তে)} = (\text{BHP} - \text{IFOP}) - (\text{IFHP} + \text{BOP})$$
$$= (25 + 5) - (-6.3 + 28)$$
$$= 30 - 21.7 = 8.3 \text{ mm Hg.}$$
$$\text{Peff (শিরাপ্রান্তে)} = (\text{BHP} + \text{IFOP}) - (\text{IFHP} + \text{BOP})$$
$$= (10 + 5) - (-6.3 + 28)$$
$$= 15 - 21.7 = -6.7 \text{ mm Hg.}$$

এই কার্যকরী পরিস্রবণ বলের (Peff — 8.3 mm Hg) প্রভাবে রক্তরস মধ্যস্থ তরল ধমনি প্রান্তের (arterial end of the capillary) রক্তবাহ থেকে অন্তর্কোষীয় স্থানে (interstitial compartment) নির্গত হয়। শিরাপ্রান্তে (veous end of the capillary) এই Peff (–6.7 mm Hg) অন্তর্কোষীয় স্থান থেকে তরলকে রক্তবাহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। এই দুই বিপরীতমুখী Peff-এর ফলে রক্তবাহ থেকে নির্গত তরলের সমস্তটাই কখনও পুনর্শোষিত হয় না। অশোষিত তরল এবং কিছু প্রোটিন (যদি থাকে) অন্তর্কোষীয় স্থান থেকে লসিকা-ক্যাপিলারির মধ্যে প্রবেশ করে। এরপর লিম্ফোটিক নালিকা মারফত লসিকা দক্ষিণ লিম্ফোটিক নালিকায় প্রবেশ করে। শেষে সাবক্লেভিয়ান শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড অভিমুখে ধাবিত হয়। আদর্শ শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় ধমনিপ্রান্তে তরলের রক্তবাহ থেকে নির্গমন এবং শিরাপ্রান্তে সেই তরলের শোষণ তথা অবশিষ্ট তরলের লসিকা তন্ত্রের মধ্যে প্রবেশের পরিমাণ প্রায় সমান। এই সাম্যাবস্থাকে ক্যাপিলারি সংক্রান্ত স্টারলিং সূত্র (Starling's law of the capillaries) বলা হয় :

(ধমনিপ্রান্তে রক্তবাহ থেকে তরলের নির্গমনের পরিমাণ) = (শিরাপ্রান্তে ওই তরলের পুনর্শোষণ) + (অবশিষ্ট তরলের লসিকাতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ)

কোনো কারণে যদি এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় তবে অন্তর্কোষীয় তরলের (interstitial fluid) পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অবস্থার নাম ইডিমা (Edema)। উচ্চ রক্তচাপ অথবা ইনফ্লামেশন (inflammation) কিংবা উভয়কেই এই ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়।

নিম্নে ইডিমার জন্য দায়ী কারণসমূহ ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

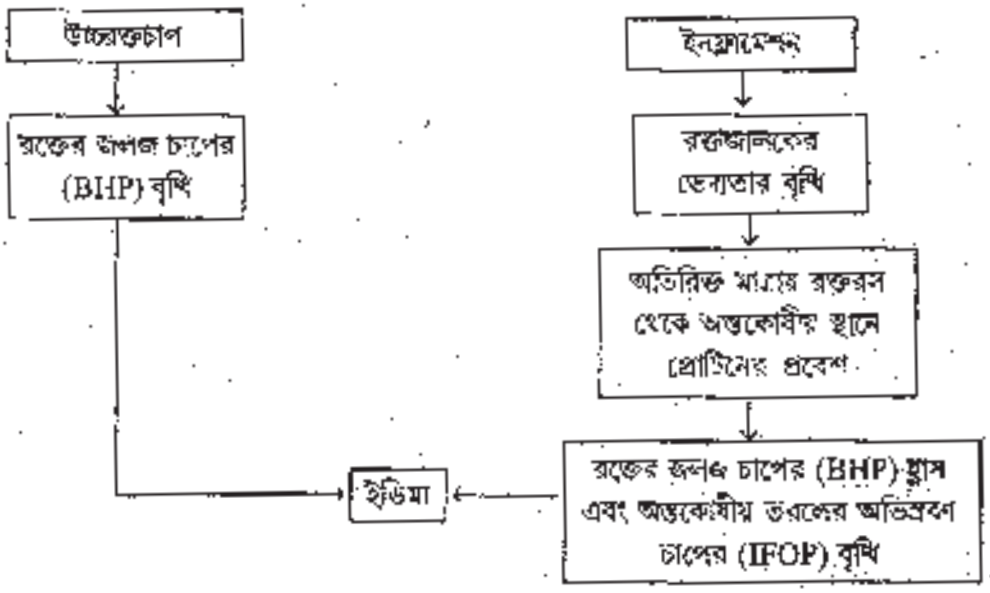

1.4.2.2 অন্তর্কোষীয় প্রকোষ্ঠ এবং আন্তর্কোষীয় স্থানের মধ্যে তরলের সঞ্চালন (Between interstitial and intracellular compartments) :

সাধারণত আন্তর্কোষীয় তরলের অভিস্রবণ চাপ (Osmotic pressure) অন্তর্কোষীয় তরলের চাপের তুলনায় বেশী হয়। অন্তর্কোষীয় তরলে উপস্থিত ধনাত্মক আয়ন হল K^- কিন্তু আন্তর্কোষীয় তরলে তা Na^+। আন্তর্কোষীয় তরলের অধিক-অভিস্রবণ চাপের ফলে কোষের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত জল প্রবেশ করলেও ওই অতিরিক্ত জল বার করে দেবার জন্য কয়েকটি বল (force) সর্বদা সক্রিয় থাকে, যা একক্ভাবে অথবা সামগ্রিকভাবে কোষ অভ্যন্তরস্থ জলকে কোষের বাইরে বার করে দেয়। কোষের ভিতরে এবং বাইরে বর্তমান K^+ এবং Na^+ এর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

দেহস্থ তরলের Na^- ঘটিত সাম্যাবস্থা অ্যালডোস্টেরন এবং ADH যৌথভাবে বজায় রাখে। নেফ্রনের ডিস্টাল কনভলিউটেড নালিকা এবং সংগ্রাহক নালিকা দ্বারা জলের পুনর্শোষণের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ADH অন্তর্কোষীয় তরলের অতিস্রবিপ্রোষ্যের ঘনত্ব (Concentration) নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে নেফ্রন দ্বারা Na^+ এর পুনর্শোষণের হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তর্কোষীয় তরলের পরিমাণ (volume) নিয়ন্ত্রিত হয়। অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে দেহ থেকে মাত্রাধিক্য পরিমাণে অন্তর্কোষীয় তরলের Na^- পরিমাণ কমে গেলে অন্তর্কোষীয় তরলের অভিস্রবণ চাপ কমে যায়। এই ঘটনার ফলস্বরূপ জল অন্তর্কোষীয় অঞ্চল থেকে আন্তর্কোষীয় স্থানে (অভিস্রবণের মাধ্যমে) প্রবেশ করে। দুটি অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের শারীরবৃত্তীয় সমস্যা এর থেকে জন্মলাভ করে।

(1) কোষের মধ্যে জলের মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য বা ওভার হাইড্রেশন-এর (overhydration) ফলে স্নায়ুতন্ত্র তার কার্যক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে হারাতে পারে। ওভার হাইড্রেশন ঘটলে ব্যবহারগত অসংগতি (disoriented behaviour), কোমা, এমনি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

(2) অপর দিকে জল অন্তর্কোষীয় অঞ্চল থেকে আন্তর্কোষীয় স্থানে প্রবেশ করার ফলে অন্তর্কোষীয় তরলের জলজ চাপ (IFHP) কমে যায়। ফলে রক্তরস রক্তবাহ থেকে আন্তর্কোষীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেই কারণে রক্তবাহে রক্তের পরিমাণ (blood volume) যথেষ্ট কমে যায়। দেহের সহ্যসীমার বাইরে চলে গেলে

রক্তসংবহনের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত (circulatory shock) হয়, যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নে রক্ত সংবহনের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ ও ফলাফল ছকের সাহায্য দেখানো হল —

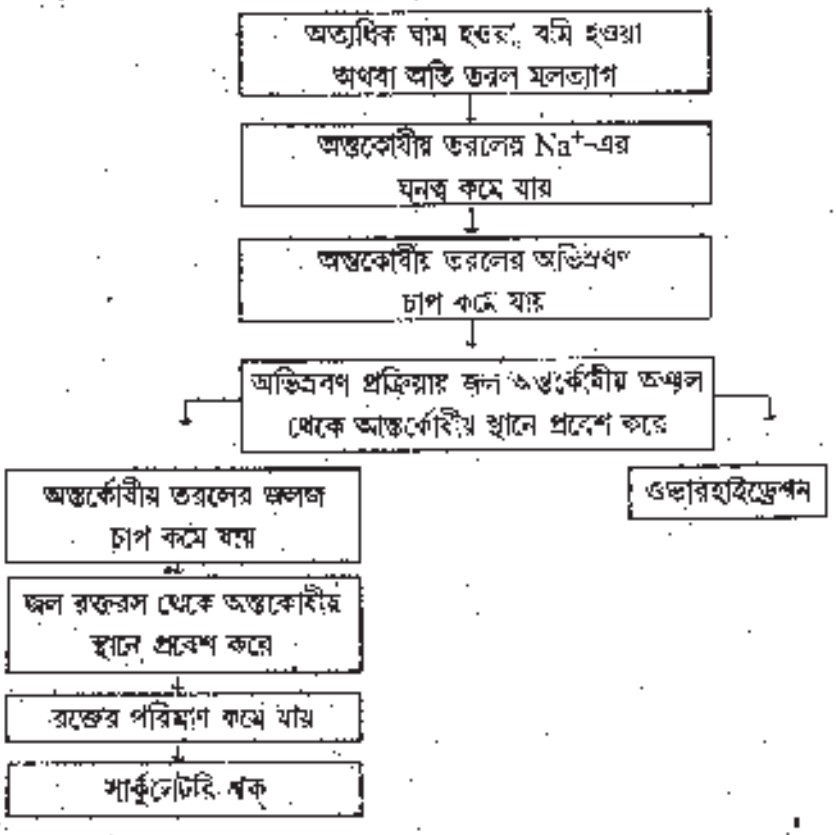

1.5 প্রশ্নাবলি

(1) দেহস্থ তরল কত রকমের লিখুন।
(2) বিভিন্ন প্রকার দেহস্থ তরলের বিবরণ দিন।
(3) দেহে জলের প্রয়োজনীয়তা লিখুন এবং বিভিন্ন প্রাণীর (মেরুদণ্ডী প্রাণী) দেহস্থতরলের পরিমাণগত তথ্য দিন।
(4) K^+, Ca^{++}, PO_4^{---}, Mg^{++} তড়িৎ বিশ্লেষ্যের অবস্থান, কাজ ও নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা করুন।
(5) টীকা লিখুন — হাইপোন্যাট্রেমিয়া, হাইপোক্লোরেমিয়া প্লাজমা বা রক্তরস, সাইনোভিয়াল তরল দেহস্থ তরলের সংবহন।
(6) প্রান্তঃকোষীয় প্রকোষ্ঠ এবং আন্তর্কোষীয় স্থানের মধ্যে তরলের সঞ্চালন বর্ণনা করুন।

1.6 উত্তরমালা

(1) 1.2 দেখুন
(2) 1.3 ,,
(3) 1.3.2 ,,
(4) 1.3.3 ,,
(5) 1.3.3–1.4 ,,
(6) 1.4.2.2 ,,

একক 2 ❐ অন্তর্কোষীয় ও বহির্কোষীয় পরিপাক

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

2.2 অন্তর্কোষীয় ও বহির্কোষীয় পরিপাক

2.2.1 অন্তর্কোষীয় পরিপাক

2.2.2 বহির্কোষীয় পরিপাক

2.3 পাচন — উৎসেচক এবং শোষণ

2.3.1 প্রোটিনের পাচন ও শোষণ

2.3.1.1 প্রোটিনের পাচন

2.3.1.2 পাচিত প্রোটিনের শোষণ

2.3.2 শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তুর পাচন ও শোষণ

2.3.2.1 শর্করার পাচন

2.3.2.2 পাচিত শর্করার শোষণ

2.3.3 স্নেহ পদার্থের পাচন ও শোষণ

2.4 পাচনের সমন্বয় প্রক্রিয়া

2.4.1 লালাগ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

2.4.2 পাকস্থলীর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

2.4.2.1 সেফালিক দশা

2.4.2.2 গ্যাস্ট্রিক দশা

2.4.2.3 ইন্টেস্টিনাল দশা

2.4.3 অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

2.4.5 ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ

2.5 প্রশ্নাবলি

2.6 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

সমস্ত প্রাণীকুলের খাদ্য তিনটি প্রধান জৈবরাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গঠিত — কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ বা ফ্যাট এবং প্রোটিন। এই তিন ধরনের খাদ্য সামগ্রী নানারকম অণুতলের হলেও সাধারণভাবে বলা যায় এগুলির আণবিক গঠন যথেষ্ট বড়। খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে গ্লুকোজ তার আণবিক ভরও কয়েক শত। স্নেহপদার্থের আণবিক ভর যথেষ্ট বেশি এবং প্রোটিনের ক্ষেত্রে তা লক্ষাধিক হতে পারে। কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে স্টার্চ এবং সেলুলোজ অসংখ্য ছোট ছোট একক (মনোস্যাকারাইড) নিয়ে গঠিত হলেও এদের আণবিক ভরের কোনো স্থিরতা থাকে না।

খাদ্য জীবদেহে তিনটি প্রধান কাজ করে — (1) শক্তির (fuel) উৎস হিসাবে, (2) দেহ গঠনের উপাদান হিসাবে (building block) এবং (3) দেহের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের উপাদান (maintenance of body)।

হিসাবে। যে কারণেই ব্যবহার হোক না কেন যে কোন খাদ্য সামগ্রীই প্রথমে ছোট ছোট উপাদানে বিভক্ত হয়ে পড়ে — একেই আমরা পরিপাক বা digestion বলি। এরপর এই ছোট ছোট উপাদানগুলি হয় দেহের বিভিন্ন অংশে আত্মস্থ (incorporated) হয়ে পড়ে অথবা বিপাকীয় পদ্ধতিতে শক্তির যোগান দেয় (metabolized to provide energy)।

2.2 অন্তর্কোষীয় এবং বহির্কোষীয় পরিপাক (Intracellular and extracellular digestion)

পরিপাক ক্রিয়া কোষের ভিতরে অথবা বাইরে এই উভয় স্থানেই হতে পারে। কোষের ভিতরে ঘটলে সেই পরিপাক ক্রিয়ার নাম অন্তর্কোষীয় পরিপাক (intracellular digestion)। যদি পরিপাক ক্রিয়া কোষের বাইরে হয় তবে আমরা তাকে বহির্কোষীয় পরিপাক (extracellular digestion) বলি।

2.2.1 অন্তর্কোষীয় পরিপাক (Intracellular digestion) :

এককোষী জীবদের ক্ষেত্রে পরিপাক ক্রিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে অন্তর্কোষীয় প্রকৃতির। প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে খাদ্য প্রথমে পরিপাক-গহ্বরে (food vacuole) প্রবেশ করে। অতঃপর কোষদেহের অন্য অংশ থেকে পাচকরস (যা পরিপাকের জন্য অত্যাবশ্যক) এই খাদ্যগহ্বরের মধ্যে নিঃসৃত হয়। প্রায় একই ধরণের অন্তর্কোষীয় পরিপাক স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। স্পঞ্জ ছাড়া অন্তর্কোষীয় পরিপাক সিলেনটেরেটা, টিনোফোরা এবং কিছু কিছু টারবেলারিয়ার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু উন্নত প্রাণীর উদাহরণ — ক্লাম (clam)-এর ক্ষেত্রে অন্তর্কোষীয় পরিপাক বহির্কোষীয় পরিপাকের সহযোগী ক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

2.2.2 বহির্কোষীয় পরিপাক (Extracellular digestion) :

অন্তর্কোষীয় পরিপাককারী জীবেরা সবসময় কোষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট বস্তুই একমাত্র খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এই অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বহির্কোষীয় পরিপাককারী প্রাণীরা একটি বিরাট সুবিধা ভোগ করে — তারা যথেষ্ট বড় খাদ্যবস্তু অনায়াসে (খাদ্যবস্তুর মাপ অবশ্য প্রাণীর দেহের আকার এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত অভিযোজনের উপর নির্ভরশীল) গ্রহণ করতে পারে। বহির্কোষীয় পরিপাক এবং অন্ত্র বা পাচনতন্ত্রের (gut or digestive system) উৎপত্তি তথা অভিযোজন পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বেশ কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে তাদের পাচনতন্ত্র একটি মাত্র ছিদ্রপথে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খাদ্যগ্রহণ (ingestion) এবং অপাচিত খাদ্যের বহিষ্কার (egestion) — এই দুইটি অত্যাবশ্যক কাজ একই ছিদ্রপথে সংঘটিত হয়ে থাকে। সিলেনটারেট, চ্যাপ্টাকৃমি, স্টিচল স্টার ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে এইরকম পাচনতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রে পাচনতন্ত্রে আংশিকভাবে দুটি ছিদ্র বর্তমান — মুখ (mouth) এবং পায়ু (anus)। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পাচনযন্ত্রে তিনটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্যের পাচন সম্পূর্ণ হয়। (1) মুখছিদ্র মারফত খাদ্যগ্রহণ (2) পাচনতন্ত্রের মধ্যে খাদ্যের মুখছিদ্রের বিপরীতমুখে চলন। এই সময় পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে খাদ্য বিভিন্ন রকমের উৎসেচকের প্রভাবে বিভিন্ন মাত্রায় পাচিত হতে থাকে। শেষে পাচিত

খাদ্যবস্তুর জলদ্রাব্য অংশ পাচনতন্ত্রের মাধ্যমে শোষিত হয় এবং অপাচিত খাদ্যাংশ পায়ু অভিমুখে যাত্রা করে, (3) পায়ু ছিদ্রের মাধ্যমে অপাচিত খাদ্যবস্তুর নির্গমন।

> এই ব্যবস্থায় মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ, পচনের প্রয়োজন পাচনতন্ত্রের মধ্যে খাদ্যবস্তুর সঞ্চালন এবং অপাচিত খাদ্যবস্তুর পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে নির্গমন — এই তিনটি কাজই পরস্পরের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘটতে পারে।

যেসব প্রাণীদের পাচনতন্ত্রে মুখ ও পায়ুছিদ্র বর্তমান তাদের মধ্যে গোলকৃমিদের (পর্ব-নিমাটোডা) পাচনতন্ত্র সবচেয়ে আদিম প্রকৃতির। এদের পাচনতন্ত্র এপিথেলিয়াম যুক্ত একটি নল মাত্র। অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণীদের (যেমন — কেঁচো) পাচনতন্ত্র নলাকার হলেও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বিশেষত্ব (specialization) দেখতে পাওয়া যায়। এই সব বিশেষ অঞ্চল খাদ্যগ্রহণ (ingestion), খাদ্য মজুত (storage), খাদ্যের খণ্ডীভবন (fragmentation), পাচন (digestion) এবং শোষণ (absorption) ইত্যাদি কাজ করে। অন্য সমস্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে পাচনতন্ত্রের মূল কার্যকরী গঠন (functional anatomy) এই ধরনের হলেও প্রজাতিভেদে নানারকম পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে বিবর্তনের পথে প্রাণীকুলের পাচনতন্ত্র অন্যান্য সব তন্ত্রের মতোই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। মানুষসহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাচনতন্ত্র প্রধানত নলাকার পাচননালি (যার মধ্যে কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়) এবং সহযোগী পাচনগ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। মুখছিদ্র এবং গলবিল (pharynx) হল পাচনযন্ত্রের প্রথম অংশ (initial component) যা সরাসরি মুখগহ্বর এবং নাসিকা গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। একটি মাংসল গ্রাসনালি (fossophagus) গলবিলকে পাকস্থলীর (stomach) সঙ্গে যুক্ত করে। পাকস্থলীতে খাদ্য কিছুক্ষণ মজুত থাকে এবং সামান্য হলেও কিছুটা পাচিত হয়। পাচনতন্ত্রের পরবর্তী অংশের নাম অন্ত্র (intestine) যা প্রজাতিভেদে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। খাদ্য পাকস্থলী থেকে প্রথমে অন্ত্রের প্রথমাংশে (small intestine) প্রবেশ করে যেখানে নানাবিধ উদ্রসেচকের প্রভাবে পাকস্থলীতে শুরু হওয়া পাচনকার্য চরম পরিণতি লাভ করে। পাচিত খাদ্যবস্তু এরপর অন্ত্রের দেওয়ালে শোষিত হয় এবং দেওয়াল ভেদ করে রক্তসংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। শোষিত না হওয়া প্রয়োজনীয় পরবর্তী পর্যায়ে অন্ত্রের পরবর্তী অংশে প্রবেশ করে যার নাম বৃহদন্ত্র (large intestine)। এখানে খাদ্যবস্তু থেকে জল এবং বিভিন্ন প্রকারের খনিজ পদার্থ (mineral) উপযুক্ত পরিমাণে শোষিত হয়। স্তন্যপায়ী ছাড়া অন্য সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃহদন্ত্র থেকে বর্জ্য পদার্থ (মল) ক্লোয়াকা (cloaca) নামক একটি গহ্বরে প্রবেশ করে যেখানে রেচন এবং জনন উভয় তন্ত্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্য (produce) সামগ্রীও প্রবেশ করে। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে বৃহদন্ত্র থেকে বর্জ্য পদার্থ পৃথকভাবে পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

খাদ্যভ্যাসের প্রকারভেদ মেরুদণ্ডীদের পাচনযন্ত্রে বেশ কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে মাংসাশী প্রাণীদের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য শাকাশী প্রাণীদের তুলনায় ছোট হয়ে থাকে। গরু, ছাগল (ruminants) ইত্যাদি প্রাণীদের ক্ষেত্রে পাকস্থলী বহুগহ্বর বিশিষ্ট হয় যেখানে উদ্ভিদজাত সেলুলোজের পাচন ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

অন্যদিকে খরগোশ, ঘোড়া ইত্যাদি শাকাশী প্রাণীরা সিকাম নামক একটি বৃহদ্রকোষ্ঠে সেলুলোজের পাচন সম্পন্ন করে। (চিত্র 2.1)

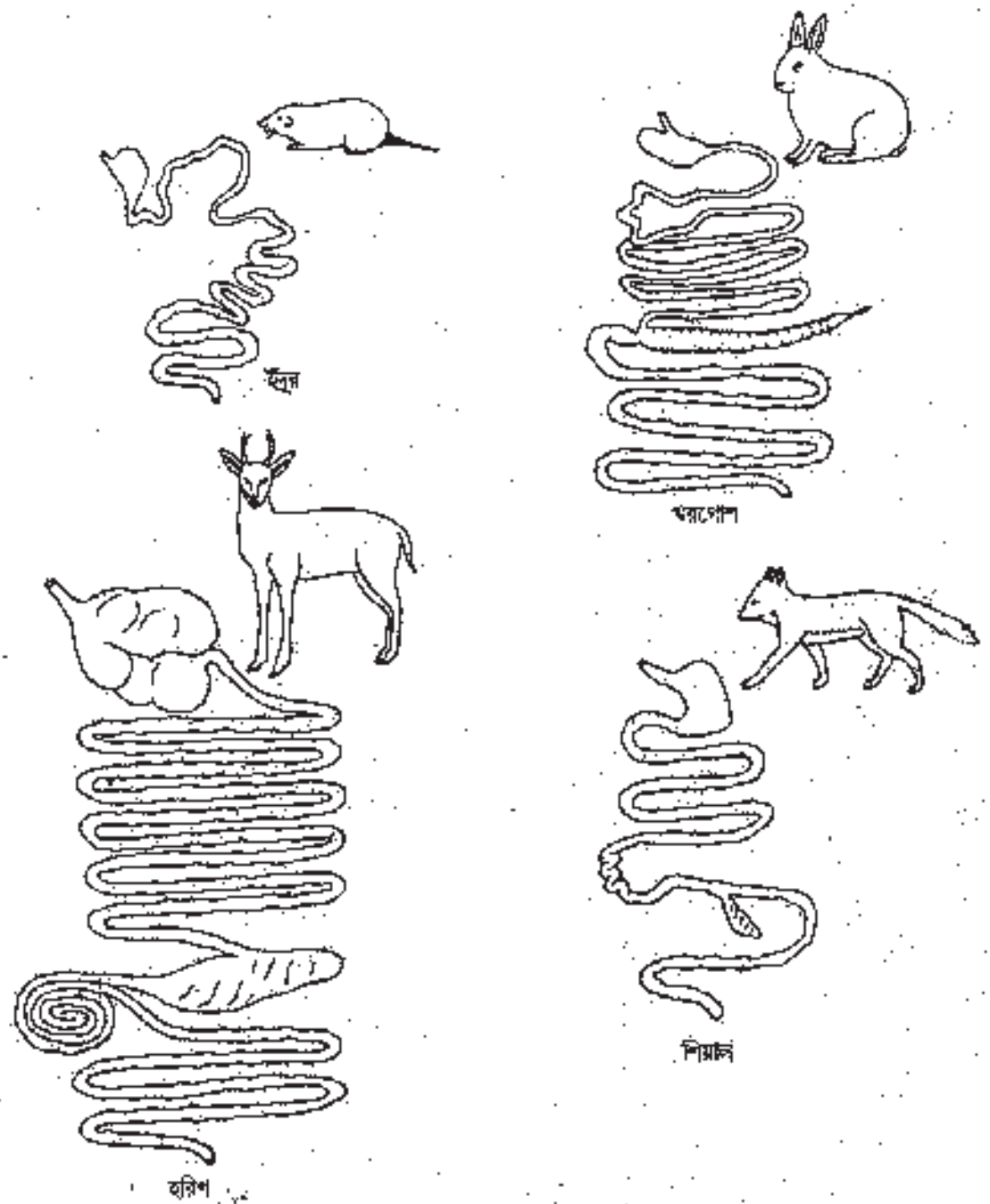

চিত্র 2.1 ঃ বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর অন্ত্রের চিত্ররূপ

পাচনে সাহায্যকারী গ্রন্থির মধ্যে যকৃৎ (liver) এবং অগ্ন্যাশয় (pancreas) প্রধান। যকৃৎ অন্যান্য অনেক কাজ ছাড়াও পিত্তরস তৈরি করে। পিত্তরস যকৃৎসংলগ্ন পিত্তথলিতে মজুত থাকে এবং তা জটিল ও নিয়ন্ত্রিত

ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্ত্রে প্রবেশ করে। পিত্তরস স্নেহজাতীয় পদার্থের পাচনের জন্য অত্যাবশ্যক। যকৃতে কোনো পরিপাককারী উৎসেচক তৈরি না হলেও অন্যান্য বেশ কয়েকটি পরিপাককারী উৎসেচক তৈরি হয় এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে তা অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পাচনকার্য সম্পন্ন করে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

2.3 পাচন-উৎসেচক এবং শোষণ (Digestive Enzymes and Absorption)

প্রায় সমস্ত খাদ্যবস্তুকে পাচনের প্রেক্ষাপটে তিন ভাগে করা যায়ঃ

(1) অতি দীর্ঘ অণু, যেমন — প্রোটিন জাতীয় খাদ্য,

(2) জল সম্পূর্ণভাবে অন্তর্বীভূত অণু, যেমন — স্নেহজাতীয় খাদ্য, এবং

(3) অতি দীর্ঘ এবং জলে অদ্রবীভূত অণু, যেমন — স্টার্চ এবং সেলুলোজ।

খাদ্যবস্তুকে শোষণ এবং ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে গেলে দুটি আবশ্যিক শর্ত পালন করা দরকার —

(1) খাদ্যবস্তুকে জলদ্রাব্য করে তোলা এবং

(2) খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত বড় ও দীর্ঘ অণুকে ভেঙে ছোট ছোট উপাদান অণুতে পরিণত করা।

প্রোটিন, স্টার্চ, সেলুলোজ ইত্যাদি খাদ্যবস্তু রাসায়নিক বিচারে অপেক্ষাকৃত সরল এবং একক উপাদানের (monomer) থেকে সৃষ্ট পলিমার (polymer), যা জলবিয়োগের (removal of water) মাধ্যমে তৈরি হয়। স্নেহজাতীয় খাদ্যবস্তু বস্তুতপক্ষে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরোলের এস্টার। এই এস্টারিভবনও প্রধানত একটি জলবিয়োগকারী রাসায়নিক বিক্রিয়া। পাচনকালে এই সমস্ত খাদ্যবস্তুকে ভেঙে ছোট ছোট উপাদানে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োজন তা অবশ্যই জলগ্রহণকারী যাকে আমরা রাসায়নিক পরিভাষায় জলবিশ্লেষণ বা hydrolysis বলি।

জলবিশ্লেষণ বা hydrolysis হল এক প্রকারের স্বতঃস্ফূর্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া যার ফলে তাপ উৎপাদিত হয়। এই বিক্রিয়া অবশ্য সাধারণভাবে অতি ধীরগতিসম্পন্ন। জৈবিক ব্যবস্থায় এই অতি ধীর রাসায়নিক বিক্রিয়াকে অতি দ্রুত সম্পাদিত করা সম্ভব। যে রাসায়নিক বস্তু এই বিক্রিয়ায় হারবর্ধক হিসাবে কাজ করে তার নাম অনুঘটক বা catalyst। জীবদেহে সৃষ্ট এই ধরনের অনুঘটককে জৈব অনুঘটক বা উৎসেচক (enzyme) বলা হয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে উৎসেচক যে কোনও ধরনের পাচনক্রিয়ার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখতে হবে যে জীবদেহে সংঘটিত যে কোনও রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধারণত উৎসেচক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রায় সমস্ত উৎসেচকই প্রোটিনজাত (বর্তমানে কিছু RNA-উৎসেচক পাওয়া গেছে)। এই সব উৎসেচকদের মধ্যে বেশ কয়েকটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম অবস্থায় পৃথক করা গেছে (isolated in pure and active form)। বিজ্ঞানীরা এইসব উৎসেচকদের উপর গবেষণা চালিয়ে এদের কার্যক্ষমতা এবং কাজ সম্পর্কিত নানা তথ্যাদি জানতে পেরেছেন। জানা গেছে যে উৎসেচকের কাজ প্রধানত যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হল — (1) সাবস্ট্রেটের সাপেক্ষে উৎসেচকের ঘনত্ব, (2) বিক্রিয়া মাধ্যমের তাপমাত্রা, (3) বিক্রিয়া মাধ্যমের pH, (4) বিভিন্ন রাসায়নিক তথা ধনাত্মক আয়ন ইত্যাদি।

2.3.1 প্রোটিনের পাচন এবং শোষণ (Digestion of protein and its absorption)

2.3.1.1 প্রোটিনের পাচন

প্রোটিন বহুসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এমন শৃঙ্খল যাঁর মধ্যে যে কোনও দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধের সাহায্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত। এই বন্ধে প্রথম অ্যামাইনো অ্যাসিডের —COOH মূলক পরেরটির – NH_2 মূলকের সঙ্গে জলবিয়োগ পদ্ধতিতে যুক্ত।

$$H_2N - R_1 - COOH + H_2N - R_2 - COOH$$

$$\downarrow$$

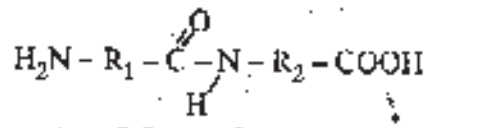

প্রোটিনের পাচনের মূল ভিত্তি হল হাইড্রোলিসিস পদ্ধতিতে এই পেপটাইড বন্ধনী ছিন্ন হওয়া। তাই প্রোটিন প্রথমে ছোট ছোট পেপটাইড (অল্পসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল) এবং শেষে একক অ্যামাইনো অ্যাসিডে ভেঙে পড়ে।

বিভিন্ন প্রোটিন পাচনকারী উৎসেচককে প্রধান দুভাগে ভাগ করা হয় — (1) যে সমস্ত উৎসেচক অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলের মুক্ত প্রান্ত থেকে পাচন শুরু করে তাদের এক্সোপেপটাইডেজ (exopeptidase) বলে। (2) অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় প্রোটিন পাচনকারী উৎসেচককে অ্যান্ডোপেপটাইডেজ (endopeptidase) বলা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে পাকস্থলীর মধ্যে প্রোটিনের পাচন শুরু হয়। পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত পেপসিন (pH 1.5 – 3.5) প্রোটিনের টাইরোসিন এবং ফেনাইল অ্যালানিনের মধ্যবর্তী পেপটাইড বন্ধনী ভেঙে দেয় এবং বড় প্রোটিনকে ছোট ছোট প্রোটিনে (Small polypeptide) রূপান্তরিত করে। পেপসিন ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করলে সেখানকার (duodenum) ক্ষারীয় pH পেপসিনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

আংশিক পাচিত প্রোটিন ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করলে অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত দুটি প্রধান উৎসেচক প্রোটিনের বাকি পাচনকার্য সম্পন্ন করে। ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন ছোট প্রোটিনগুলিকে আরও ছোট অলিগোপেপটাইডে পরিণত করে। এর পরবর্তী পর্যায়ে তিনটি উৎসেচক ছোট ছোট অলিগোপেপটাইড ভেঙে তাদের মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

(1) **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** — এই উৎসেচক —COOH প্রান্ত থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে এক এক করে আলাদা করে।

(2) **অ্যামাইনোপেপটাইডেজ** — এই উৎসেচক — NH_2 প্রান্ত থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে একে একে আলাদা করে।

(3) **ডাইপেপটাইড** — কার্বক্সি এবং অ্যামাইনোপেপটাইডেজ উৎসেচকদ্বয় কাজ করার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তা হল ডাইপেপটাইড, ডাইপেপটাইডেজ দুইটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

নিম্নে বিভিন্ন উৎসেচক, তাদের উৎপত্তি স্থান এবং সাবস্ট্রেট ও সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়াশীলতার ফলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

উৎসেচক	উৎপত্তিস্থান	আশু রাসায়নিক	উদ্দীপক	সাবস্ট্রেট	উৎপন্ন পদার্থ
পেপসিন	পাকস্থলী	পেপসিনোজেন	HCl	প্রোটিন	ছোট পেপটাইড
ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	ট্রিপসিনোজেন	এন্টেরো-কাইনেজ	প্রোটিন / পেপটাইড	অলিগো-পেপটাইড
কাইমো-ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	কাইমো-ট্রিপসিনোজেন	ট্রিপসিন	ঐ	ঐ
কার্বক্সি-পেপটাইডেজ	অগ্ন্যাশয়	প্রোকার্বক্সি-পেপটাইডেজ	ট্রিপসিন	–COOH প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিড	অ্যামাইনো অ্যাসিড

উৎসেচক	উৎপত্তিস্থান	আমি রাসায়নিক	উদ্দীপক	সাবস্ট্রেট	উৎপন্ন পদার্থ
অ্যামাইনো-পেপটাইডেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	—	—	$-NH_2$ প্রান্তিক অ্যামাইনো অ্যাসিড	ঐ
ডাই পেপ টাইডেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	—	—	ডাইপেপটাইড	ঐ

2.3.1.2 পাচিত প্রোটিনের শোষণ (Absorption of digested protein)

পাচিত প্রোটিনের শোষণ পদ্ধতি মনোস্যাকারাইডের শোষণ পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে বর্তমান শোষণে সক্ষম কোষের গাত্রে অসংখ্য সোডিয়াম নির্ভর অ্যামাইনো অ্যাসিড সহপরিবাহক বর্তমান (Na-dependent amino acid cotransporters)। এই ধরনের সহপরিবাহক অবশ্য বিভিন্ন রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতো একই পদ্ধতিতে ডাই অথবা ট্রাইপেপটাইড অণু সরাসরি কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে, রক্তে প্রবেশের পূর্বে এই ডাই অথবা ট্রাইপেপটাইডগুলি জলবিশ্লেষণ (hydrolysis) পদ্ধতিতে মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এপিথেলিয়াল কোষ থেকে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রথমে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাপনের মাধ্যমে (facilitated diffusion) ভিলাই (villi) মধ্যস্থ রক্তবাহে (capillaries) প্রবেশ করে। সবশেষে ওই সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড হেপাটিক পোর্টাল সংবহনে আসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শিশুদের ক্ষেত্রে শোষক কোষগুলি বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। এই বিশেষ ধরনের কোষ বিশেষ বিশেষ প্রোটিনকে অপাচিত অবস্থায় পিনোসাইটোসিস (pinocytosis) পদ্ধতিতে গ্রহণ এবং এক্সোসাইটোসিস (exocytosis) পদ্ধতিতে রক্তবাহে সরবরাহ করতে সক্ষম। উদাহরণ হিসাবে IgA নামক ইমিউনোগ্লোবিউলিনের কথা বলা যায়। এই IgA অণু মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশুর রক্তে প্রবেশ করে থাকে এবং শিশুকে পরোক্ষে অনাক্রম্যতা (immunity) প্রদান করে, কখনও কখনও অবশ্য অপাচিত প্রোটিন শিশুর শরীরে অ্যালার্জির মতো অবস্থা তৈরি করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের শোষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ না হলেও অংশত বিনষ্ট হয়।

2.3.2 শর্করাজাতীয় খাদ্যবস্তুর পাচন (Digestion of carbohydrate foodstuffs) এবং শোষণ (absorption)

2.3.2.1 শর্করার পাচন

সমস্ত রকমের শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাচনযোগ্য খাদ্যবস্তু হল স্টার্চ (starch)। মানব শরীরে সেলুলোজ পাচিত হয় না, যদিও খাদ্যবস্তু মধ্যস্থ অন্ত্র হিসাবে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের খাদ্যের মধ্যে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম হলেও এর পাচন প্রক্রিয়া স্টার্চের পাচন প্রক্রিয়ার অনুরূপ।

স্টার্চ মানব-শরীরে তিনটি প্রধান ধাপে পাচিত হয় (1) প্রথম ধাপে অতি দীর্ঘ স্টার্চ অণু দুই থেকে আট অণু গ্লুকোজযুক্ত অলিগোস্যাকারাইডে পরিণত হয়, (2) অলিগোস্যাকারাইড ভেঙে মলটোজ নামক ডাইস্যাকারাইডে রূপান্তরিত হয়, এবং (3) সবশেষে মলটোজ ভেঙে গ্লুকোজ অণুতে রূপান্তরিত হয় যা ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। উপরিউক্ত পদ্ধতি মুখগহ্বরে শুরু হয়ে থাকে। মুখগহ্বরে লালাগ্রন্থি নিসৃত অ্যামাইলেজ উৎসেচক স্টার্চকে ভেঙে অলিগোস্যাকারাইডে পরিণত করে। মুখগহ্বরে বিদ্যমান pH(6.8 – 7.0) অ্যামাইলেজের কার্যকারিতার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। পাকস্থলীর অভ্যন্তরে আম্লিক পরিবেশে অ্যামাইলেজ তাৎক্ষণিকভাবে বিনষ্ট হয়। এমতাবস্থাতেও পাকস্থলীতে অ্যামাইলেজ এক থেকে দু ঘণ্টা কর্মক্ষম থাকতে পারে। খাবারের মধ্যে অ্যামাইলেজের

অবস্থান একে পাকস্থলীর আম্লিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে। পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্যমণ্ড (bolus) পাকস্থলীনিঃসৃত অম্ল (HCl), পেপসিন উৎসেচক ইত্যাদির প্রভাবে যখন ভেঙে পড়ে তখনই অ্যামাইলেজের কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয় এবং অ্যামাইলেজও অন্য প্রোটিনের মতো পাকস্থলীতে পাচিত হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে স্টার্চ যখন অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত অ্যামাইলেজের (pancreatic amylase) সংস্পর্শে আসে তখনই তার পাচন শুরু হয়। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত স্টার্চ অলিগোস্যাকারাইড এবং মলটোজে রূপান্তরিত হয়। তিন বা ততোধিক গ্লুকোজ অণু সম্বলিত অলিগোস্যাকারাইডগুলির পাচন সম্পূর্ণ করে দুটি উৎসেচক। এগুলি হল যথাক্রমে ডেক্সট্রিনেস (dextrinase) এবং গ্লুকোঅ্যামাইলেজ (glucoamylase)। মলটেজ নামক উৎসেচক মলটোজকে গ্লুকোজ রূপান্তরিত করে।

মলটোজ নানারকম খাদ্যে উপস্থিত থাকলেও আমাদের খাদ্যে প্রধান ডাইস্যাকারাইড হল সুক্রোজ এবং ল্যাকটোজ। সুক্রেজ এবং ল্যাকটেজ নামক উৎসেচক যথাক্রমে সুক্রোজ এবং ল্যাকটোজকে একক শর্করা অণুতে রূপান্তরিত করে। সুক্রোজ ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ। অন্যদিকে ল্যাকটোজ ভেঙে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ তৈরি হয়। এইভাবে তৈরি হওয়া একক শর্করা অণুসকল উৎপত্তিস্থলেই তাৎক্ষণিকভাবে শোষিত হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত 4 বছর বয়স পর্যন্ত শরীরে ল্যাকটেজ তৈরি হয়। ওই সময়ের পরে ল্যাকটেজ তৈরি না হওয়ার দরুন অনেকক্ষেত্রে দুগ্ধপোষজনিত কারণে lactose intolerance diarrhoea হয়ে থাকে।

2.3.2.2 পাচিত শর্করা জাতীয় খাদ্যের শোষণ (Absorption of digested carbohydrates)

ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অবস্থিত পরিবাহী প্রোটিনের সাহায্যে মনোস্যাকারাইড অণুগুলি তাদের উৎপত্তিস্থলেই শোষিত হয়। যে সমস্ত মনোস্যাকারাইড অণু ক্ষুদ্রান্ত্রের মাধ্যমে শোষিত হয় তার প্রায় 80% হল গ্লুকোজ অণু। এই গ্লুকোজ অণু প্রকৃতপক্ষে সোডিয়াম-নির্ভর গ্লুকোজ পরিবাহীর (Na-dependent glucose transporter, SGLT) মাধ্যমে শোষিত হয়ে থাকে। ভরপেট খাদ্যগ্রহণের পর দেখা যায় যে সাধারণ অবস্থার তুলনায় দুই বা তিন গুণ গ্লুকোজ অণু তৈরি হয় এবং তা সলভেন্ট ড্রাগ পদ্ধতিতে এবং SGLT মারফত সমপরিমাণে শোষিত হয়। এইভাবে শোষিত গ্লুকোজ দেহরস তরলে প্রবেশ করার পর এই তরলের অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। এই বাড়তি অভিস্রবণ চাপের প্রভাবে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে অবস্থিত জল অবশিষ্ট গ্লুকোজ এবং অন্যান্য পরিবহনযোগ্য খাদ্য অণুসহ (transportable nutrients) টাইট জাংশন (tight junction) মারফত দেহরস তরলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।

গ্লুকোজ ছাড়া অন্যান্য মনোস্যাকারাইডের মধ্যে গ্যালাকটোজ এবং ফ্রুকটোজ প্রধান। এর মধ্যে গ্যালাকটোজ গ্লুকোজের ন্যায় SGLT মারফত শোষিত হয়। অন্যদিকে ফ্রুকটোজ সাধারণত সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাপন (facilitated diffusion) প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর অধিকাংশ ফ্রুকটোজ গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। পরিশেষে গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ এবং অবশিষ্ট ফ্রুকটোজ পুনরায় সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাপনের মাধ্যমে রক্তবাহের অভ্যন্তরে রক্তরসের সাথে মিশে যায়। এইসব রক্তবাহ থেকে আনীত রক্ত হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্রের সাহায্যে যকৃতে প্রবেশ করে। এরপর এইসকল খাদ্যবস্তুর বিপাক তথা আত্তীকরণ (metabolism and assimilation) শুরু হয়।

2.3.3 স্নেহ পদার্থের পাচন এবং শোষণ (Digestion and absorption of fat)

স্নেহপদার্থের পাচনের জন্য উপযুক্ত উৎসেচকের সাধারণ নাম লাইপেজ (lipase)। লালায় উপস্থিত লাইপেজ খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলীতে প্রবেশের পর ওই স্থানে উপস্থিত অ্যাসিডের প্রভাবে উদ্দীপিত হয় এবং সমস্ত স্নেহপদার্থের প্রায় দশ শতাংশের পাচন ঘটায়। শিশুদের ক্ষেত্রে পাকস্থলী থেকেও কিছুটা লাইপেজ নিঃসৃত

হয়। অধিকাংশ স্নেহপদার্থের পাচন অবশ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে নিঃসৃত অগ্ন্যাশয়জনিত লাইপেজের (pancreatic lipase) প্রভাবে ঘটে থাকে।

স্নেহপদার্থের জলবিদ্বেষী (hydrophobic) ধর্মের জন্য ওই পদার্থের পাচন তথা শোষণ একটু জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ডিওডিনামে প্রবেশের পর পিত্তরসে উপস্থিত লেসিথিন (একটি ফসফোলিপিড) এবং বিভিন্ন প্রকারের পিত্ত লবণের প্রভাবে স্নেহপদার্থ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ইমালসিফিকেশন ড্রপলেটে (emulsification droplets) পরিণত হয় (এদের গড় ব্যাস 1μm)।

প্রাথমিকভাবে লাইপেজ ট্রাইগ্লিসারাইডের উপর কাজ করে ওই অণু থেকে প্রথম এবং তৃতীয় ফ্যাটি অ্যাসিডগুলিকে মুক্ত করে। ফলে দুটি মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড (FFAs) এবং এক অণু মনোগ্লিসারাইড তৈরি হয়। এই মনোগ্লিসারাইড এবং অন্যান্য স্নেহপদার্থকে পিত্তরসস্থিত লবণ বিশেষভাবে ঘিরে ফেলে। এই লবণাবৃত বস্তুটি মিসেল (micelles) নামে পরিচিত যাদের গড় ব্যাস 3-6μm হয়ে থাকে। সাধারণত একটি মিসেলের মধ্যে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, মনোগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন ইত্যাদি বর্তমান থাকে। এই মিসেলগুলি অন্ত্রের এপিথেলিয়ামের গাত্রে সমস্ত স্নেহপদার্থগুলিকে উন্মুক্ত করে। এইভাবে উন্মুক্ত স্নেহপদার্থগুলি কোষপর্দার মধ্যে দিয়ে প্রায় বিনা বাধায় কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

কোষের মধ্যে প্রবেশ করার পর মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মনোগ্লিসারাইড পুনঃসংযুক্তির (resynthesis) মাধ্যমে পুনরায় ট্রাইগ্লিসারাইডে পরিণত হয়। এই ট্রাইগ্লিসারাইড সামান্য পরিমাণ কোলেস্টেরল এবং ফসফোলিপিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি পাতলা প্রোটিন আবরণীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে --- একেই আমরা কাইলোমাইক্রন (Chylomicrons) বলি যাদের গড় ব্যাস প্রায় 1μm, পলগিবস্তু এরপর কাইলো-মাইক্রনগুলিকে ক্ষরণোক্ষম থলির (secretory vesicle) মধ্যে স্থানান্তরিত করে যা কোষগাত্রে এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতিতে উন্মুক্ত হয়। এরপর কিছু কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তধারে প্রবেশ করে কিন্তু কাইলো-মাইক্রন অপেক্ষাকৃত বড় বলে তা লসিকাবাহের গাত্রে অবস্থিত ছিদ্রপথে লসিকার মধ্যে উন্মুক্ত হয়। অন্ত্র অঞ্চলের দুধবৎ লসিকা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লসিকানালির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং শেষে বাম সাবক্লেভিয়ান শিরার মাধ্যমে সাধারণ সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে।

2.4 পাচনের সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া (Coordination of digestive activity)

পাচনকার্য সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য পাচননালির বিভিন্ন অংশে যে ভিন্ন ভিন্ন উৎসেচক প্রয়োজন তার সমপোযোগী এবং সন্তুলিত মাত্রায় উপস্থিতি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাচনকার্যে অংশগ্রহণকারী অঙ্গগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্নায়বিক ও হরমোনের প্রভাবে যথাযথ কাজ করতে সক্ষম। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা পাচনযন্ত্রের অংশবিশেষগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করছি।

2.4.1 লালাগ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of salivary secretion)

খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সবসময়েই কিছু পরিমাণ লালা মুখগহ্বরে অবস্থান করে। খাদ্যগ্রহণ বা খাদ্যগ্রহণসম্পর্কিত যে কোনও কাজই এই লালার ক্ষরণকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করে। খাদ্যগ্রহণের সময় খাদ্যকণা জিহ্বার উপর অবস্থিত স্বাদ কোরকগুলিকে উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা স্নায়ু মারফত মস্তিষ্কের মেডালা অবলংগাটা এবং পনস-এর সংযোগস্থলে অবস্থিত সুপিরিয়র এবং ইনফিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াইগুলিতে পৌঁছায়। বিপরীতমুখী প্যারাসিমপ্যাথেটিক তথা অটোনমিক (parasympathetic and / or autonomic) স্নায়বিক সংবেদন প্রকৃতপক্ষে লালার নিঃসরণ ঘটায়। খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুই লালা নিঃসরণে বিশেষ উদ্দীপকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলি হল খাদ্যের গন্ধ, খাদ্যের দৃশ্য, আহত বা অনাহত স্পর্শ, খাদ্যপ্রস্তুত সম্পর্কিত শব্দ ইত্যাদি। এ সবই কোন না কোনওভাবে স্নায়ুদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

2.4.2 পাকস্থলীর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of stomach secretion)

পাকস্থলীর ক্ষরণে স্নায়ু এবং হরমোন এই দুইয়ের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনটি বিশেষ দশায় এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। যথা — (1) সেফালিক দশা, (2) গ্যাসট্রিক দশা ও (3) ইন্টেস্টিনাল দশা। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল (চিত্র 2.2)।

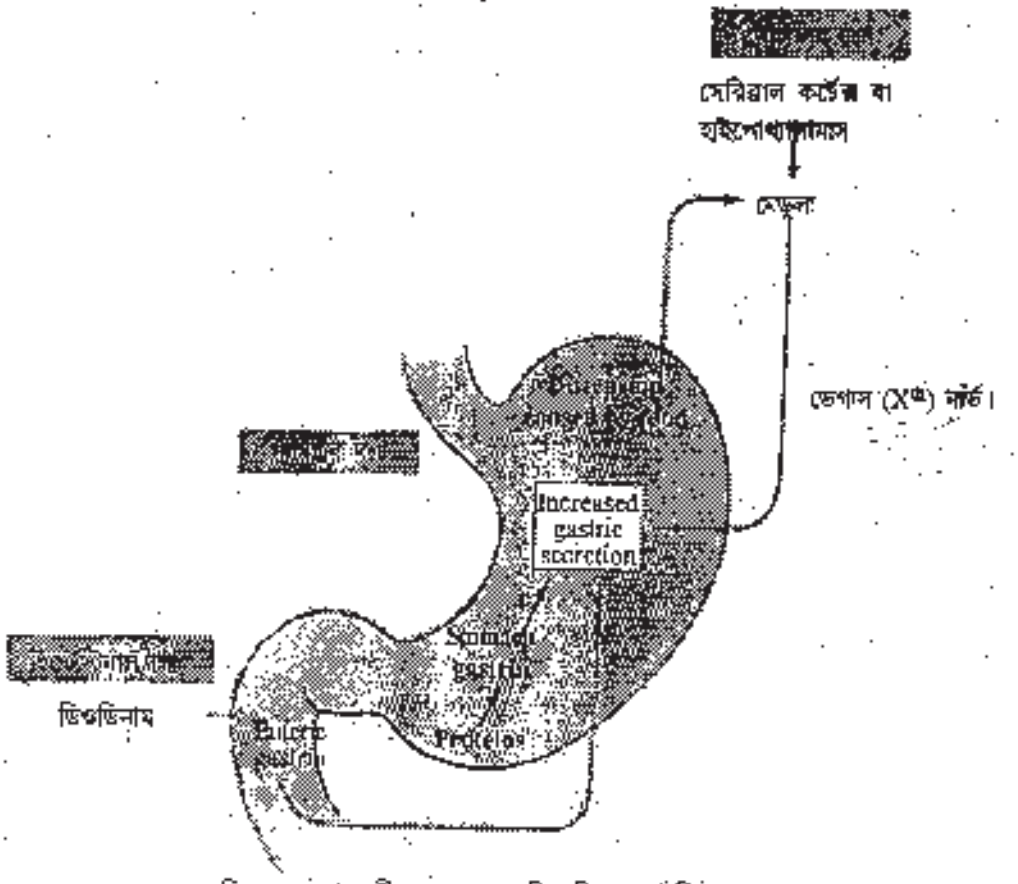

চিত্র : 2.2 পাকস্থলীর ক্ষরণের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

2.4.2.1 সেফালিক দশা (Cephalic phase)

এই দশায় খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশের প্রাক্কালে পাকস্থলীকে পাচকরসের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। খাদ্য সম্পর্কিত দৃশ্য, গন্ধ, চিন্তা এবং স্বাদ ইত্যাদি উদ্দীপকের মাধ্যমে এই দশার সূচনা হয়। সেরিব্রাল কর্টেক্স আনীত এইসব নাভীয় সংবেদন প্রথমে মেডুলা এবং অনভিবিলম্বে সেখান থেকে ভেগাস স্নায়ু মারফত পাকস্থলীর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থিতে সংবাহিত হয়। এর ফলে পাকস্থলীর ক্ষরণ বাধিত হয়।

2.4.2.2 গ্যাসট্রিক দশা (Gastric phase)

খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করার পর স্নায়ু এবং হরমোন সম্মিলিতভাবে পাকস্থলীর ক্ষরণকে চালু রাখে। এই দশাকেই গ্যাসট্রিক দশা বলা হয়। যে কোন প্রকারের খাদ্য পাকস্থলীর গাত্রে অবস্থিত সংবেদন গ্রাহক (receptor) গুলিকে যথাযথভাবে উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কের মেডালা হয়ে পাকস্থলীর গ্রন্থিসমূহকে পুনরায় ক্ষরণের পক্ষে উপযুক্ত উদ্দীপনা প্রদান করে। ফলে পাকস্থলীর ক্ষরণ অব্যাহত থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়গুলি পাকস্থলীর ক্ষরণ কমিয়ে দিতে পারে। খাদ্যে প্রোটিন তথা অ্যালকোহল থাকলে তাদের প্রভাবে পাকস্থলীতে গ্যাসট্রিন (stomach gastrin) নামক একটি হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোনের বিশেষ প্রভাবে একদিকে যেমন পাকস্থলীর ক্ষরণ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনই পাকস্থলীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পেশিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যা সামগ্রিকভাবে পাচনের পক্ষে উপযুক্ত।

2.4.2.3 ইন্টেস্টিনাল দশা (Intestinal phase)

অর্ধপাচিত খাদ্যবস্তু যখন পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে (ডিওডিনাম) প্রবেশ করে তখন ডিওডিনামের মিউকোসা থেকে এন্টেরিক গ্যাসট্রিন নামক একপ্রকার হরমোন উৎপন্ন হয়। এই হরমোনও পাকস্থলীর ক্ষরণের মাত্রা বজায় রাখতে বিশেষ সহায়ক।

2.4.3 অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of pancreatic secretion)

পাকস্থলীর ক্ষরণের ন্যায় অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণও স্নায়ু এবং হরমোন এই দুই-এর সম্মিলিত প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় (চিত্র 2.3)। পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক এবং সেফালিক দশা চলাকালে ভেগাস স্নায়ু মারফত যে সংবেদন প্রবাহিত হয় তা পাকস্থলী ছাড়া অগ্ন্যাশয়েও প্রবেশ করে। এর প্রভাবেই অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ সম্ভবপর হয়। অর্ধপাচিত খাদ্যবস্তু

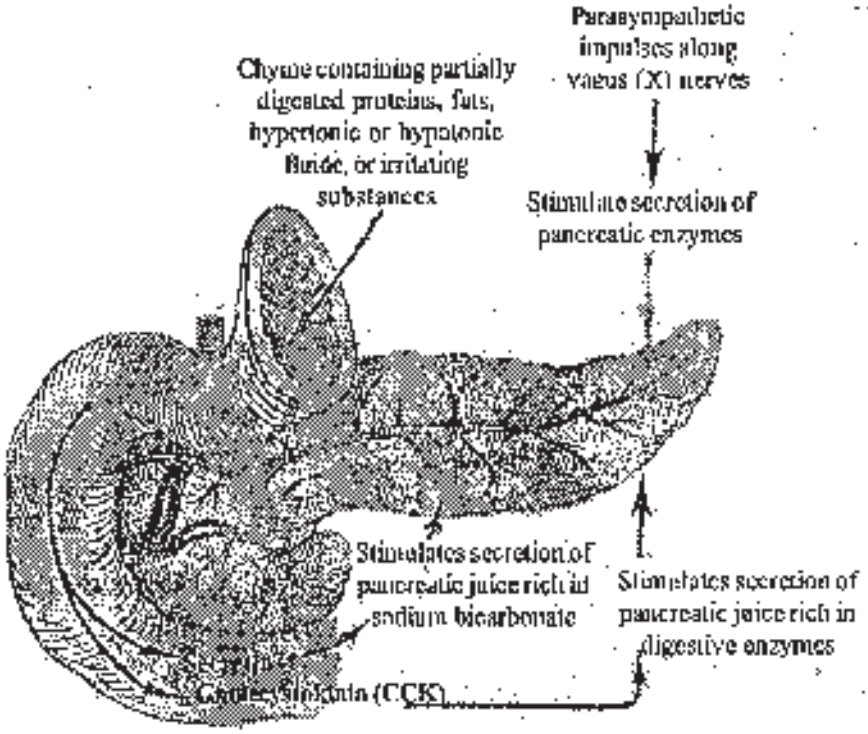

চিত্র : 2.3 অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরে ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা থেকে সিক্রিটিন এবং কোলেসিস্টোকাইনিন নামক হরমোন নির্গত হয়। এদের মধ্যে সিক্রিটিনের প্রভাবে সোডিয়াম বাইকার্বনেট আয়ন সমৃদ্ধ অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরিত হয়। যে হরমোনের প্রভাবে পাচনকারী উৎসেচক সমৃদ্ধ অগ্ন্যাশয়রস ক্ষরিত হয় তার নাম কোলেসিস্টোকাইনিন।

2.4.4 পিত্তরসের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of bile secretion)

পিত্তের ক্ষরণ মূলত চারভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় :

(1) ভেগাস নার্ভদ্বারা অনীত প্রাবিক সংবেদন পিত্তরসের ক্ষরণকে প্রায় দুই গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

(2) সিক্রিটিন হরমোনের প্রভাবে পিত্তরসের ক্ষরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

(3) রক্তের মধ্যে বর্তমানে পিত্তলবণের মাত্রা সমানুপাতিকভাবে পিত্তরসের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(4) যকৃতের মধ্যে রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে পিত্তরসের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

2.4.4 ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ (Regulation of intestinal secretion)

মূলত খাদ্যকাইমের প্রভাবে এবং স্থানীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (local reflex) মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এটাও জানা আছে যে কোলেসিস্টোকাইনিন হরমোনের প্রভাবেও ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

2.5 প্রশ্নাবলি

(1) অন্তর্কোষীয় পরিপাক যথাযথভাবে বর্ণনা করুন।

(2) বহির্কোষীয় পরিপাক উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

(3) প্রোটিন কীভাবে পাচিত ও শোষিত হয় লিখুন।

(4) টীকা লিখুন — (a) পেপসিন (b) ট্রিপসিন (c) কাইমো ট্রিপসিন (d) কার্বক্সিপেপটাইডেজ (e) ডাই পেপটাইডেজ।

(5) শর্করা জাতীয় খাদ্যের পাচন ও শোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

(6) স্নেহ পদার্থের পাচন ও শোষণ বর্ণনা করুন।

(7) লালগ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় কীভাবে লিখুন।

(8) পাকস্থলীতে কীভাবে ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় লিখুন।

(9) বর্ণনা করুন —

(i) সেফালিক দশা, (ii) গ্যাস্ট্রিক দশা, (iii) ইন্টেস্টিনাল দশা, (iv) অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরণ, (v) ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরণ।

2.6 উত্তরমালা

(1) 2.2 দেখুন

(2) 2.2 ,,

(3) 2.3 ,,

(4) 2.3 ,,

(5) 2.3.2 ,,

(6) 2.3.3 ,,

(7) 2.4.1 ,,

(8) 2.4.2 ,,

(9) 2.4.21..... .....1.2.4.5. দেখুন

একক 3 □ শারীরবৃত্তীয় শ্বসন (Physiology of Respiration)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
3.2 শ্বসন প্রকৃত অর্থে গ্যাসীয় ব্যাপন
3.3 বিভিন্ন ধরনের শ্বাসরঞ্জক
  3.3.1. হিমোগ্লোবিন
  3.3.2 হিমোসায়ানিন
  3.3.3 হিমোএরিথ্রিন
  3.3.4 ক্লোরোক্রুয়োরিন
3.4 রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরিবহন
  3.4.1 অক্সিজেন পরিবহন
    3.4.1.1 অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ
    3.4.1.2 রক্তের অক্সিজেন পরিবহনের বিভিন্ন শর্ত
    3.4.2.3 অক্সিজেন পরিবহন সম্পর্কিত কতগুলি বিশেষ ঘটনা
  3.4.2 কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন
    3.4.2.1 ক্লোরাইড শিফ্ট
3.5 প্রশ্নাবলি
3.6 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

শ্বসন জীবদেহের অন্যতম প্রধান শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। শ্বসনে বায়বীয় অক্সিজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাপক অর্থে শ্বসন একটি গ্যাসীয় ব্যাপন প্রক্রিয়া। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা পরোক্ষ চাপের প্রভাবে বায়বীয় অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করায়। অন্যদিকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা অক্সিজেন রক্ত অথবা হিমোলিম্ফের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিবাহিত হয়। হিমোগ্লোবিন, হিমোসায়ানিন, হিমোএরিথ্রিন, ক্লোরোক্রুয়োনিন প্রধান শ্বাসরঞ্জক হিসাবে শ্বসনে অংশগ্রহণ করে।

বর্তমান অংশে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের শারীরবৃত্তিয় শ্বসন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন —

(1) অংশটি প্রকৃত অর্থে হল গ্যাসীয় ব্যাপন।
(2) বহু সংখ্যক জলজ প্রাণী (অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী) শ্বাসযন্ত্র হিসাবে ফুলকাকে (Gill) ব্যবহার করে।
(3) সমস্ত স্থলবাসী মেরুদণ্ডী এবং জলজ স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ফুসফুসকে প্রধান শ্বাসযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।
(4) অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীরা নানারকমের শ্বাসরঞ্জক ব্যবহার করে।
(5) রক্ত দেহে অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

3.2 শ্বসন প্রকৃত অর্থে গ্যাসীয় ব্যাপন (Respiration involves the diffusion of gases)

যে কোন ধরনের শ্বসনই পরিবেশ এবং কোষপর্দার মধ্যে ব্যাপনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে। জলজ এবং বায়বীয় — এই উভয় প্রকার শ্বসনের ক্ষেত্রেই একটা বিষয় সাধারণ এবং তা হল কোষপর্দা সর্বদা জল দ্বারা আবৃত থাকে। জলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে সরাসরি জল থাকলেও স্থলজ প্রাণীদের ক্ষেত্রে মিউকাস জাতীয় পদার্থ কোষপর্দাকে আবৃত করে রাখে।

সব ধরনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই গ্যাসীয় ব্যাপন পরোক্ষ ধরনের (Passive) ঃ কোষপর্দার দুপাশে O_2 এবং CO_2 — এই দুই গ্যাসের তুলনামূলক পরিমাণের উপর নির্ভর করে এই ব্যাপন ঘটে থাকে। সাধারণত এই ব্যাপন ফিক্ বর্ণিত সূত্র (Fick's law) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই সূত্রানুসারে —

$$R = D \times A\frac{\Delta P}{d}$$

যেখানে, R = ব্যাপনের হার,

D = ব্যাপন ধ্রুবক,

A = ব্যাপনস্থানের ক্ষেত্রফল

ΔP = প্রাণীর কোষের মধ্যে এবং পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসের ঘনত্বের তফাত,

d = ব্যাপন দূরত্ব।

এবার গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে প্রাণীজগতে তিনভাবে 'R'-এর মান বাড়ানোর চেষ্টা হয়ে থাকে।

(1) ব্যাপন স্থানের ক্ষেত্রফল বহুগুণ বৃদ্ধি করে,

(2) ব্যাপন দূরত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করে,

(3) ΔP-এর মান বাড়িয়ে।

প্রাণীজগতে শ্বসনের ক্ষেত্রে বিবর্তনের ধারা এই তিনটি বিষয়কে আধার করেই ঘটে চলেছে। সর্বোপরি, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে শ্বসনের জন্য ফুলকা এবং ফুসফুস বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

শ্বাসযন্ত্র হিসাবে ফুলকার ব্যবহার (use of gill as respiratory organ)

অস্থিযুক্ত মাছের ক্ষেত্রে ফুলকা মুখগহ্বরের মধ্যে অবস্থান করে এবং জলপাম্প বা র‍্যাম ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে ফুলকার সংস্পর্শে আসে। জল যে পথে ফুলকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, ফুলকার মধ্যে অবস্থিত রক্তবাহের মধ্যে রক্তের প্রবাহ তার বিপরীত মুখে হওয়ার ফলে ব্যাপন ত্বরান্বিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র হিসাবে ফুসফুসের ব্যবহার (use of lungs as respiratory organ)

ফুসফুস মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধান শ্বাসযন্ত্র, উভচর প্রাণীরা প্রত্যক্ষ চাপের প্রভাবে (Positive pressure breathing) পরিবেশ থেকে বায়বীয় O_2 ফুসফুসে প্রবেশ করায়। এরা ত্বকের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্যভাবে শ্বাসকার্য চালায় (Cutaneous respiration)।

সরীসৃপ, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সাধারণভাবে পরোক্ষ চাপের প্রভাবে (negative pressure breathing) পরিবেশের বায়বীয় O_2 ফুসফুসে প্রবেশ করায়, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় যখন ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পায় তখন ফুসফুসের মধ্যে বায়ুর চাপ হ্রাস পায় এবং উচ্চ চাপে বায়ু পরিবেশ থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে।

3.3 বিভিন্ন ধরনের শ্বাসরঞ্জক (Different respiratory pigments)

অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে অক্সিজেন (O_2) রক্ত অথবা হিমোলিম্ফের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় পরিবাহিত হয়। এইভাবে পরিবাহিত O_2-এর পরিমাণ কম হয়। উচ্চ শ্রেণির প্রাণীদের ক্ষেত্রে রক্তের মধ্যে বিশেষ ধরনের যুগ্মপ্রোটিন থাকার ফলে অনেক বেশি পরিমাণে O_2 রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হতে পারে। ধাতুযুক্ত যুগ্মপ্রোটিনগুলিকে সাধারণভাবে শ্বাসরঞ্জক (respiratory pigments) বলা হয়। প্রধানত চার ধরনের শ্বাসরঞ্জক

দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করা হল।

3.3.1 (a) হিমোগ্লোবিন (Hb) :

হিমোগ্লোবিন একটি লৌহ পরফাইরিন প্রোটিন। এই প্রোটিন রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় অথবা রক্তকণিকার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে এই হিমোগ্লোবিনের আণবিক ওজন 17,000 থেকে 30,00,000 পর্যন্ত হতে পারে। হিমোগ্লোবিন প্রায় সব মেরুদণ্ডী প্রাণীতে দেখতে পাওয়া যায়। অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে যে সকল পর্বের প্রাণীতে হিমোগ্লোবিন দেখতে পাওয়া যায় তারা হল এক্সাইনেডার্মেটা, মোলাস্কা, আর্থ্রোপোডা, অ্যানিলিডা, নিমাটোডা ইত্যাদি। এছাড়াও পরজীবী ট্রিমাটোড, কিছু প্রোটোজোয়া (**Paramoecium sp.**) এবং **Neurospora** নামক ছত্রাকের মধ্যে হিমোগ্লোবিন দেখতে পাওয়া যায়। সাইক্লোস্টোম জাতীয় প্রাণী ছাড়া আর সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনের গড় আণবিক ওজন 68,000। এই হিমোগ্লোবিন চারটি লৌহ পরফাইরিন প্রস্থেটিক গ্রুপ বা হিম (Haeme) এবং ওই হিমের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি করে α এবং β প্রোটিন দ্বারা গঠিত (চিত্র 3.1)।

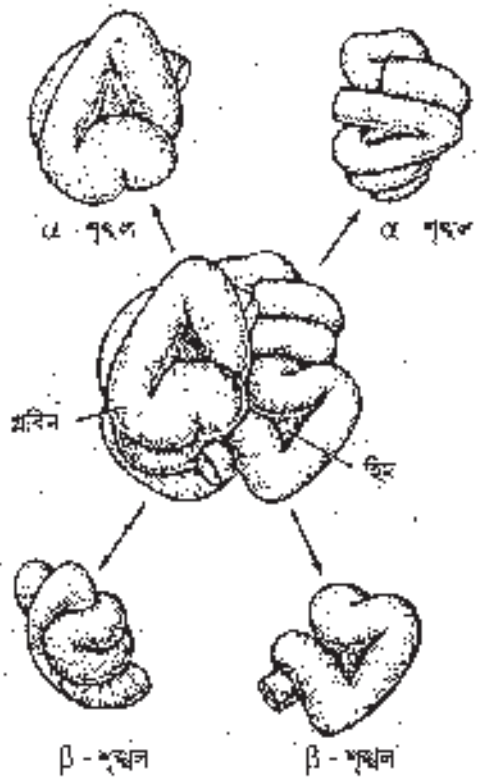

চিত্র ঃ 3.1 একটি হিমোগ্লোবিন অণুর চিত্ররূপ।

3.3.2 (b) হিমোসায়ানিন :

হিমোসায়ানিন একটি তামঘটিত যুগ্ম প্রোটিন। এই শ্বাসরঞ্জক কেবলমাত্র রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। হিমোগ্লোবিনের মতো হিমোসায়ানিনও বিভিন্ন প্রাণীতে দেখতে পাওয়া যায়। এর আণবিক ওজন 3,00,000 থেকে 90,00,000 পর্যন্ত হতে পারে। হিমোসায়ানিন সাধারণভাবে পর্ব মোলাস্কা এবং পর্ব আর্থ্রোপোডায় দেখতে পাওয়া যায়।

3.3.3 (c) হিমোএরিথ্রিন :

হিমোগ্লোবিনের মতো লৌহঘটিত হলেও হিমোএরিথ্রিন পরফাইরিন প্রোটিন নয়। হিমোগ্লোবিন যেমন রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় এবং কোষের মধ্যে অবস্থান করতে পারে, হিমোএরিথ্রিন কেবলমাত্র কোষের মধ্যেই অবস্থান করে। হিমোএরিথ্রিনের আণবিক ওজন 66,000 থেকে 1,20,000 পর্যন্ত হতে পারে। এই রঞ্জকটি সাইপানকুলিডস, পলিকিটস্ এবং ব্রাকিওপোডদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

3.3.4 (d) ক্লোরোক্রুয়োরিন :

ক্লোরোক্রুয়োরিন হিমোগ্লোবিনের মতো লৌহ পরফাইরিন প্রোটিন। এই শ্বাসরঞ্জক কেবলমাত্র রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। ক্লোরোক্রুয়োরিন পলিকিটর অন্তর্গত চারটি গোত্রের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

3.4 রক্তের মাধ্যমে O_2 এবং CO_2 পরিবহন (Transport of O_2 and CO_2 through blood)

3.4.1 অক্সিজেন (O_2) পরিবহন (Oxygen transport) :

অক্সিজেন সাধারণত জলে খুব কম দ্রবীভূত হয়। সাধারণ অবস্থায় (STP) লিটার পিছু 3 মিলিঃ অক্সিজেন

দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। কিন্তু রক্তের প্রতিলিটার পিছু এই দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 200 মিলিলিটার। রক্তের শ্বাসরঞ্জক (হিমোগ্লোবিন) থাকার ফলেই এটা সম্ভবপর হয়।

হিমোগ্লোবিন অণুতে চারটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল (Polypeptide chain) এবং চারটি হৈম বৌগ থাকে যার নাম হিম। প্রতিটি হিমযৌগের কেন্দ্রস্থলে থাকে একটি করে লৌহ পরমাণু (an atom of iron) যা অক্সিজেন অণুর সঙ্গে অস্থায়ীভাবে (এবং উভমুখী) সংযুক্ত হয়। ফলে প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু চারটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে সংযুক্তি স্থাপন করতে পারে। এই সংযুক্তির ফলে হিমোগ্লোবিনকে অক্সিহিমোগ্লোবিন বলা হয়। অক্সিহিমোগ্লোবিন উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

রক্ত ধমনির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যখন ধমনি শিরার সংযোগস্থলে উপস্থিত রক্তজালিকার (Capillaries) মধ্যে প্রবেশ করে তখন রক্ত থেকে অক্সিজেন নির্গত হয় এবং অক্সিহিমোগ্লোবিন ডি-অক্সিহিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। এই ডি-অক্সিহিমোগ্লোবিনের রঙ হল গাঢ় লাল।

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি হিমোগ্লোবিন অণু চারটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। হিমোগ্লোবিন অণুর সঙ্গে কতটা অক্সিজেন যুক্ত হবে তা নির্ভর করে মূলত অক্সিজেনের আংশিক চাপ বা Partial pressure (PO_2)-এর উপর। যদি রক্তে উপস্থিত সব হিমোগ্লোবিনের সমস্ত অক্সিজেন গ্রাহকগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয় তবে বলা যেতে পারে যে রক্ত 100% অক্সিজেন সম্পৃক্ত। এই অবস্থায় রক্তে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণকে রক্তের অক্সিজেন-ক্যাপাসিটি (Oxygen capacity) বলা হয়। সাধারণভাবে 1 মিলিমোল হিমোগ্লোবিন 1 মিলিমোল অক্সিজেন বহন করতে পারে। সাধারণ তাপমাত্রা ও চাপের (STP) পরিপ্রেক্ষিতে এই অক্সিজেনের পরিমাণ 22.4 মি.লি. (ml)। সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি 100 মি.লি. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ প্রায় 0.9 মিলিমোল (m. mole)। মানুষের দেহের অক্সিজেন-ক্যাপাসিটি তাই $0.9 \times 22.4 = 20.2$ vol%।

3.4.1.1 অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ (Oxygen dissociation curve)

সামগ্রিক সুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে দেহের অক্সিজেন ক্যাপাসিটি হিমোগ্লোবিনের মানের সঙ্গে সমানুপাতিক। তাই হিমোগ্লোবিনের বিভিন্নতা সুস্থ বিভিন্ন রক্তের যখন তুলনা করা হয় তখন বিজ্ঞানীরা হিমোগ্লোবিনের সম্পৃক্ততাকে শতকরা হারে প্রকাশ করেন (%saturation)। এই ধরনের প্রকাশ কৌশল (mode of expression) আমরা আসলে অক্সিজেনের পরিমাণকে অক্সিজেন ক্যাপাসিটির শতকরা হারে প্রকাশ করি। বিষয়টা আরো ভালো করে বোঝাবার জন্য এই শতকরা সম্পৃক্ততা (%saturation) অক্সিজেনের আংশিক চাপের সাপেক্ষে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্রই হল অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ (চিত্র 3.2)।

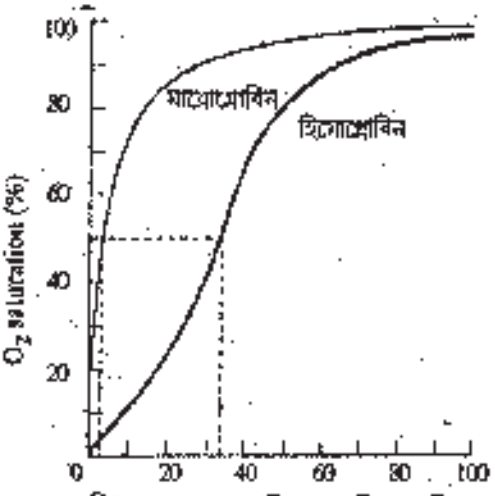

চিত্র : 3.2 মায়োগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ

ফুসফুসের মধ্যে রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ধমনির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে দেহকোষসমূহে পৌঁছায়। দেহকোষে PO_2-এর মাত্রা কম থাকায় অক্সিজেন রক্ত থেকে নির্গত হয়ে দেহকোষে প্রবেশ করে। স্বাভাবিকভাবেই ক্যাপিলারি পার হয়ে রক্ত যখন শিরার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তখন তাতে O_2-এর পরিমাণ অনেক কম থাকে। 3.2 নং চিত্রে যে অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ দেখানো হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে বিশ্রাম এবং পরিশ্রমের কারণে দেহকোষের মধ্যে কতটা অক্সিজেন পরিবাহিত হবে তা নির্ভর করে।

3.4.1.2 রক্তের অক্সিজেন পরিবহনের বিভিন্ন শর্ত (Factors regulating oxygen transport by blood)

বিভিন্ন শর্ত-সাপেক্ষে রক্তের অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষমতা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এই বিভিন্নতা অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়। শর্তগুলি অজৈব অথবা জৈব দুইই হতে পারে। হিমোগ্লোবিনের প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি হল জৈব শর্ত। তাপমাত্রা ইত্যাদি হল জৈব শর্ত। অন্যদিকে তাপমাত্রা, রক্তের pH, রক্তে CO_2-এর পরিমাণ, বিষক্রিয়া ইত্যাদি হল অজৈব শর্ত। হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষমতা, অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ-এর চরিত্র এবং শারীরবৃত্তীয় প্রভাব নিচে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল (সারণী দ্রষ্টব্য)।

সারণী —		
হিমোগ্লোবিনের প্রকৃতি	(a) সাধারণ	অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ সিগময়েড ধরনের। মনে করা হয় যে প্রথমে প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণুর একটি হিম গ্রুপ অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হবার পর ওই প্রোটিনের গঠনগত পরিবর্তন অপর তিনটি হিমের সঙ্গে অক্সিজেনের যুক্ত হওয়ার ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে। এইরূপ ঘটনাকে subunit interaction বলা হয়। সাধারণ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযুক্তিকরণকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ $y/100 = \frac{kP^n}{1+kP^n}$, যেখানে y = শতকরা সম্পৃক্ততা, P = O_2-এর আংশিক চাপ, K = সাম্যাবস্থার ধ্রুবক, এবং n = Submit interaction-এর পরিমাপ।
	(b) পেশি-হিমোগ্লোবিন বা মায়োগ্লোবিন	মায়োগ্লোবিন অণুতে কেবলমাত্র একটি হিম গ্রুপ থাকায় এক্ষেত্রে অক্সিজেন-ডিসোসিয়েশন কার্ভ হাইপারবোলিক (Hyperbolic) হয়ে থাকে। সাধারণ হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভের সাপেক্ষে এই কার্ভ বামদিকে সরে যায় (চিত্র 3.2)। এর অর্থ এই যে অক্সিজেনের আংশিক চাপ অনেক কম থাকলেও মায়োগ্লোবিন অক্সিজেন দ্বারা সম্পৃক্ত হয় এবং সাধারণ হিমোগ্লোবিনের তুলনায় অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে কোষে / কলাস অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্তনপ্রের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিনের আচরণ মায়োগ্লোবিনের অনুরূপ।
	ভ্রূণের হিমোগ্লোবিন	মানুষের ভ্রূণের হিমোগ্লোবিন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তুলনায় কিছুটা আলাদা। এছাড়াও ভ্রূণের রক্তে উপস্থিত

		লোহিত রক্তকণিকার অভ্যন্তরে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির জৈবিক ফসফেট থাকায়, ওই হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ মায়োগ্লোবিনের অনুরূপ। সাধারণ হিমোগ্লোবিনের সাপেক্ষে বামদিকে অবস্থিত এই কার্ভ এই ধারণাই ব্যক্ত করে যে, ভ্রূণের হিমোগ্লোবিন অপেক্ষাকৃত কম PO_2 অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ O_2 পরিবহনে সক্ষম (চিত্র 3.3)। একই কারণে কোষ বা কলায় এই হিমোগ্লোবিন অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই রকমের ভ্রূণজ হিমোগ্লোবিন দেখতে পাওয়া যায়। মুরগির ভ্রূণ এবং ব্যাঙাচির ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে থাকে। 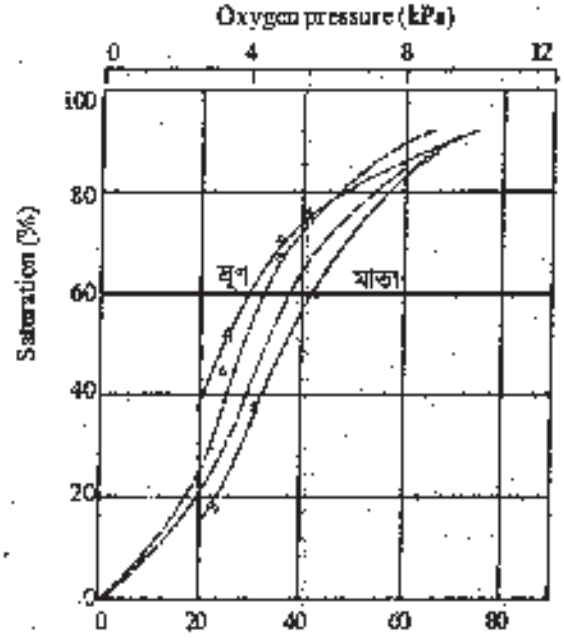 চিত্র : 3.3 স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাতা ও ভ্রূণের অক্সিজেন-ডিসোসিয়েশন কার্ভ।
তাপমাত্রা		অধিক তাপমাত্রায় অক্সিজেন এবং হিমোগ্লোবিনের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ কমে যায়। ফলে অতি সহজেই O_2 হিমোগ্লোবিন থেকে বাষ্প হয়ে আসে। পরিমিতভাবে এর

		ফলে অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ সাধারণ অবস্থার তুলনায় ডানদিকে অবস্থান করে (চিত্র 3.4)। 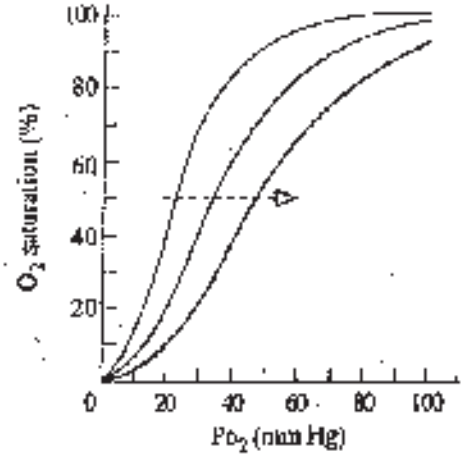 চিত্র ঃ 3.4 অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভের উপর PCO_2-এর প্রভাব
CO_2 এবং pH		রক্তে CO_2 বা অনুরূপ কিছুর আধিক্যের কারণে অনেক সময় রক্তের pH হ্রাস পায়। এই কম pH-এর কারণে অক্সিজেন এবং হিমোগ্লোবিনের মধ্যে আকর্ষণ কমে যায়। ফলে অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ সাধারণ অবস্থার সাপেক্ষে ডানদিকে সরে যায়। বাস্তব অবস্থায় কোন পেশিতে যখন CO_2-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন এইরকম ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাকে বোর প্রভাব বা Bohr effect বলা হয় (চিত্র 3.5)। 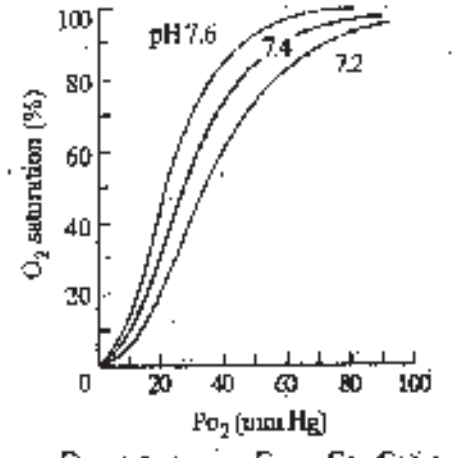 চিত্র ঃ 3.5 মানুষের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভের উপর pH-এর প্রভাব।

		হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভের উপর CO_2-এর প্রভাব স্তন্যপায়ীদের তুলনায় মাছের ক্ষেত্রে বেশি হয়। CO_2-এর এই অধিকতর প্রভাবকে রুট-প্রভাব বা Root effect বলা হয়। মাছের পটকা বা Swim bladder-র কাজের ক্ষেত্রে Root effect-এর প্রভাব সর্বাধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে pH হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও রক্তরঞ্জক এবং অক্সিজেনের মধ্যে আকর্ষণ তীব্রতর হতে পারে। লিমুলাস এবং শামুকজাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এই বিশেষ ঘটনাকে বিপরীতমুখী বোর প্রভাব বা Reverse Bohr effect বলা হয়। অক্সিজেনের অভাবজনিত কারণের বিপরীতমুখী কার্য হিসাবে এই ব্যবস্থা একটি বিশেষ অভিযোজন মাত্র।
জৈব ফসফেট		মনে রাখতে হবে যে লোহিত রক্তকণিকা দ্বারা O_2 পরিবহন ওই কোষের সামগ্রিক বিপাকীয় অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আগে মনে করা হত যে নিউক্লিয়াসবিহীন লোহিত রক্তকণিকা কেবলমাত্র হিমোগ্লোবিনের বাহক। কিন্তু সাম্প্রতিককালে লোহিত রক্তকণিকার বিপাকীয় অবস্থার নানাবিধ বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে যে হিমোগ্লোবিন পরিবহন ছাড়াও ওই কোষ আরও অনেক কাজ করে। অক্সিজেন পরিবহনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ তাদের মধ্যে অন্যতম। বলা বাহুল্য যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ATP এবং 2, 3 ডাইফসফোগ্লিসারেট — এই দুইয়ের উপস্থিতি লোহিত রক্তকণিকার দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে। প্রাণীদের প্রকারভেদে নানারকমের জৈব ফসফেট লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। স্তন্যপায়ীর প্রধান জৈব ফসফেট হল 2, 3 — ডাইফসফোগ্লিসারেট। পাখি এবং মাছেদের জৈব ফসফেট যথাক্রমে ইনোসিটল পেন্টাফসফেট (IPP) এবং (ATP / GTP)।

3.4.1.J অক্সিজেন পরিবহন সম্পর্কিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনা

রুট প্রভাব (Root effect) : কিছু কিছু মাছ, ক্রাস্টেশিয়া এবং সেফালোপোডদের মধ্যে দেখা যায় যে CO_2-এর আংশিক চাপের (PCO_2) বৃদ্ধি অথবা pH কমে যাওয়ার প্রভাবে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেনের প্রতি আসক্তি তো কমে যায়ই, এছাড়াও সামগ্রিকভাবে অক্সিজেন ক্যাপাসিটিও (Oxygen capacity) যথেষ্ট কমে যায়। এই ঘটনাকে রুট প্রভাব বা Root effect বলা হয়।

বিপরীতমুখী বোর প্রভাব (Reverse Bohr effect) : অনেক গ্যাসট্রোপোডা এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি কাঁকড়ার (*Limulus Sp.*) ক্ষেত্রে pH কম গেলে হিমোসায়ানিন নামক শ্বসনরঞ্জকের অক্সিজেনের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। আপৎকালীন অবস্থায়, যখন PO_2 খুব কমে যায় সেই সময়ে বেশি করে অক্সিজেন গ্রহণের পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়ক হয়। বিজ্ঞানীরা একে বিপরীতমুখী বোর প্রভাব বা Reverse Bohr effect বলেন।

উচ্চতা এবং অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ (High attitude and oxygen dissociation curve) : অধিক উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের আংশিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। যে সমস্ত প্রাণী অধিক উচ্চতায় বসবাস করে তাদের এই কম PO_2-এর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোজন দেখতে পাওয়া যায়। লামা (Lama) নামক স্তন্যপায়ী প্রাণীতে যে বিশেষ ধরনের হিমোগ্লোবিন থাকে তা কম PO_2 থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন বায়ু থেকে গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে সাধারণ স্তন্যপায়ীদের তুলনায় এদের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ বামদিকে সরে যেতে দেখা যায়।

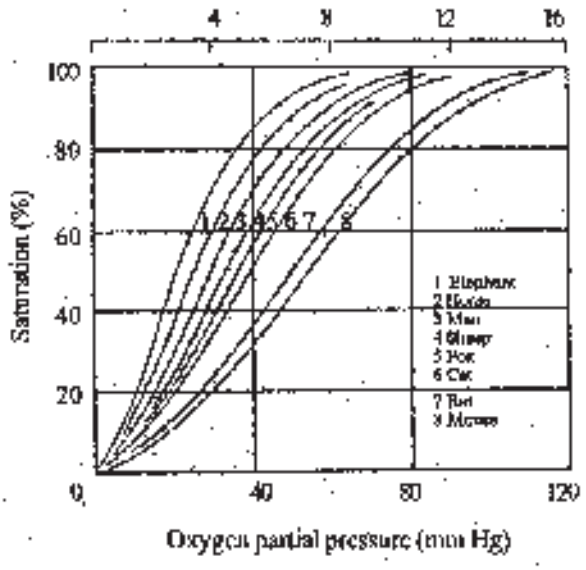

চিত্র : 3.6 অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভের উপর দেহের আকারের প্রভাব।

দেহের আকার এবং অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ (Oxygen dissociation curve and body size) : যখন বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তখন দেখা যায় যে দেহের আকৃতি যত ছোট হয় অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ ততই ডানদিকে সরে যেতে থাকে (চিত্র 3.6)।

অ্যাসিড প্রতিরোধী হিমোগ্লোবিন : কিছু কিছু অস্থিযুক্ত মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের দেহে সাধারণ হিমোগ্লোবিন ছাড়াও অ্যাসিড প্রতিরোধী হিমোগ্লোবিন থাকে। সাঁতার দেওয়ার ফলে শরীরে যখন অতিমাত্রায় ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় তখন ওই অ্যাসিড প্রতিরোধী হিমোগ্লোবিন (acid insensitive) দেহে অক্সিজেনের সরবরাহ অব্যাহত রাখে।

3.4.2 কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরিবহন (Transport of CO_2)

শ্বসনের ফলে উৎপন্ন CO_2 কলা (tissue) থেকে প্রথমে রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত দ্বারা বাহিত CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পরিবেশে নির্গত হয়। নিচের 3.7 নং চিত্রে CO_2 পরিবহনের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হল।

সাধারণত CO_2 জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই কার্বনিক অ্যাসিড বিয়োজিত হয়ে যথাক্রমে বাই কার্বনেট এবং কার্বনেট আয়নে পরিণত হয় :

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^-$$

(কার্বনিক অ্যাসিড) (বাইকার্বনেট) (কার্বনেট)

রক্তে সাধারণভাবে এই রাসায়নিক বস্তুগুলির অনুপাত এইরকম : ($CO_2 : H_2CO_3 = 1000 : 1$; CO_2 : বাইকার্বনেট আয়নসমূহ = 1 : 20) দেখা যাচ্ছে যে বাইকার্বনেট হল রক্তের মধ্যে CO_2-এর প্রধান রূপ, যদিও এটা pH-এর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

মনে রাখতে হবে যে পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে রক্তে কার্বনেটের পরিমাণ সামান্যই। কিন্তু শীতল রক্তযুক্ত প্রাণীদের (poikilotherms) ক্ষেত্রে কার্বনেটের পরিমাণ CO_2-এর পরিমাণের 5% পর্যন্ত হতে পারে। এমন অবস্থাতেও বাইকার্বনেটই হল CO_2-এর প্রধান রূপ।

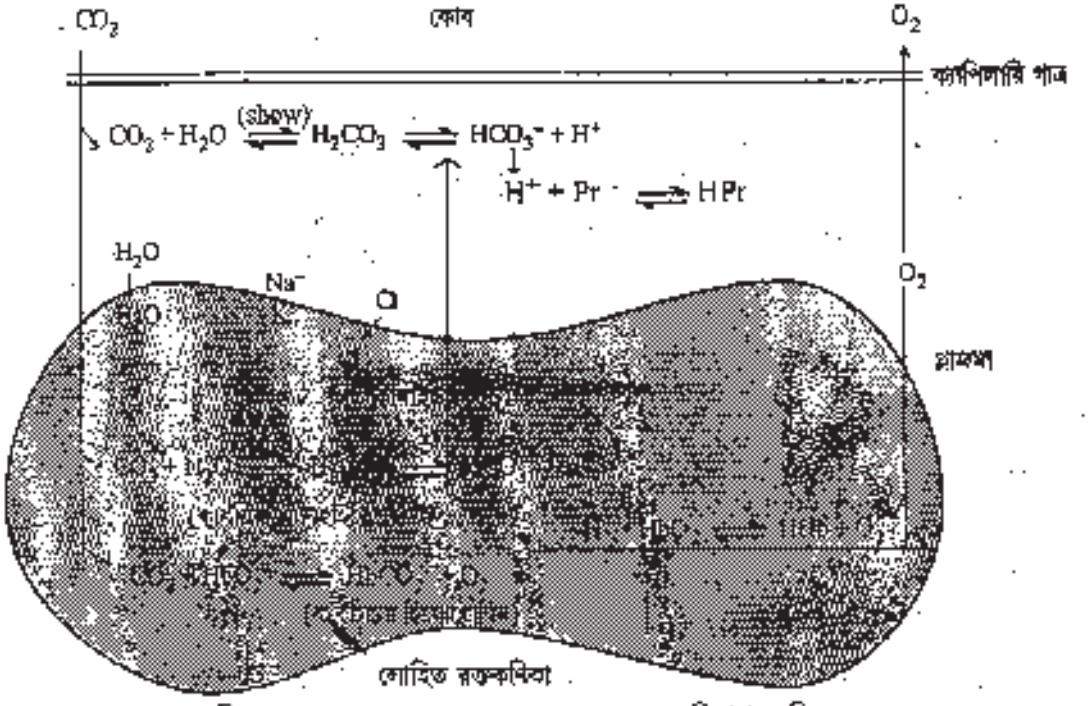

চিত্র ঃ 3.7 রক্ত ও কোষের মধ্যে CO_2 -এর গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

রক্তে CO_2 প্রোটিন গাত্রে অবস্থিত $-NH_2$ গ্রুপের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। হিমোগ্লোবিনের গাত্রে অবস্থিত $-NH_2$-র সঙ্গেই মূলত এই বিক্রিয়া হয়ে থাকে এবং এর ফলে কার্বামিনো যৌগ উৎপন্ন হয় —

$$Hb\begin{matrix}\diagup M\\ N\\ \diagdown H\end{matrix} + CO_2 \rightleftharpoons H^+ + Hb\cdots N\begin{matrix}\diagup H\\ \diagdown COO^-\end{matrix}$$

কতটা পরিমাণে কার্বামাইনো যৌগ তৈরি হবে তা মূলত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (1) $-NH_2$ গ্রুপের প্রাধান্য, (2) রক্তের pH এবং (3) রক্তের PCO_2।

রক্তে উপস্থিত CO_2-এর পরিমাণ PCO_2-এর উপর কিছুলাংশে নির্ভর করে এবং এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে লেখচিত্রাকারে প্রকাশ করলে তাকে CO_2 ডিসোসিয়েশন কার্ভ বলা হয় (চিত্র 3.8)। CO_2-এর মোট পরিমাণ ($CO_2 + HCO_3^- +$ কার্বামিনো যৌগ) রক্তকণিকার তুলনায় রক্তরসে আপেক্ষিকভাবে বেশি থাকে। রক্তকণিকা এবং রক্তরসে PCO_2-এর মান তুলনীয় হলে ও বাইকার্বনেটের পরিমাণ রক্তরসে রক্তকণিকার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। অন্যদিকে কার্বামিনো যৌগের পরিমাণ রক্তরসের তুলনায় রক্তকণিকায় বেশি থাকে। দেখা গেছে যে কোনও বিশেষ PCO_2-এর কারণে CO_2-এর পরিমাণ অশুদ্ধ রক্তে (deoxygenated blood) বিশুদ্ধ রক্তের (oxygenated blood) তুলনায় অনেক বেশি। এর ফলে কলায় যখন রক্ত থেকে অক্সিজেন নির্গত হয় (deoxygenation of blood in the tissue) তখন তা PCO_2 এবং pH-এর মান প্রায়

অপরিবর্তিত রাখতে সাহায্য করে। এর কারণ হল এই যে ঠিক ওই সময়েই রক্তে CO_2 প্রবেশ করে। সামগ্রিকভাবে এই ঘটনাকে হলডেন প্রভাব বা Haldane effect বলা হয়।

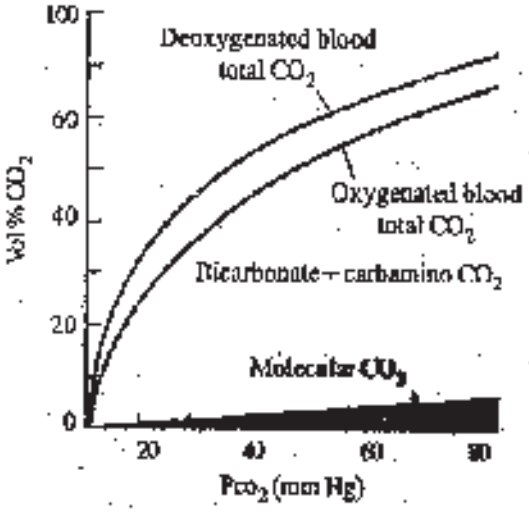

চিত্র : 3.8 রক্তের মধ্যে CO_2-এর পরিমাণ P_{CO_2}-এর উপর নির্ভর করে এই সম্পর্ককে CO_2-ডিসোসিয়েশন কার্ভ বলে।

3.4.2.1 ক্লোরাইড শিফ্‌ট (Chloride shift)

রক্তে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে CO_2 অতি দ্রুত লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে। ওই স্থানে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয়, যা পরমুহূর্তে বিয়োজিত হয়ে বাইকার্বনেট আয়নে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে বাইকার্বনেটের যে বৃদ্ধি ঘটে তার ফলে কিছু HCO_3^- আয়ন লোহিত রক্তকণিকা থেকে বার হয়ে রক্তরসে চলে আসে। অতঃপর যে আয়ন ঘটিত অসাম্যের সৃষ্টি হয় তা প্রশমিত করার জন্য রক্তরস থেকে উপযুক্ত পরিমাণে Cl^- লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে (চিত্র 3.9)। এইভাবে HCO_3^- এবং Cl^--এর বিপরীতমুখী প্রবাহের মাধ্যমে আয়নিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখার ঘটনাকে ক্লোরাইড শিফ্‌ট (Chloride Shift) বলা হয়।

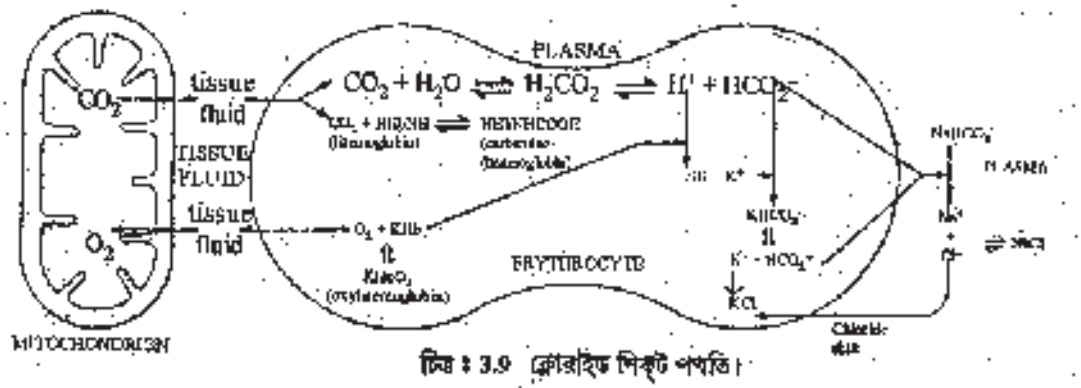

চিত্র : 3.9 ক্লোরাইড শিফ্‌ট পদ্ধতি।

3.5 প্রশ্নাবলি

1. গ্যাসীয় ব্যাপন কী তা লিখুন।
2. ফিক বর্ণিত (Fick's Law) বুঝিয়ে লিখুন।
3. টীকা লেখো —
   (a) হিমোগ্লোবিন (H6)
   (b) হিমোসায়ানিন
   (c) হিমোএরিথ্রিন
   (d) ক্লোরোক্রুয়োরিন
   (e) অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ
4. রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন (O_2) এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড (CO_2) পরিবাহিত হয় কীভাবে সাজিয়ে লিখুন।
5. ক্লোরাইড শিফ্‌ট (Chloride shift) কাকে বলা হয়?

টীকা লিখুন — (a) পেপসিন (b) ট্রিপসিন (c) কাইমো ট্রিপসিন (d) কার্বক্সিপেপটাইজ (e) ডাই পেপটাইডেজ।

3.6 উত্তরমালা

1. 3.2 দেখুন
2. 3.2 ,,
3. 3.3 ,,
4. 3.4 ,,
5. 3.4.2.1 ,,

একক 4 □ রেচন

গঠন

4.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

4.2 বৃক্কের গঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

4.3 বৃক্কের কাজ

4.4 বৃক্ক ছাড়া অন্য অঙ্গের মাধ্যমে রেচনক্রিয়া

4.5 বৃক্কীয় সংবহন

4.6 নেফ্রনের গঠন

4.7 মূত্র উৎপাদন

- 4.7.1 গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেশন
- 4.7.2 পরিস্রবণ চাপ
- 4.7.3 গ্লোমেরিউলাসে পরিস্রবণের নিয়ন্ত্রণ
  - 4.7.3.1 রেনাল অটো রেগুলেশন
  - 4.7.3.2 সিম্প্যাথেটিক নিয়ন্ত্রণ
- 4.7.4 নালিকা দ্বারা পুনর্শোষণ ও ক্ষরণ
- 4.7.5 নালিকা দ্বারা ক্ষরণ
- 4.7.6 কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার পদ্ধতি

4.8 মূত্রের ধর্ম ও উপাদানসমূহ

- 4.8.1 মূত্রের ধর্ম
- 4.8.2 মূত্রের উপাদান

4.9 বৃক্কের কাজ সম্পর্কিত পরীক্ষা

4.10 অসমোকনফরমার ও অসমোরেগুলেটর

- 4.10.1 অসমোকনফরমার প্রাণীসমূহ
- 4.10.2 অসমোরেগুলেটর প্রাণীসমূহ

4.11 প্রশ্নাবলি

4.12 উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শরীরে বৃক্ক এবং তার সহযোগী অঙ্গ নিয়ে তৈরি হয় রেচনতন্ত্র। দেহের জল এবং ইলেকট্রোলাইটের সাম্যাবস্থা বজায় রাখার জন্য রেচনতন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বৃক্ক আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এগুলি হল : (1) বিষের নির্বিষকরণ, (2) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, (3) লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যাগত মান নিয়ন্ত্রণ, (4) PO_2, PCO_2 নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

গঠনগত দিক থেকে রেচনতন্ত্র এবং জননতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ। এই কারণে রেচন এবং জননতন্ত্র একত্রে রেচন-জননতন্ত্র নামে পরিচিত। সাধারণভাবে স্তন্যপায়ীদের রেচনতন্ত্র ছয়টি অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত — দুটি বৃক্ক, দুটি গবিনী, একটি মূত্রথলি এবং মূত্রদ্বার। আমরা এই অংশে বৃক্ক এবং তার কাজ নিয়েই বিশেষ আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অংশটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন —

- রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের নাম এবং তার শনাক্তকরণ,
- মূত্র প্রস্তুত ছাড়াও বৃক্কের অন্যান্য কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা,
- প্রধান প্রধান নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যপদার্থ সম্পর্কে জানা।

4.2 বৃক্কের গঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

বৃক্ককে রিট্রোপেরিটোনিয়াল অঙ্গ বলা হয় কারণ এই অঙ্গ পশ্চাদ্‌বর্তী উদরগহ্বরের সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। বৃক্কের বাইরে থেকে ভিতরের দিকে তিনটি প্রধান কলাস্তর দেখতে পাওয়া যায় — (1) রেনাল ক্যাপসুল, (2) অ্যাডিপোজ ক্যাপসুল এবং (3) রেনাল ফেসিয়া। অন্তর্গঠনের দিক থেকে বৃক্ক যথাক্রমে কর্টেক্স, মেডালা, পিরামিড, প্যাপিলি, কলাম, ক্যালিসেস এবং পেলভিসে বিভক্ত। বৃক্কের গঠনগত ও কার্যগত একক হল নেফ্রন। মনুষ্যের প্রতিটি বৃক্কে এর সংখ্যা প্রায় 12 লক্ষ। প্রতিটি নেফ্রনের তিনটি অত্যাবশ্যক অংশ থাকে : (1) রক্তবাহ, (2) একটি রেনাল করপাস্‌ল (renal corpuscle) এবং (3) একটি লম্বা রেনাল নালিকা। নেফ্রনের বেশির ভাগ অংশই বৃক্কের বহির্ভাগে (cortex of the kidney) অবস্থান করে। বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থানকারী নেফ্রনকে সাধারণভাবে কর্টিকাল নেফ্রন (Cortical nephron) বলে। যে সমস্ত নেফ্রন বৃক্কের মেডালার অঞ্চলের কাছাকাছি থাকে তাদের জাক্সটামেডুলারি (Juxtamedullary) নেফ্রন বলে। এই ধরনের নেফ্রনের সংখ্যা সমস্ত নেফ্রনের মাত্র 20% থেকে 30% এবং এরা কর্টিকাল নেফ্রনের থেকে সামান্য আলাদা ধরনের।

4.3 বৃক্কের কাজ

দেহের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন তরলের সাম্যাবস্থার নিয়ামক বৃক্ক নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে থাকে।

1. বৃক্ক রক্তরস পরিস্রবণ (filter) করে, প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ আলাদা করে এবং বর্জ্যপদার্থকে দেহ থেকে নির্গত করে।

2. দেহ থেকে জল বার করে নিয়ে অথবা জল দেহে সংরক্ষণ করে বৃক্ক রক্তের পরিমাণ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

3. পরিমাণ মতো জল এবং বিভিন্ন দ্রাব্যপদার্থ শরীর থেকে নির্গত করে বৃক্ক দেহস্থ তরলের অভিস্রবণ ক্ষমতা (Osmolarity) নিয়ন্ত্রণ করে।

4. রেনিন (renin) নামক হরমোনের মাধ্যমে বৃক্ক রক্তচাপ এবং ইলেকট্রোলাইটের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

5. এরিথ্রোপোয়েটিন (erythropoietin) নামক হরমোনের প্রভাবে বৃক্ক লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যাগত পরিমাণ (RBC count) এবং রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে।

6. বৃক্ক ক্যালসিট্রায়ল (ভিটামিন D) তৈরি করতে পারে এবং এর মারফত ক্যালসিয়ামের বিপাকীয় সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

7. কোষের অন্তর্গত পারঅক্সিজোমের সাহায্যে রক্তে উপস্থিত বিভিন্ন সুপারঅক্সাইড, মুক্ত মূলক (free radical) এবং ড্রাগের বিষক্রিয়া প্রতিহত করা বৃক্কের অন্যতম কাজ।

8. উপবাসকালে বৃক্ক অ্যামাইনো অ্যাসিডের থেকে $-NH_2$ মূলক বিচ্ছিন্ন করে NH_3 তে রূপান্তরিত করে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের বর্জ্য অংশকে কাজে লাগিয়ে গ্লুকোনিওজেনেসিস পথতিতে গ্লুকোজ তৈরি করে।

4.4 বৃক্ক ছাড়া অন্য অঙ্গের মাধ্যমে সাধিত রেচনক্রিয়া

বৃক্ক ছাড়াও আরও তিনটি অঙ্গ / তন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ রেচনক্রিয়া সম্পন্ন করে :

1. শ্বসনতন্ত্র মূলত CO_2 গ্যাসের রেচন করে। এছাড়াও ফুসফুসের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস এবং কিছুটা জল নির্গত হয়।

2. ঘেমগ্রন্থি ঘর্মের মাধ্যমে চারটি পদার্থ দেহ থেকে নির্গত করে :

(a) জল, (b) অজৈব লবণ, (c) ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং (d) ইউরিয়া।

3. পাচনতন্ত্র খাদ্যের পরিপাক ছাড়াও নানা বস্তুর রেচন ও সুনিপুণভাবে করে থাকে। যেমন — (a) জল, (b) বিভিন্ন লবণ, (c) CO_2, (d) বিভিন্ন লিপিড জাতীয় পদার্থ, (e) পিত্তরঞ্জক (bile pigments), (f) কোলেস্টেরল, (g) অন্যান্য বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ।

4.5 বৃক্কীয় সংবহন

সাধারণভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃক্কের ওজন দেহ ভারের 0.4%। কিন্তু এই অঙ্গের মাধ্যমে মিনিটে প্রায় 1.2 লিটার রক্ত পরিস্রুত হয়। কাজেই, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃক্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিটি বৃক্ক রেনাল ধমনির দ্বারা দেহের মূল সংবহন তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। বৃক্কের প্রবেশদ্বারে অথবা বৃক্কে প্রবেশের অব্যবহিত পরে এই রেনালধমনি বারবার বিভাজিত হয়ে কয়েকটি ইন্টারলোবার ধমনি তৈরি করে। প্রত্যেকটি ইন্টারলোবার ধমনি বৃক্কের কর্টেক্স এবং মেডালার সংযোগস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্রমাগত বিভাজিত হতে হতে (ইন্টারলোবার ধমনি → আরকুয়েট ধমনি (arcuate arteries) → ইন্টারলোবিউলার ধমনি) রক্তবাহ কর্টেক্সে প্রবেশ করে।

কর্টেক্সে অবস্থানকালে ইন্টারলোবিউলার ধমনি থেকে একগুচ্ছ অন্তর্মুখী অ্যার্টেরিওল (afferent arteriole) উৎপত্তি লাভ করে। প্রত্যেকটি অন্তর্মুখী অ্যার্টেরিওল গ্লোমেরিউলাস নামক জালিকা (capillaries) তৈরী করে এবং তার থেকেই বহির্মুখী অ্যার্টেরিওল (efferent arteriole) উৎপত্তি লাভ করে। বহির্মুখী অ্যার্টেরিওল থেকে জালিকাকার পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারি তৈরি হয় যা নেফ্রনের অপর অংশের সঙ্গে যুক্ত পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারি থেকে যথাক্রমে ইন্টারলোবিউলার শিরা, আরকুয়েট শিরা, ইন্টারলোবার শিরা এবং রেনাল শিরায় রক্ত প্রবাহিত হয়। রেনাল শিরা শেষে বৃক্কের হাইলাম নামক অংশ দিয়ে নির্গত হয় এবং ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভার সঙ্গে যুক্ত হয়।

বৃক্কের মধ্যে রক্তের চলাচলের পথটি একদৃষ্টিতে এইরকম —

রেনাল ধমনি → ইন্টারলোবার ধমনি → আরকুয়েট ধমনি → ইন্টারলোবিউলার ধমনি → অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল → গ্লোমেরিউলাস → ইফারেন্ট অ্যার্টেরিওল → গ্লোমেরিউলাস → ইফারেন্ট অ্যার্টেরিওল → পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারি → ইন্টারলোবিউলার শিরা → আরকুয়েট শিরা → ইন্টারলোবার শিরা → রেনাল শিরা → ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা।

বৃক্কের মেডালা অঞ্চলে যে রক্তবাহ রক্ত সরবরাহ করে তার নাম ভাসা রেক্টা যা জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের ইফারেন্ট আর্টেরিওল থেকে উৎপত্তি লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বৃক্কের মেডালা মোট বৃক্কীয় সংবহনের মাত্র 1% থেকে 2% এর অংশীদার।

4.6 নেফ্রনের গঠন

একটি আদর্শ নেফ্রন তিনটি প্রধান অংশ (চিত্র 13.4.1) নিয়ে গঠিত : (1) রেনাল ক্যাপসুল, (2) রেনাল টিউবিউল এবং (3) জাক্সটাগ্লোমেরিউলার ভ্যাসকুলেচার।

1. রেনাল ক্যাপসুল

রেনাল ক্যাপসুল এর প্রধানতম অংশটি গ্লোমেরিউলাস। গ্লোমেরুলাস দুই স্তর বিশিষ্ট গ্লোমেরিউলার (=Bowman's) ক্যাপসুলের মধ্যে প্রোথিত থাকে। গ্লোমেরিউলার ক্যাপসুলের বাইরের স্তরে (parietal layer) থাকে সরস স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। এই ক্যাপসুলের ভিতরের স্তর তৈরি হয় একধরনের বিশেষ কোষস্তরের দ্বারা যা পোডোসাইট (podocyte) নামে পরিচিত। এই পোডোসাইট স্তর রক্তজালিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

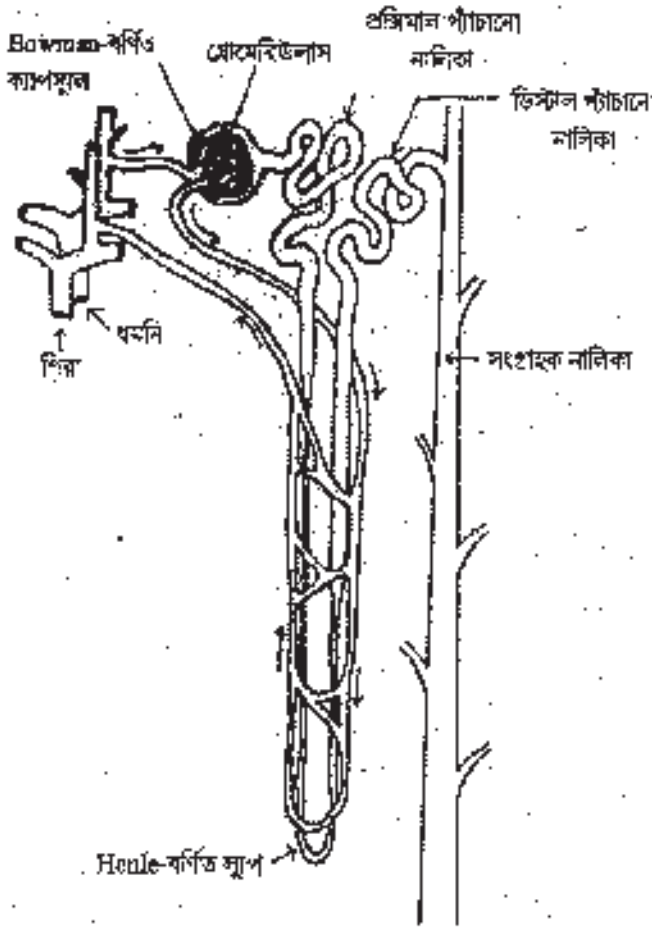

চিত্র ঃ 13.4.1 নেফ্রনের কার্যগত অংগসংস্থান

গ্লোমেরিউলার জালিকা থেকে পরিস্রুত রক্তরস গ্লোমেরিউলার ক্যাপসুলের একপ্রান্তে অবস্থিত ইউরিনারি ছিদ্র (Urinary pore) দিয়ে রেনাল নালিকায় প্রবেশ করে। ইউরিনারি ছিদ্রের অপর প্রান্তে অবস্থিত ভ্যাসকিউলার ছিদ্রপথে অ্যাফারেন্ট ও ইফারেন্ট আর্টেরিওল নির্গত হয়।

2. রেনাল টিউবিউল

রেনাল টিউবিউল হল একটি নালিকা (প্রায় 3 cm দীর্ঘ) যা গ্লোমেরিউলার ক্যাপসুল থেকে শুরু হয়ে বৃক্কের মেডুলারি পিরামিডের শীর্ষে শেষ হয়। প্রতিটি রেনাল টিউবিউল চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত; (a) প্রক্সিমাল কন্ভলিউটেড টিউবিউল, (b) নেফ্রন লুপ, (c) ডিস্টাল কন্ভলিউটেড টিউবিউল এবং (d) সংগ্রাহক নালিকা (Collecting duct)। উপরিউক্ত চারটির মধ্যে তিনটি একটি নেফ্রনের নিজস্ব, কিন্তু একটি সংগ্রাহক নালিকার সাথে অনেকগুলি নেফ্রন আলাদা আলাদাভাবে যুক্ত থাকতে পারে। নেফ্রনের প্রত্যেকটি অংশেরই বিশেষ বিশেষ গঠনগত এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য থাকে যা সামগ্রিকভাবে মূত্র উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(a) প্রক্সিমাল কন্ভলিউটেড টিউবিউল

প্রক্সিমাল কন্ভলিউটেড টিউবিউল (PCT) গ্লোমেরিউলার ক্যাপসুলের পশ্চাদ্‌বর্তী অংশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। এই অংশটি রেনাল টিউবিউলের চারটি অংশের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এবং অধিক প্যাচকুক্ত। এই কারণে প্রক্সিমাল কন্ভলিউটেড টিউবিউল বৃক্কের কর্টেক্সের প্রস্থচ্ছেদে (histological cross section) সর্বাধিক দৃশ্যমান

হয়। এই নালিকার কোষগুলি সরল কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াম ধরনের এবং এই কোষের মুক্তপ্রান্তে স্পষ্ট মাইক্রোভিলাই থাকে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই বিষয়ে আলোকপাত করে যে এই কোষ শোষণকার্যে বিশেষ উপযুক্ত।

(b) নেফ্রন লুপ বা হেনলি বর্ণিত লুপ (Loop of Henle) :

প্রক্সিমাল কনভলিউটেড নালিকা গ্লোমেরিউলার ক্যাপসুলের কাছাকাছি অঞ্চলে অত্যধিক প্যাঁচযুক্ত বিস্তারের পর হঠাৎ সোজা হয়ে একটি 'U' আকৃতির লুপ তৈরি করে। এটাই নেফ্রন লুপ বা হেনলি বর্ণিত লুপ। এই লুপের প্রথম অংশ বল্কের কর্টেক্স থেকে মেডালার অভিমুখে বিস্তৃত এবং হেনলি বর্ণিত লুপের নিম্নগামী বাহু (descending arm of loop of Henle) বলে পরিচিত। বল্কের মেডালার দিকে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর হেনলি বর্ণিত লুপের নিম্নগামী বাহু হঠাৎ 180° ঘুরে গিয়ে ঊর্ধ্বগামী বাহু তৈরি করে এবং তা পুনরায় বল্কের কর্টেক্সে প্রত্যাবর্তন করে।

কর্টিক্যাল এবং জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের ক্ষেত্রে হেনলির লুপের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কর্টিক্যাল নেফ্রনের ক্ষেত্রে হেনলি বর্ণিত লুপ জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের তুলনায় ছোট হয় এবং তা খুব অল্পক্ষেত্রেই মেডালায় প্রবেশ করে। অন্যদিকে জাক্সটামেডুলারি নেফ্রনের হেনলি বর্ণিত লুপ যথেষ্ট লম্বা হয়ে বল্কের মেডালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই ধরনের লম্বা হেনলি বর্ণিত লুপ মূত্রের ঘনীভবনের (concentration of urine) ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক (চিত্র 13.4.2)।

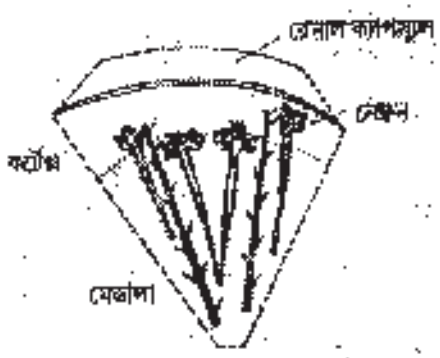

চিত্র : 13.4.2 বল্কের মধ্যে নেফ্রনের সজ্জা।

হেনলে বর্ণিত লুপের বিভিন্ন অংশের কোষসংস্থান এবং কাজ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। নিম্নে বর্ণিত লুপের অঞ্চলজাত বিন্যাস, কোষসংস্থানগত চরিত্র ও কাজ আলোচনা করা হল।

হেনলে বর্ণিত লুপের অঞ্চল	কোষ সংস্থানগত চরিত্র	কাজ
নিম্নগামী বাহু	প্রথমে সরল কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াম এবং পরে সরল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। এই শেষোক্ত অংশকে পাতলা খণ্ডাংশ (thin segment) বলে।	পাতলা খণ্ডাংশে কোষের বিপাকীয় কাজের হার অত্যন্ত কম এবং এই অঞ্চলের জলের ভেদ্যতা (water permeability) অত্যন্ত বেশি।
180° বাঁক (U-turn)	সরল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম	একই
ঊর্ধ্বগামী বাহু	প্রথমে সরল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এবং পরে আবার কিউবয়ডাল। পুরু খণ্ডাংশ (thick segment)	মোটা অংশের কিউবয়ডাল কোষের বিপাকীয় হার অত্যন্ত বেশি এবং এই অংশ বিভিন্ন দ্রবণের সক্রিয় শোষণে পারদর্শী।

(c) ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল :

হেনলি বর্ণিত পুপ বৃত্তের কর্টেক্সে প্রবেশ করার পর আবার অপেক্ষাকৃত মোটা এবং প্যাঁচানো নালিকায় রূপান্তরিত হয়। এই অংশের নাম ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল (DCT)। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউলের তুলনায় এই অংশে দৈর্ঘ্যে ছোট এবং কম প্যাঁচযুক্ত। এই নালিকার গায়ে থাকে মাইক্রোভিলাইহীন কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াম জাতীয় কোষ। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়।

(d) সংগ্রাহক নালিকা (collecting duct) :

ডিস্টাল কনভলিউটেড নামক সরুসরি সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়। এই সংগ্রাহক নালিকা মেডুলার দিকে অগ্রসর হয় এবং লম্বালম্বি অবস্থান করবার প্রায় বেশ কয়েকটি নেফ্রনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্যাপিলার নিকট এই নালিকার নাম প্যাপিলারি ডাক্ট (papillary duct) প্রায় ৩০টি প্যাপিলারি ডাক্ট একত্রে প্যাপিলা অঞ্চল থেকে মাইনর ক্যালিক্স নামক স্থানে উন্মুক্ত হয়। সংগ্রাহক নালিকা এবং প্যাপিলারি নালিকা উভয়ের স্তরই কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াম দ্বারা গঠিত।

3. জাক্সটাগ্লোমেরিউলার যন্ত্র (Juxtaglomerular apparatus) :

যে স্থানে ডিস্টাল কনভলিউটেড নালিকা গ্লোমেরিউলাসের অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী রক্তবাহের সংস্পর্শে আসে (vascular pole of renal capsule) সেখানেই থাকে এই বিশেষ কোষীয় যন্ত্র। জাক্সটাগ্লোমেরিউলার যন্ত্র নেফ্রনের নিজের কার্যকারিতার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ। এছাড়াও দেহের রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশ তিন ধরনের কোষস্তর দিয়ে গঠিত।

বিভিন্ন কোষস্তরের নাম, চরিত্র এবং কাজ নিচে চার্টের আকারে বর্ণনা করা হল।

কোষস্তরের নাম	চরিত্র এবং অবস্থান	কাজ
জাক্সটাগ্লোমেরিউলার কোষ (JG cells)	প্রলম্বিত, স্বচ্ছ পেশিকোষ; এই ধরনের কোষ মূলত অন্তর্মুখী ধমনিগাত্রে দেখতে পাওয়া যায়।	রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে
ম্যাকুলা ডেনসা (Macula densa)	সরু, নিবিড়ভাবে সন্নিবেশিত এপিথেলিয়াম। এই কোষস্তর ডিস্টাল টিবিউলের গাত্রে দেখতে পাওয়া যায়।	এখনও অস্পষ্ট
মেসানজিয়াল কোষস্তর	অন্তর্বর্তী এবং বহির্মুখী ধমনির মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং গ্লোমেরিউলাসের মধ্যে অবস্থিত রক্তজালিকার মধ্যে এই কোষের অবস্থান। অন্য দুই ধরনের কোষের সঙ্গে এরা গ্যাপ জাংশনের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করে।	এখনও অস্পষ্ট

4.7 মূত্র উৎপাদন

মূলত চারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পদ্ধতির সাহায্য বৃক্কের মাধ্যমে রক্তরস মূত্রে রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতিগুলি যথাক্রমে — (1) গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেশন, (2) নালিকা দ্বারা পুনর্শোষণ, (3) নালিকা দ্বারা ক্ষরণ এবং (4) মূত্রের ঘনীভবন (concentration of urine) (চিত্র 13.4.3)।

নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে রক্তরসের পরিবর্তিত উপাদান অনুসারে তার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে — (1) বাওম্যানস ক্যাপসুল থেকে নির্গত হওয়ার পর রক্তরসের নাম গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেট। এই তরল রক্তরসের সমতুল্য কিন্তু প্রোটিনবিহীন। (2) প্রক্সিমাল থেকে ডিস্টাল কনভলিউটেড নালিকার মধ্যস্থিত তরলের নাম tubular fluid বা নালিকাস্থ তরল। পর্যায়ক্রমে নালিকা গাত্র দ্বারা শোষণ এবং ক্ষরণের ফলে এই তরল

রক্তরসের তুলনায় বহুলাংশে আলাদা। (3) সংগ্রাহক নালিকায় প্রবেশ করার পর এই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল তরল মূত্র নামে পরিচিত হয়।

4.7.1 গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেশন

প্রোটিনবিহীন রক্তরস রক্তবাহ থেকে বাওম্যানস ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করার পরে তিনটি বাধা অতিক্রম করে (1) গ্লোমেরিউলারসের ক্যাপিলারির গাত্রে বর্তমান ছিদ্রযুক্ত এন্ডোথেলিয়াম, (2) বেসমেন্ট মেমব্রেন এবং (3) পরিস্রবণ ছিদ্র (filtration slits)।

1. গ্লোমেরিউলাসের রক্তজালিকার এন্ডোথেলিয়াল কোষে 70-90nm ব্যাসবিশিষ্ট ছিদ্র থাকে যা কেবলমাত্র রক্তকণিকাকে রক্তবাহের মধ্যে রাখতে সমর্থ।

2. এক্ষেত্রে বেসমেন্ট পর্দা আসলে একটি প্রোটিওগ্লাইক্যান জেলের মতো। এই জেল 8 nm বা তার বেশি ব্যাসবিশিষ্ট যে কোন অণুকে রক্তবাহের মধ্যে ধরে রাখে। ঋণাত্মক চার্জযুক্ত হওয়ায় কতগুলি অণুকেও (< 7 nm ব্যাসযুক্ত) এই পর্দা আটকে রাখতে পারে (হেমন, অ্যালবুমিন)। এই কারণে গ্লোমেরিউলাসের গহ্বর মধ্যস্থ তরলে প্রোটিনের পরিমাণ কম বেশি 0.30% যেটা রক্তরসের ক্ষেত্রে প্রায় 7%।

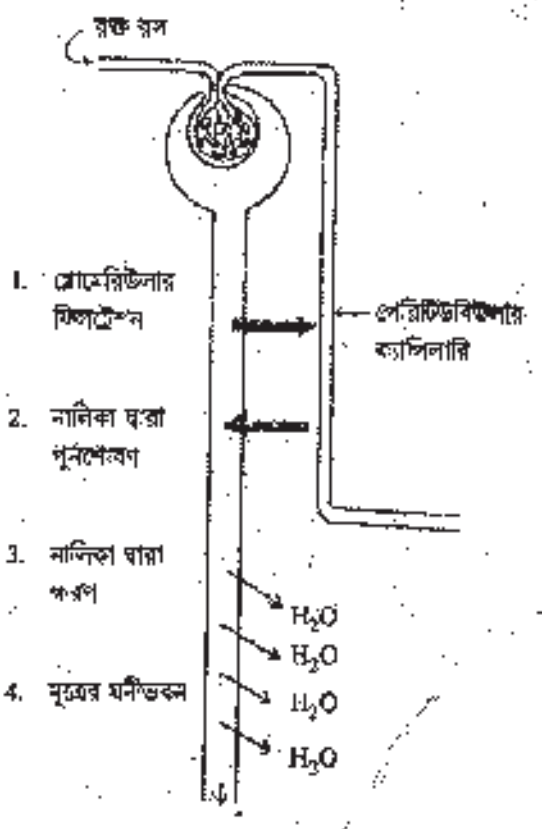

3. গ্লোমেরিউলাস ক্যাপসুলের পোডোসাইট কোষ প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে (foot process) গ্লোমেরিউলাসের ক্যাপিলারির গাত্রে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই ফুট প্রসেসের গাত্রে 30 nm ব্যাসবিশিষ্ট ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ছিদ্র থাকে যার ফলে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের অ্যানায়নগুলি পরিস্রুত তরলে আসতে পারে না।

সাধারণভাবে বলা যায় যে < 3 nm. ব্যাসবিশিষ্ট যে কোন অণু বিনা বাধায় রক্তবাহ থেকে গ্লোমেরিউলাস পরিস্রুত তরলে চলে আসতে পারে। এর ফলে এই তরলে জল, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য, গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি বর্তমান থাকে।

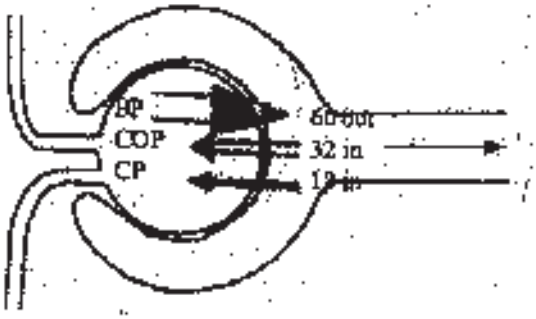

চিত্র : 13.4.4 গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেশনের উপর বিভিন্ন বলের প্রভাব

4.7.2 পরিস্রবণ চাপ (Filtration pressure)

তিন ধরনের চাপ বা বল (pressure or force) গ্লোমেরিউলাসের পরিস্রবণ নিয়ন্ত্রণ করে।

- রক্তবাহের মধ্যে রক্তচাপ (BP ; 60 mm Hg)
- ক্যাপসুলের চাপ (Capsular pressure — CP ; 18 mm Hg)
- কোলয়েড অভিস্রবণ চাপ (Colloid osmotic pressure — COP ; 32 mm Hg)

এই তিন চাপের মধ্যে শেষ দুটি প্রথমটির বিপরীতমুখী (চিত্র 13.4.4)।

এর ফলে প্রকৃত পরিস্রবণ-চাপের মান দাঁড়ায় 10 mm Hg :

$60\,mm\,Hg_{out} - (18\,mm\,Hg_{c} + 32\,mm\,Hg_{in}) = 10\,mm\,Hg_{con}$

গ্লোমেরুলিউলাসের পরিস্রবণের হার (Glomerular filtration rate ; GFR)

দুটি বৃক্ক থেকে মিনিট প্রতি পরিস্রুত তরলের পরিমাণকেই গ্লোমেরুলিউলাসের পরিস্রবণের হার (GFR) বলে। প্রতি 1 mm Hg প্রকৃত পরিস্রবণ চাপের (NFP) ফলে দুটি বৃক্ক মোট 12.5 ml তরল প্রতি মিনিটে পরিস্রুত করতে পারে। এই হারের নাম filtration coefficient (K_f)। এর থেকে আমরা পাই,

$GFR = NFP \times K_f = 10 \times 12.5 = 125\ ml/min$

এর অর্থ এই যে, সারা দিনে এই পরিমাণ দাঁড়ায়

$125\ ml \times 60 \times 24 = 180000\ ml = 180\ L$

সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ (স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে) এই পরিমাণ তরলের প্রায় 99% পুনঃশোষণ করে নিতে পারে। তাই দিনে গড় মূত্রের পরিমাণ 1-2 লিটারের বেশি নয়। এই GFR-এর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চিত্র 13.4.5 -তে দেখানো হল।

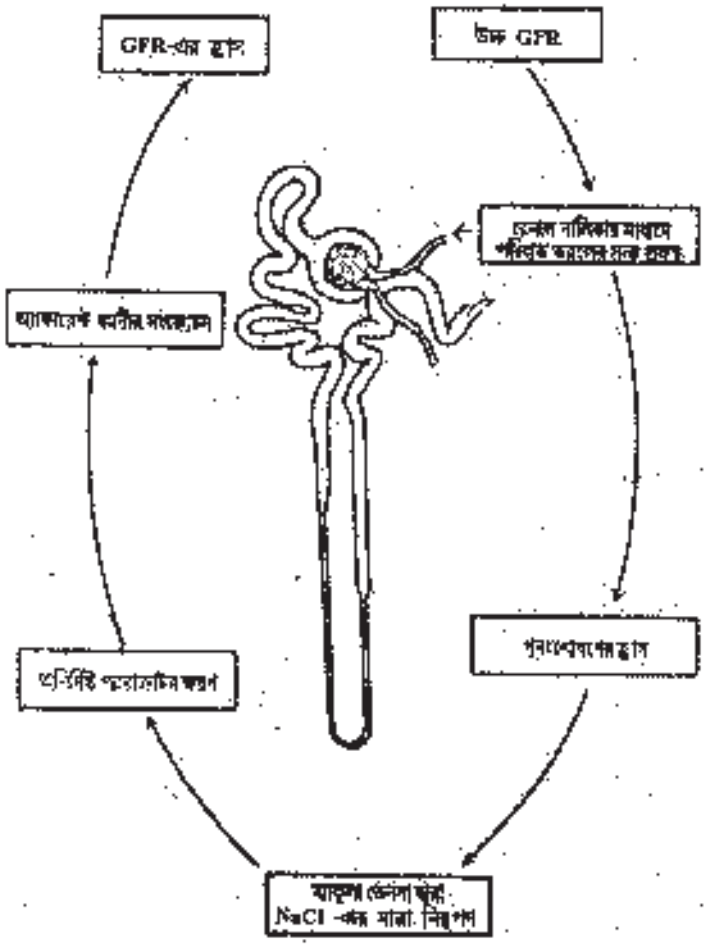

চিত্র : 13.4.5 নেগেটিভ ফিড্‌ব্যাক পদ্ধতিতে GFR -এর মাত্রার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

4.7.3. গ্লোমেরিউলাসে পরিস্রবণের নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Glomerular filtration)

বৃক্কের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল— গ্লোমেরিউলাসে পরিস্রবণের হার (GFR) বজায় রাখা। তিনটি মূল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃক্কের কাজ প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই অভিপ্রেত সাম্যাবস্থা বজায় রাখে—

(1) রেনাল অটোরেগুলেশন, (2) সিম্পাথেটিক নিয়ন্ত্রণ (Sympathetic control) এবং (3) রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন প্রক্রিয়া (Renin-Angiotensin mechanism)।

4.7.3.1 রেনাল অটোরেগুলেশন (Renal autoregulation)

জাক্সটাগ্লোমেরিউলার যন্ত্রের সাহায্যে নেফ্রন দুভাবে GFR এর মাত্রাধিক্য পরিবর্তন প্রতিহত করে।

রক্তচাপের মাত্রা	GRF প্রতিহত করার পদ্ধতি
যদি রক্তচাপ বাড়ে	1. অন্তর্মুখী ধমনি সংকোচনের ফলে কম রক্ত গ্লোমেরিউলাসে প্রবেশ করতে পারে। 2. বহির্মুখী ধমনী প্রসারণের ফলে রক্ত দ্রুত গ্লোমেরিউলাস থেকে নির্গত হতে পারে।
যদি রক্তচাপ কমে	1. অন্তর্মুখী ধমনি প্রসারণের ফলে বেশি রক্ত গ্লোমেরিউলাসে প্রবেশ করতে পারে। 2. বহির্মুখী ধমনির সংকোচনের ফলে গ্লোমেরিউলাসে রক্ত বেশিক্ষণ থাকতে পারে যাতে GRF ঠিক থাকে।

নিম্নলিখিত দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি :

1. জাক্সটাগ্লোমেরিউলার যন্ত্রের মাধ্যমে এর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নয়; এটা একধরনের চলমান সাম্যাবস্থা মাত্র (Dynamic equilibrium)।

2. রক্তচাপের অত্যধিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই যন্ত্র বিশেষ কার্যকরী নয়।

4.7.3.2 সিম্প্যাথেটিক নিয়ন্ত্রণ (Sympathetic Control)

বৃক্কের মধ্যে অবস্থিত প্রায় সমস্ত রক্তবাহের সঙ্গে সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্তু সংযুক্ত থাকে। সংবহনতন্ত্রের সাময়িক কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে (Circulatory shock) এই সিম্প্যাথেটিক নার্ভতন্তু এবং এপিনেফ্রিন যৌথ ভাবে নেফ্রনে অবস্থিত অন্তর্মুখী ধমনির যথেষ্ট সংকোচন ঘটায়। এর ফলে রক্ত বহুলাংশে হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক বা কঙ্কালপেশির দিকে ধাবিত হয়। এতে একদিকে যেমন GRF অত্যধিক কমে যায়, অপরদিকে তেমনই দেহ রক্ষা পায়।

4.7.3.3. রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন প্রক্রিয়া

যখন রক্তচাপ অত্যধিক কমে যায়, জাক্সটাগ্লোমেরিউলার যন্ত্র তখন রেনিন নামক এক উৎসেচক নিঃসরণ করে। এই রেনিন রক্তরসে বর্তমান অ্যানজিওটেনসিনোজেন নামক প্রোটিনকে অ্যানজিওটেনসিন-I এ পরিণত করে, ফুসফুসের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার সময় অ্যানজিওটেনসিন-পরিবর্তনকারী উৎসেচক (Angiotensin converting enzyme; ACE) অ্যানজিওটেনসিন-I কে অ্যানজিওটেনসিন-II হরমোনে রূপান্তরিত করে। এই হরমোনের বহুমাত্রিক কাজের মাধ্যমে দেহে রক্তচাপ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে (চিত্র 13.4.6)।

4.7.4 নালিকা দ্বারা পুনর্শোষণ এবং ক্ষরণ (Tubular reabsorption and secretion)

গ্লোমেরিউলাসের পরিস্রুত তরল নেফ্রনের মধ্য দিয়ে চলনের সময় ওই তরল থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু শোষণ এবং নেফ্রন-নালিকা গাত্র থেকে কিছু কিছু বস্তু ক্ষরণের ফলে গ্লোমেরিউলাস-পরিস্রুত তরলের গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে মূত্র উৎপন্ন হয়।

● প্রক্সিমাল কনভলিউটেড নালিকা

নেফ্রনের এই অংশ গ্লোমেরিউলাসের পরিস্রুত তরলের 65% শোষণ করে পেরিটিউবিউলার কাপিলারির মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। এই কাজ করতে প্রচুর পরিমাণ ATP খরচ হয় যা দেহের মোট উৎপাদিত ATP-এর প্রায় 6%। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড নালিকার মাধ্যমে শোষণের বিষয়বস্তু ছকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

দুটি প্রধান পথে এই পুনর্শোষণের ঘটনা ঘটে থাকে। নালিকার গাত্রে অবস্থিত কোষের সাইটোপ্লাজমের মাধ্যমে পুনর্শোষণ ঘটলে, এই পথের নাম ট্রান্সসেলুলার রুট। পক্ষান্তরে নালিকা-গাত্রে অবস্থিত কোষগুলি মধ্যস্থ মুক্তস্থান মারফত পুনর্শোষণ ঘটলে তার নাম প্যারাসেলুলার রুট।

শোষিত বস্তুর নাম	মূল শোষণ প্রক্রিয়া
সোডিয়াম আয়ন (Na^+)	ট্রান্সসেলুলার এবং প্যারাসেলুলার রুট; Na^+ - K^+ পাম্প
গ্লুকোজ	সোডিয়াম-নির্ভর গ্লুকোজ পরিবহন (Na-dependent glucose transport ; SGLT) যা আসলে একধরনের সিম্পোর্ট ; গৌণ সক্রিয় পরিবহন (ATP খরচ ব্যতীত)।
অ্যামাইনো অ্যাসিড	অধিকাংশ অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুকোজের মতোই পুনর্শোষিত হয়। অন্যান্য পদ্ধতিগুলি হল—
	(i) কো-ট্রান্সপোর্ট, (ii) সহায্যপ্রাপ্ত ব্যাপন (FD) এবং (iii) সলভেন্ট ড্রাগ (Solvent drag)
জল	(i) প্যারাসেলুলার পথে ব্যাপন (diffusion through paracellular route)
	(ii) ট্রান্সসেলুলার পথে অভিস্রবণ (Osmosis through transcellular route)
	(iii) বাধ্যতামূলক জল পুনর্শোষণ (obligatory water reabsorption)
ক্লোরাইড (Cl^-)	প্যারাসেলুলার এবং ট্রান্সসেলুলার— এই উভয় পক্ষেই Cl^- -এর পুনর্শোষণ হয়ে থাকে। এই পুনর্শোষণ দুটি মূল পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে থাকে।
	(i) Na^+ -সংযুক্ত সহপরিবহন (Na^+-linked co-transport) এবং
	(ii) ক্লোরাইড শিফ্ট (Chloride Shift)

অন্যান্য ভক্তিৎ বিশ্লেষ্য	
● K^+, Mg^{2+}	প্যারাসেলুলার পথে সলভেন্ট ড্রাগের মাধ্যমে
● SO_4^{2-}, PO_4^{3-}, NO_3^-	শোষিত হয় না, মূত্রে বর্তমান থাকে।
● বাইকার্বনেট সকল	শোষিত হয় না, প্রশমিত হয়
প্রোটিন	পিনোসাইটোসিসের মাধ্যমে ছোট প্রোটিন পুনর্শোষিত হয়। নালিকার অভ্যন্তরে বড় প্রোটিন হাইড্রোলিসিস পদ্ধতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হলে তা সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাপনের মাধ্যমে পুনর্শোষিত হয়।
নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থসমূহ	
ইউরিয়া	জলের সঙ্গে ইউরিয়া ব্যাপনের মাধ্যমে পুনর্শোষিত হয়। নেফ্রনের মধ্যে অবস্থিত ইউরিয়ার 40% থেকে 60% এইভাবে নেফ্রনের বাইরে রক্তবাহে প্রবেশ করে। যেহেতু নেফ্রন থেকে 99% জল পুনর্শোষিত হয় তাই মূত্রে ইউরিয়ার শতকরা হার অত্যন্ত বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বৃক্কে প্রবেশ করার আগে রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ প্রায় 20 mg/dl। বৃক্ক বৃক্ক থেকে বাইরে বেরোনোর সময় এই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় 10.4 gm/dl; অর্থাৎ, বৃক্ক রক্ত থেকে ইউরিয়া সম্পূর্ণরূপে আলাদা করতে পারে না, কেবল এর মাত্রা বিপজ্জনক মাত্রার নিচে নামিয়ে দেয় মাত্র।
ইউরিক অ্যাসিড	প্রক্সিমাল কনভলিউটেড নালিকা যদিও ইউরিক অ্যাসিড পুনর্শোষণ করে নেয়, নেফ্রনের পরবর্তী অংশে তা আবার ক্ষরণের মাধ্যমে নেফ্রনের মধ্যে ফিরে আসে।
ক্রিয়েটিনিন	শোষিত হয় না।

● হেনলে বর্ণিত লুপ

নেফ্রনের এই অংশে প্রধানত জল এবং কিছু আয়ন পুনর্শোষিত হয়ে থাকে। নালিকামধ্যস্থ Na^+, K^+ এবং Cl^--এর 25% এবং জলের 20% এই অংশে শোষিত হয়। একটি Na^+, একটি K^+ এবং দুটি Cl^- আয়ন একত্রে কো-ট্রান্সপোর্ট (Co-transport) পদ্ধতিতে নালিকার বাইরে রক্তবাহে উন্মুক্ত হয়।

● ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল

অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত অ্যালডোস্টেরন এবং হৃৎপিণ্ডের মায়োকার্ডিয়াম থেকে নিঃসৃত এট্রিয়াল অ্যান্টিইউরেটিক ফ্যাক্টরের (atrial antiuretic factor, ANF) যৌথ প্রভাবে ডিস্টাল কনভলিউটেড নালিকা প্রধানত Na^+, Cl^-, HCO_3^- এবং জল পুনর্শোষণে সক্ষম। নেফ্রনের এই অংশ মূত্রের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণের শেষ প্রহরী বলে পরিচিত, যদিও এই অংশের প্রধান কাজ সংগ্রাহক নালিকাকে সাহায্য করা।

● সংগ্রাহক নালিকা

সংগ্রাহক নালিকা বৃক্কের কর্টেক্স থেকে মেডালার কিছু অংশ পর্যন্ত অনুদৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। কর্টেক্স অবস্থানকালে নেফ্রন থেকে যে তরল এই নালিকা সংগ্রহ করে তা রক্তরসের তুলনায় আইসোটোনিক ধরনের হয় (300 m Osm/L)। নিম্নমুখী গমনের পরে ক্রমাগত সংগ্রাহক নালিকা দ্বারা জলশোষণের ফলে এই তরলে

প্রাব্যের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে তার ঘনত্ব প্রায় চারগুণ (×4) বৃদ্ধি পায় (চিত্র : 13.4.7)। ফলে মূত্র রক্তরসের

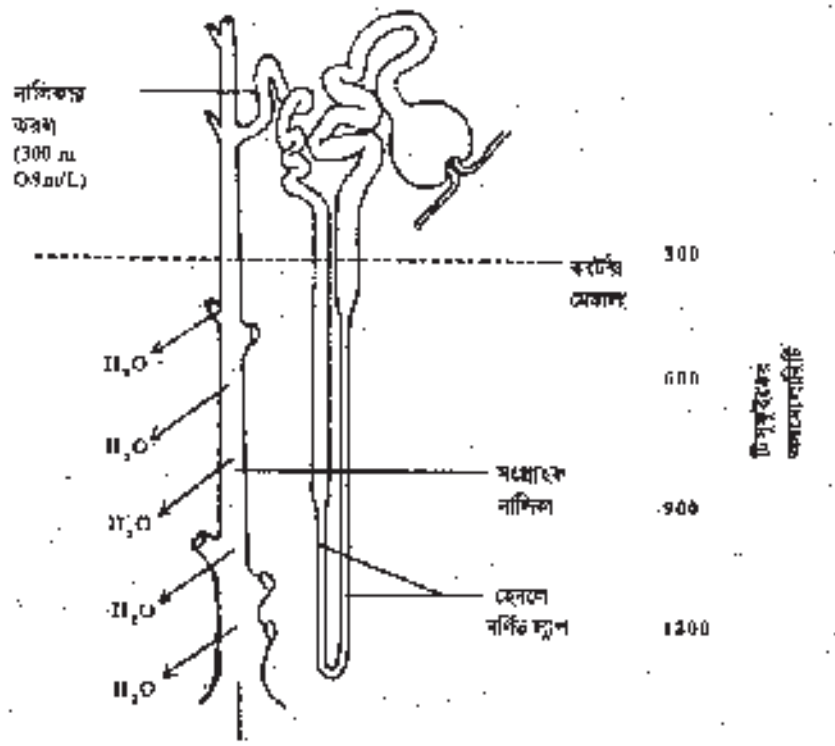

চিত্র : 13.4.7. সংগ্রাহক নালিকা দ্বারা জলের পুনর্শোষণ।

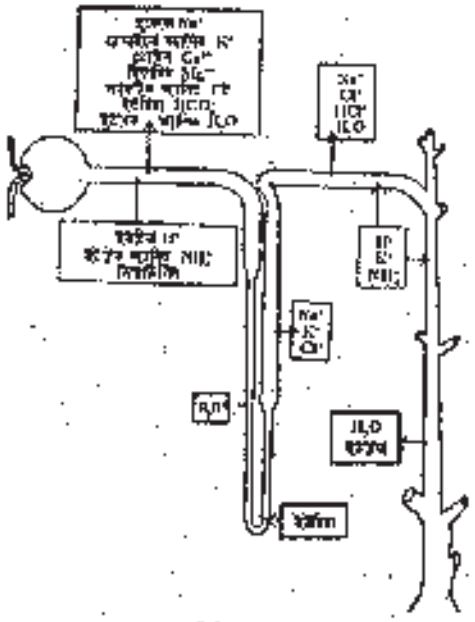

চিত্র : 13.4.8 নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে নানা প্রকারের প্রাব পুনর্শোষিত এবং ক্ষরিত হয়।

তুলনায় হাইপারটনিক হয়ে থাকে. দুটি বিশেষ ঘটনায় এই ঘনীভবন সম্ভবপর হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন : (1) বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে নেফ্রন মধ্যস্থ তরলের তুলনায় ওই অঞ্চলের আন্তর্কোষীয় তরলের অভিস্রবণ গুণাঙ্ক (Osmolarity) প্রায় চারগুণ বেশী এবং (2) সংগ্রাহক নলিকার গাত্র জলভেদ্য কিন্তু লবণ অভেদ্য প্রকৃতির প্রক্সিমাল কনভলিউটেড থেকে সংগ্রাহক নালিকা পর্যন্ত পুনর্শোষণ এবং ক্ষরণের বিবরণ চিত্র : 13.4.8 দেওয়া হল।

মূত্রের ঘনত্ব কি পর্যায়ের হবে তা নির্ভর করে দেহস্থ তরলের জলসাম্যের উপর। শরীরে জল কমে অথবা বেড়ে গেলে (কম জলপান অথবা অত্যধিক জলপানের কারণে) যথাক্রমে অতি ঘন অথবা অতি তরল মূত্র তৈরী হয়। এই ব্যাপারে অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোনের (ADH) ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

4.7.5. নালিকা দ্বারা ক্ষরণ (Tubular secretion)

নালিকা দ্বারা ক্ষরণ বলতে নেফ্রন বহির্ভূত রক্তবাহ থেকে সৃষ্টিত পদার্থসমূহের নেফ্রন নালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাকে বোঝায় নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে ক্ষরণের বিষয়গুলি নিম্নে বর্ণনা করা হল (চিত্র 13.4.8)।

● **প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিল (PCT)**

এই অংশে দ্বারা ক্ষরণ সম্পর্কিত বিষয়বস্তুকে দুটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়।

1. **বর্জ্য পদার্থের ক্ষরণ (Waste removal)**

যে সমস্ত বর্জ্যপদার্থ নেফ্রনের এই অংশে ক্ষরিত হয় তারা জল, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড; পিত্ত লবণ, অ্যামোনিয়া, ক্যাটেকলঅ্যামাইন এবং ক্রিয়াটিনিন। ডিস্টাল কনভলিউটেড অংশে যে পরিমাণ ইউরিয়া শোষিত হয় তার প্রায় সবটাই ক্ষরণের মাধ্যমে নালিকার অভ্যন্তরে ফিরে আসে এবং মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। উপরিউক্ত বস্তু ছাড়াও নেফ্রনের এই অংশ কতকগুলি ড্রাগ (drug) ক্ষরণের মাধ্যমে রক্তবাহ থেকে নেফ্রনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এই সব ড্রাগের বিষক্রিয়া থেকে দেহকে রক্ষা করে। পেনিসিলিন, অ্যাসপিরিন ইত্যাদি ড্রাগ দেহ থেকে এইভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়।

2. **অম্ল-ক্ষার সাম্য (acid-base balance)**

প্রয়োজন অনুসারে রক্তবাহ থেকে H^+ এবং আয়ন নেফ্রনের মধ্যে ক্ষরণের মাধ্যমে দেহজ তরলের pH আদর্শ অবস্থার কাছাকাছি (সামান্য কম অথবা সামান্য বেশি) মাত্রায় অবস্থান করে। নানারকমের শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য pH -এর সাম্যাবস্থা অত্যন্ত জরুরি। HCO_3^-

● **হেনলে বর্ণিত লুপ (Loop of Henle)**

হেনলে বর্ণিত লুপের প্রধান কাজ হল মূত্রের ঘনীভবনের ক্ষেত্রে সংগ্রাহক নালিকাকে সাহায্য করা। তথাপি এই অংশে কিছুকিছু বস্তু পুনর্শোষণ ছাড়াও নালিকার অভ্যন্তরে ইউরিয়ার সামান্য ক্ষরণ ঘটায়।

● **ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল (DCT)**

নেফ্রনের এই অংশ প্রক্সিমাল কনভলিউটেড নিউবিউলের মতো কিছু কিছু বস্তু নালিকার অভ্যন্তরে ক্ষরণ করে, যেমন— ড্রাগ, কিছু দ্রাব্য এবং কিছু বর্জ্যপদার্থ।

4.7.6 কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার পদ্ধতি (Counter current multiplier system)

সংগ্রাহক নালিকা স্তরে জলের পুনর্শোষণ যে বিষয়ের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল তা হল বৃক্কের মেডালা অঞ্চলে লবণের ক্রমবর্ধমান আধিক্য। বৃক্কের কর্টেক্স ও মেডালার সংযোগস্থল থেকে শুরু করে মেডালার অভ্যন্তর পর্যন্ত লবণের মাত্রা প্রায় 4 গুণ বেশি হয়ে থাকে। সাধারণ বিজ্ঞানবোধে মনে হয় এই কর্টেক্স থেকে মেডেলা পর্যন্ত লবণের ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপনের মাধ্যমে কর্টেক্সের দিকে ক্রমশ সাম্যাবস্থায় যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। হেনলে বর্ণিত লুপ তা হতে দেয় না। এই লুপ একটি কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার হিসাবে কাজ করে যা সর্বদা বৃক্কের মেডেলা অঞ্চলে লবণের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। যেহেতু এই লুপের দুটি বাহুর মধ্যে তরলের চলন বিপরীতমুখী (চিত্র 13.4.9) তাই এই ব্যবস্থার নাম কাউন্টারকারেন্ট। অপরপক্ষে যেহেতু এই ব্যবস্থা বৃক্কের কর্টেক্স থেকে মেডেলা পর্যন্ত লবণের মাত্রা বাড়িয়েই চলে তাই এর নাম মাল্টিপ্লায়ার।

কাউন্টারকারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃক্কের মেডেলা অঞ্চলে লবণের পরিমাণগত আধিক্য কীভাবে বজায় থাকে তা নিচের ব্যাখ্যা চিত্রের মাধ্যমে বোঝান হল।

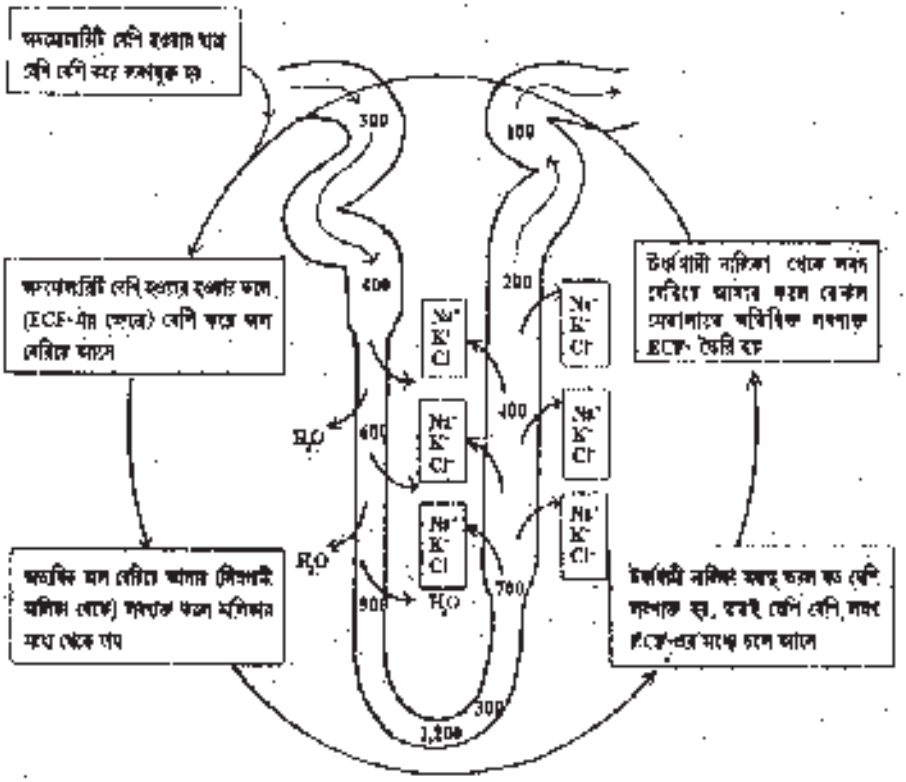

চিত্র ঃ 13.4.9 নেফ্রনের কাউন্টার মাল্টিপ্লায়ার পদ্ধতি।

4.8 মূত্রের ধর্ম এবং উপাদানসমূহ

4.8.1 মূত্রের ধর্ম

1. মূত্র সাধারণত হালকা হলুদ বর্ণের তরল। মূত্রের হালকা হলুদভাবের জন্য দায়ী হিমোগ্লোবিনজাত একটি রঞ্জক যার নাম ইউরোক্রোম (urochrome)। শারীরিক অবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, দেহের জলসাম্য, বিভিন্ন অসুখ ইত্যাদি কারণে মূত্রে বর্ণ নানারকম হতে পারে, যথা—গোলাপী, সবুজ, বাদামী, কালো ইত্যাদি। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফলে অনেক সময় মূত্র অস্বচ্ছ প্রকৃতির হতে পারে।

2. সদ্য নির্গত মূত্রের একটি স্বকীয় (distinctive) গন্ধ থাকে। কিন্তু সময় পরে ব্যাকটেরিয়ার অবাধ বংশবৃদ্ধির দরুন ইউরিয়া থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। মূত্রের এই গন্ধই সর্বাধিক পরিচিত।

3. মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) 1.001 থেকে 1.035 থেকে 1.035 পর্যন্ত হয়।

4. মূত্রের অসমোলারিটি (Osmolarity; Osm/L) 50 থেকে 1,200 পর্যন্ত হতে পারে।

5. যদিও মূত্রের pH 4.5 থেকে 8.2-এর মধ্যে পরিবর্তনশীল, সাধারণত এর মান 6.0-এর কাছাকাছি (স্বাভাবিক আম্লিক)।

4.8.2. মূত্রের উপাদান

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানসমূহের (মানুষের ক্ষেত্রে সারাদিনের হিসাবে) গুণগত এবং পরিমাণগত হিসাব এই রকম

জল	—	1-2 লিটার (L)
ক্লোরাইড (Cl^-)	—	6.3 gm.
পটাসিয়াম (K^+)	—	2.0 gm.
ইউরিয়া	—	25 gm.
সোডিয়াম (Na^+)	—	4.6 gm.
ক্রিয়াটিনিন	—	1.6 gm.
ইউরিক অ্যাসিড	—	0.8 gm.
বাইকার্বোনেট (HCO_3^-)	—	0.0 gm.
প্রোটিন	—	0.1 gm.
গ্লুকোজ	—	0.0 gm.

4.9 বৃক্কের কাজ সম্পর্কিত পরীক্ষা

নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকেরা বৃক্কের কার্যগত অবস্থা নির্ধারণ করেন।

রেনাল ক্লিয়ারেন্স (Renal Clearance)

সাধারণভাবে রক্ত এবং মূত্রের নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে $C = \frac{UV}{P}$ ক্লিয়ারেন্স নিরূপণ করা হয়।

C = রেনাল ক্লিয়ারেন্স,

U = মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ,

P = রক্তরসে ইউরিয়ার পরিমাণ,

এবং V = মূত্র উৎপাদনের হার।

যদি U, P এবং V-এর মান যথাক্রমে 6.0 mg/ml, 0.2 mg/ml এবং 2 ml/minute হয়, তবে (আদর্শ অবস্থায়)

$$C = \frac{UV}{P} = \frac{(6.0 mg/ml) \times 2 ml/min)}{0.2 ml/ml}$$
$$= 60 ml/min.$$

4.10 অসমোকনফরমার এবং অসমোরেগুলেটর (Osmoconformer and Osmoregulator)

দেহজ তরলের মধ্যে জল এবং ওই জলে দ্রবীভূত দ্রব্যের পরিমাণের তুলনামূলক অবস্থাকে দেহজ তরলের অসমোলারিটি (Osmolarity) বলা হয়। প্রাণীজগতের কেউ কেউ এই অসমোলারিটিকে পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারে আবার অনেকে পারে না। যারা পারে তারা অসমোরেগুলেটর এবং যারা পারে না তারা অসমোকনফরমার নামে পরিচিত।

দেহতরলের অসমোলারিটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারা এবং না পারার ভিত্তিতে সমগ্র প্রাণীকুলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, : (1) Strict osmoregulator, (2) Limited osmoregulator এবং (3)

osmoconformer। এই সমস্ত প্রাণীদের দেহরসতরলের অসমোলারিটির সাপেক্ষে পরিবেশের অসমোলারিটির পরিমাপগত লেখচিত্রটি দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয় (চিত্র 13.4.10)।

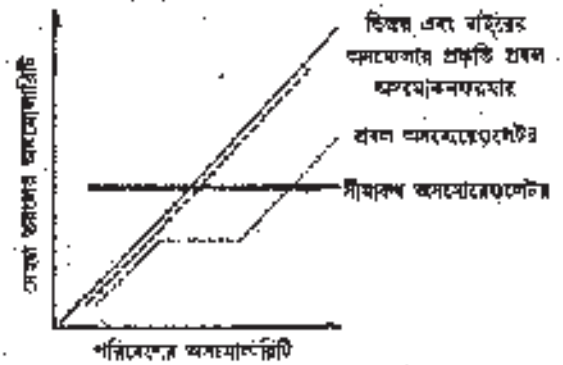

চিত্র : 13.4.10 বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে পরিবেশের তুলনায় দেহের অসমোলারিটির তুলনামূলক লেখচিত্র।

4.10.1. অসমোকনফরমার প্রাণীসকল (Osmoconformer animals)

প্রায় সমস্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা সাধারণত অসমোকনফরমার হয়ে থাকে। এদের দেহরস তরলের অসমোলারিটি (কয়েকটি দ্রাব্যের ক্ষেত্র ব্যতীত, যেমন Mg^{++}) সমুদ্রের জলের সমান, অন্তর্কোষীয় তরল সমুদ্রজলের তুলনায় আইসোটোনিক হওয়ার ফলে জলের দেহের মধ্যে প্রবেশ করা অথবা দেহের বাইরে বার হওয়ার কোন উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় না। এই সব প্রাণীরা অভিস্রবণ সাম্যাবস্থা (Osmotic equilibrium) বজায় রাখতে সর্বদা সক্ষম হয়। মেরুদণ্ডীদের মধ্যে প্রাচীন হ্যাগফিশরা (Hagfish) প্রবলভাবে অসমোকনফরমার (Strict osmoconformer)। এছাড়াও হাঙর এবং অন্যান্য তরুণাস্থিযুক্ত মাছেদের (class-chondrichthyes) দেহরস তরল সমুদ্রজলের তুলনায় আইসোটোনিক প্রকৃতির। এদের ক্ষেত্রে অবশ্য রক্তে বর্তমান NaCl-এর পরিমাণ সমুদ্রজলে NaCl-এর তুলনায় কম থাকে। এই অসমোলারিটির সামান্য তফাত রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণের কারণে প্রশমিত হয়ে থাকে।

4.10.2 অসমোরেগুলেটর প্রাণীসকল (Osmoregulator animals)

সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীরা (উপরিউক্ত ক্ষেত্র বাদে) অসমোরেগুলেটর প্রকৃতির পরিবর্তিত পরিবেশে ও যেহেতু এইসব প্রাণীদের দেহরস তরলের অসমোলারিটি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় থাকে, তাই মেরুদণ্ডী প্রাণীরা নানা রকমের পরিবেশে বিবর্তনের পথে সাফল্য লাভ করেছে। এর জন্য সর্বদা বিভিন্ন মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। প্রধানত তিন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। (নিচের সারণী এবং চিত্র 13.4.11 দ্রষ্টব্য)

প্রাণী (মেরুদণ্ডী)	পরিবেশের তুলনায় দেহরস তরলের অসমোলারিটি/জলের পরিমাণ	প্রধান প্রধান প্রক্রিয়া
মিঠা জলে বসবাসকারী	হাইপারটনিক	(i) দেহে জলের প্রবেশ রোধ করা। (ii) যদি জল প্রবেশ করে তবে তা বার করে দেওয়া (iii) দেহরস তরলে অজৈব আয়ন পুনর্শোষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখা।
সামুদ্রিক	হাইপোটনিক	(i) দেহ থেকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জলের নিষ্ক্রমণ রোধ করা। (ii) অতিমাত্রায় সমুদ্রজল পান করা।

প্রাণী (মেরুদণ্ডী	পরিবেশের তুলনায় দেহস্থ তরলের অসমোলারিটি/জলের পরিমাণ	প্রধান প্রধান প্রক্রিয়া
		(iii) ত্বক এবং ফুলকার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন পরিত্যাগ করা।
স্থলবাসী	দেহস্থ জল পরিবেশের তুলনায় অনেক বেশি	উন্নতমানের রেচনযন্ত্রের মাধ্যমে দেহস্থ জলবিয়োগ যথাসম্ভব রোধ করা।

প্রাণী	পরিবেশের তুলনায় রক্তের অসমত্ব	রক্তের তুলনায় মূত্রের অসমত্ব	
সামুদ্রিক ইলাসমোব্রাঙ্ক	আইসোটোনিক	আইসোটোনিক	
সামুদ্রিক টিলিওস্ট	হাইপোটোনিক	আইসোটোনিক	
মিঠা জলের টিলিওস্ট	হাইপারটোনিক	হাইপোটোনিক	
উভচর	হাইপারটোনিক	প্রবলভাবে হাইপোটোনিক	
সামুদ্রিক সরীসৃপ	হাইপোটোনিক	আইসোটোনিক	
স্তন্যপায়ী	—	প্রবলভাবে হাইপারটোনিক	
সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী	হাইপোটোনিক	ঐ	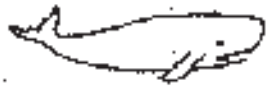
সামুদ্রিক পাখি		ক্ষীণভাবে হাইপারটোনিক	
পাখি	—	ঐ	

চিত্র : 13.4.11. কয়েকপ্রকার মেরুদণ্ডীর দেহের জল এবং লবণের আপেক্ষিক অবস্থা।

4.11. প্রশ্নাবলি

1. বৃক্কের গঠন বর্ণনা করুন।
2. বৃক্কের কাজ বর্ণনা করুন।
3. বৃক্ক এবং অন্য অঙ্গের রেচনক্রিয়ার মাধ্যমে কী কী নির্গত হয়?
4. বৃক্কীয় সংবহন বর্ণনা করুন।
5. কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার প্রণালি বর্ণনা করুন।
6. মূত্রের ধর্ম ও উপাদানগুলি লিখুন।
7. যে পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকরা বৃক্কের কার্যগত অবস্থা নির্ধারণ করেন তা লিখুন।
8. অসমোকনফরমার প্রাণী বিশেষত্ব বর্ণনা করুন।
9. অসমোরেগুলেটর প্রাণীদের বিশেষত্ব বর্ণনা করুন।
10. টীকা লিখুন
    (a) রেনাল ক্যাপসুল
    (b) রেনাল টিউবিউল
    (c) প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল
    (d) নেফ্রন লুপ বা হেনলি বর্ণিত লুপ
    (e) ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল
    (f) সংগ্রাহক নালিকা
    (g) জাক্সটাগ্লোমেরিউলার যন্ত্র
    (h) গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেশন

4.12 উত্তরমালা

1.	4.2	দেখুন
2.	4.3	”
3.	4.4	”
4.	4.5	”
5.	4.7.6	”
6	4.8.1. – 4.8.2	”
7.	4.9	অংশ দেখুন
8.	4.10.1	”
9	4.10.2	”
10.	4.7	অংশ দেখুন

একক 5 □ স্নায়বিক সংবেদন

গঠন

5.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

5.2. স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

5.3. নিউরোগ্লিয়া কোষ

5.4. আদর্শ স্নায়ুকোষের গঠন

5.4.1. কোষদেহ

5.4.2 অ্যাক্সন

5.5. স্নায়ুকোষের প্রকারভেদ

5.6. সোয়ান কোষ এবং মায়ালিন সিথ্

5.7. স্নায়ু সংবেদনের পরিবহন

5.7.1. কোষপর্দার তড়িৎ বিভব

5.7.2. অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল

5.7.3. অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহ

5.7.4. অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল প্রবাহের গতিবেগ ও প্রকারভেদ

5.7.5. প্রান্তকর্মিকর্ম এবং স্নায়ুবিভবের স্থানান্তর

5.8. নিউরোট্রান্সমিটার

5.9. প্রশ্নাবলী

5.10. উত্তরমালা

5.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

স্নায়ুতন্ত্র হল দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংবেদন আদান-প্রদান এবং যোগাযোগের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রা। তিনটি প্রধান কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র এই কাজ করে— (1) পরিবর্তনের অনুভবন (Sensing change), (2) অনুভূত বিষয়ের বিশ্লেষণ (interpretation) এবং (3) প্রতিক্রিয়া।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এবং কর্মপ্রণালী অত্যন্ত জটিল হলেও দুধরনের প্রধান কোষদ্বারা স্নায়ুতন্ত্র গঠিত—(1) নিউরোগ্লিয়া এবং (2) নিউরোন। সংবেদন পরিবহনকারী মাধ্যম হিসাবে নিউরোনের বিশেষত্ব সর্বজনবিদিত। এছাড়া নিউরোনের সুস্থাস্থ্য এবং যথাযথ কাজের জন্য তথা সুরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত যে শতকোটি কোষ বর্তমান তাদের সামগ্রিকভাবে নিউরোগ্লিয়া কোষ বলে (Neuroglial cells)। বর্তমান অংশে স্নায়বিক সংবেদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্য :

এই অংশটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- স্নায়বিক সংবেদনের মূল তত্ত্ব।
- স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন কোষসমূহ সম্পর্কে।

- স্নায়ু সংবেদন পরিবহনের বিভিন্ন পথতিসমূহ।
- বিভিন্ন প্রকার নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ।

5.2 স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ

মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—(1) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system), (2) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system) এবং (3) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomous nervous system) এবং (3) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomous nervous system) মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Brain and spinal cord) নিয়ে কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র আবার অ্যাফারেন্ট এবং ইফরেন্ট এই দুইভাগে বিভক্ত সিমপ্যাথেটিক গ্যাংলিয়া, নার্ভ এবং যোজক নার্ভ নিয়ে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভাগ নিম্নে দেওয়া হল—

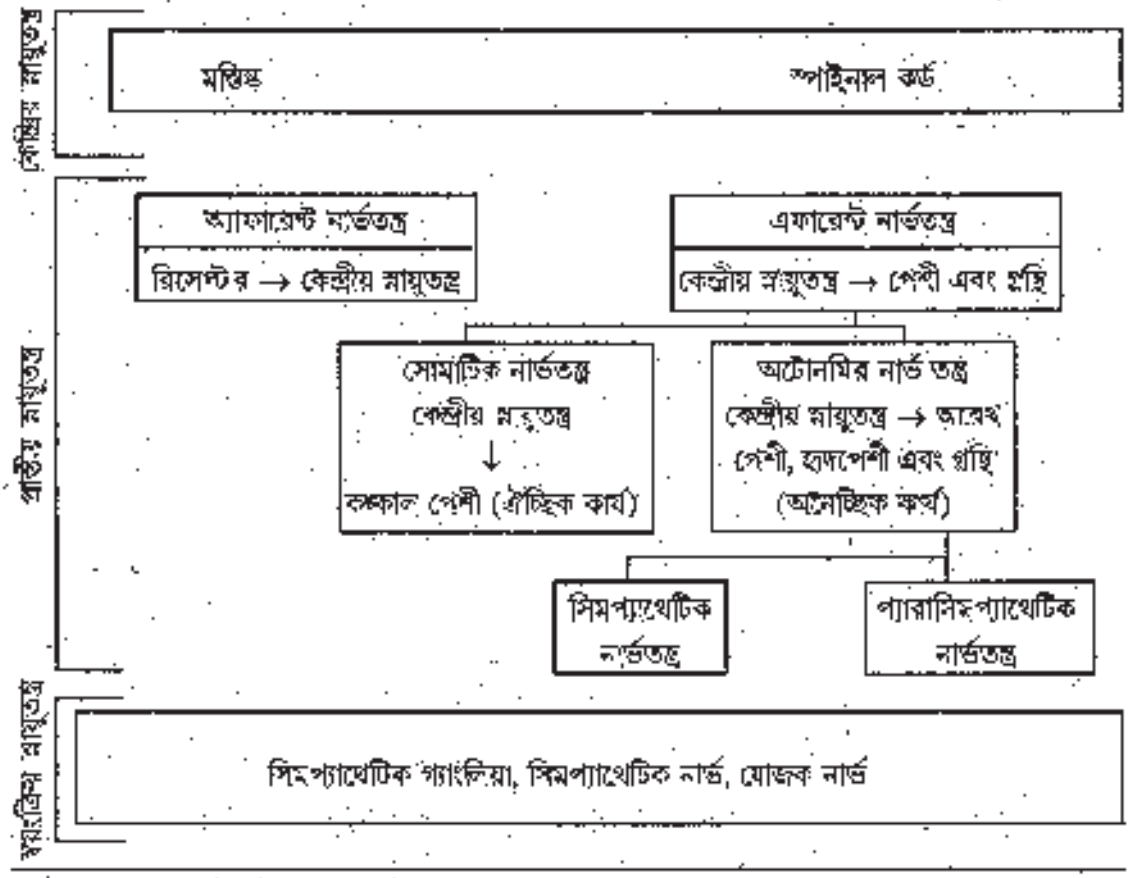

5.3, নিউরোগ্লিয়া কোষ (Neuroglia cells)

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে মোট ছয়রকমের নিউরোগ্লিয়া কোষ দেখতে পাওয়া যায়।

1. **সোয়ান্ কোষ (Schwan cells) :** এই কোষসমূহ মস্তিষ্ক বহির্ভূত নার্ভের গায়ে নিউরিলেমা নামক এক সুরক্ষা আবরণ প্রদান করে।

2. স্যাটেলাইট কোষ (Satellite cells) : প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের (PNS) নিউরোনের কোষদেহের (Cell body) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই কোষসমূহ অবস্থান করে। এদের কাজ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই।

3. অলিগোডেনড্রসাইটস (Oligodendrocytes) : অলিগোডেনড্রসাইটস্ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুতন্তুর চারপাশে মায়েলিন বিদ্ (Myelin sheath) গঠন করলেও নিউরিলেমা গঠনে অক্ষম।

4. অ্যাসট্রোসাইট কোষ (Astrocytes) : এই কোষসমূহ সাধারণত তারকা আকৃতির হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের প্রায় 90% কলা এই কোষ দিয়ে তৈরি হয়। মস্তিষ্কের আবরণ তৈরি ছাড়াও এরা মূলত প্রান্তসন্নিকর্ষ অঞ্চল ছাড়া অন্য সব জায়গায় বিন্যস্ত থাকে।

5. এপেন্ডাইমাল কোষ (Ependymal cells) : এপেন্ডাইমাল কোষসমূহ সেরিব্রোস্পাইনাল তরলের উৎপাদন এবং তার সংবহনের জন্য দায়ী।

6. মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia) : মাইক্রোগ্লিয়া হল একধরনের চলমান ম্যাক্রোফাজ যা মোনোসাইট নামক রক্তকণিকা থেকে সৃষ্টি হয়। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থানকারী সমস্ত কোষের মধ্যে এরাই একমাত্র ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করে। এই বিশেষ কোষ সমগ্র কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে অনায়াসে বিচরণ করে এবং মৃত স্নায়ুকোষ, বিভিন্ন মাইক্রোব বিভিন্ন অ্যান্টিজেন ইত্যাদিকে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ভক্ষণ করে।

সমস্ত রকমের নিউরোগ্লিয়া কোষের অবস্থান এবং কাজ নিয়ে ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

কোষের প্রকার	অবস্থান	কাজ
1. শোয়ান কোষ (Schwan cells)	প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র	(1) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষেত্রে নিউরিলেমা তৈরি করে। (2) আহত স্নায়ুর পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করে। (3) স্নায়ু এবং পেশির সংযোগস্থলকে সুরক্ষা দেয়।
2. স্যাটেলাইট কোষ (Satellite cells)	প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র	নিউরোনের কোষদেহ অঞ্চলে অবস্থান; কার্য অনিশ্চিত।
3. অলিগোডেনড্রোসাইট (Oligodendrocytes)	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ক্ষেত্রে মায়েলিন আবরণী তৈরি করে।
4. অ্যাস্ট্রোসাইট (Astrocytes) প্রোটোপ্লাজমিক	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	(1) স্নায়ুর প্রান্তসন্নিকর্ষ অঞ্চল ছাড়া অন্য জায়গায় অবস্থান করে। (2) ব্লাড-ব্রেন ব্যারিয়ার সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। (3) সেরিব্রোস্পাইনাল তরল থেকে নিউরোট্রান্সমিটার এবং K^+ নিয়ন্ত্রণ করায়। (4) সেরিব্রোস্পাইনাল তরলের উপাদানগুলির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
—ফাইব্রাস	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	(1) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মূল ধাত্র হিসাবে (framework) কাজ করে। (2) আহত স্নায়ুকোষের নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
5. এপেন্ডাইমাল কোষ (Ependymal cells)	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের গহ্বরগুলির অভ্যন্তরে বিরাজ করে এবং সেরিব্রোস্পাইনাল তরল উৎপাদনে সাহায্য করে।
6. মাইক্রোগ্লিয়া (Microglia)	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	জীবাণু বিভিন্ন অ্যান্টিজেন এবং মৃত স্নায়ুকোষকে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ধ্বংস করে।

5.4 একটি আদর্শ স্নায়ুকোষের গঠন (Structure of a typical neurone)

স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে স্নায়ুকোষ বা নিউরোন বলে।

একটি আদর্শ স্নায়ুকোষের দুটি প্রধান অংশ বর্তমান—

1. কোষদেহ (cell body) বা দেহ (Soma) বা পেরিক্যারিয়ন (Perikaryon)
2. স্নায়ুতন্তু বা অ্যাক্সন (Nerve fibre or axon)

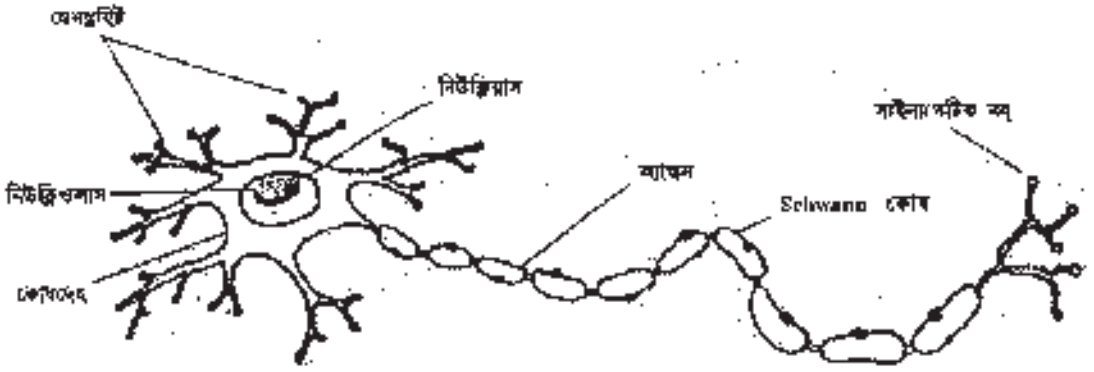

চিত্র : 13.5.2. একটি আদর্শ নিউরোনের গঠন।

5.4.1. কোষদেহ (Cell body)

একটি নিউরোনের সর্ববৃহৎ অংশটিই কোষদেহ। ইহার গড় ব্যাস 5-135 μm। কোষদেহে একটি তুলনামূলকভাবে বড় নিউক্লিওলাস যুক্ত নিউক্লিয়াস বর্তমান যা কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থান করে। কোষদেহে সাইটোপ্লাজমে অন্যান্য কোষের মতোই মাইটোকনড্রিয়া, গলগিবস্তু, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, কোষকঙ্কাল ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও থাকে অজস্র কোষস্থ বস্তু (Cell inclusions)। কোষদেহে বর্তমান কোষকঙ্কাল তৈরি হয় অসংখ্য মাইক্রোটিউবিউলের সমন্বয়ে যার নাম নিউরোফাইব্রিল (Neurofibril)। এই নিউরোফাইব্রিল অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামকে (rough ER) একটি বিশেষ বর্ণময় অঞ্চলে আবদ্ধ করে রাখে। যে রঞ্জকপদার্থের জন্য এই বর্ণময় অবস্থা তৈরি হয় তার নাম নিস্‌ল দানা (Nissl bodies)। নিস্‌লদানার উপস্থিতি স্নায়ুকোষের একটি অন্যতম মৌলিক (unique) বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রকারের কোষস্থ বস্তুর মধ্যে গ্লাইকোজেন দানা, লিপিড ড্রপলেট, মেলানিন রঞ্জক, সোনালি বাদামি বর্ণের রঞ্জক লিপোফিউসিন (lipofusin) ইত্যাদি প্রধান।

কোষদেহের চারিদিকে বেশ কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত অংশ (processes) দেখতে পাওয়া যায় যাদের ডেনড্রাইট বলে। এই অংশে নিউরোট্রান্সমিটার সংগ্রাহক (neurotransmitter receptor) থাকে এবং এই কারণে ডেনড্রাইট অন্য নিউরোন মারফত স্নায়বিক সংবেদন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। কোষদেহ থেকে প্রক্ষিপ্ত ডেনড্রাইটের সংখ্যা 1 থেকে 200 পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ, যে সব দৈর্ঘ্যের প্রবর্ধক শাখাযুক্ত হয় এবং যারা উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষ দেহে প্রেরণ করে তারাই ডেনড্রাইট।

5.4.2. অ্যাক্সন (Axon)

কোষদেহের কোন না কোন স্থানে একটি অপেক্ষাকৃত পুরু অংশ থাকে যার নাম অ্যাক্সন হিলক (axon hillock)। এই স্থান থেকেই স্নায়ুতন্তু বা অ্যাক্সন উৎপত্তি লাভ করে। অর্থাৎ, যে দীর্ঘ প্রবর্ধক শুধুমাত্র কোষপ্রান্তে শাখাযুক্ত এবং প্রান্তীয় শাখার কোষপ্রান্ত স্ফীত হয়ে এন্ড বাল্ব (end bulb) গঠন করে এবং যার মাধ্যমে উদ্দীপনা

কোষ থেকে এভ বাহে প্রেরিত হয় তাকে অ্যাক্সন বলে। অ্যাক্সন অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং প্রস্থচ্ছেদে গোলাকৃতির হয়ে থাকে। প্রান্তীয় অংশ ছাড়া সাধারণত অ্যাক্সন শাখাবিহীন হয়। অ্যাক্সনের মধ্যস্থ সাইটোপ্লাজমকে অ্যাক্সোপ্লাজম বলে এবং এই বহিঃস্থ পর্দা অ্যাক্সোলেমা (axolema) নামে পরিচিত। অ্যাক্সনের গড় ব্যাস 1-20 μm। লম্বায় একটি অ্যাক্সন কয়েক মিলিমিটার থেকে শুরু করে মিটারেরও বেশি লম্বা হতে পারে।

অ্যাক্সনের অক্ষ বরাবর কয়েকটি শাখা অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে কোল্যাটারালস্ (Collaterals) বলে। অ্যাক্সনের শেষপ্রান্তটি শেষ হয় প্রচুর শাখাপ্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে (termial arborization)। এই শাখাপ্রশাখাগুলিকে টেলেডেন্ড্রিয়া (telodendria) বলা হয়। প্রত্যেকটি শাখাপ্রশাখার প্রান্তে এক একটি ছোট স্ফীত অংশ দেখতে পাওয়া যায়, নাম সাইন্যাপটিক নব্ (Synaptic knob)। এই সাইন্যাপটিক নব্ নানারকম কোষের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, যেমন (1) পেশিকোষ, (2) গ্রন্থিকোষ এবং (3) অপর একটি স্নায়ুকোষ। এই ধরনের প্রত্যেকটি সংযোগস্থলকে প্রাক্সঁপ্রিকর্ষ বা synapse বলে। সাইন্যাপটিক নব্-এর মধ্যে থাকে অসংখ্য সাইন্যাপটিক ভেসিকল (synaptic vesicle) যা আসলে নিউরোট্রান্সমিটারের আধার। এই বিষয়ে আমরা অনতিবিলম্বে বিস্তারিত আলোচনা করব।

5.5. স্নায়ুকোষের প্রকারভেদ (Types of neurons)

সমস্ত স্নায়ুকোষকে দু রকমভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়

(1) অ্যাক্সনের গড় ব্যাস এবং মায়েলিন সিথের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ভিত্তিতে এবং

(2) কোষদেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত বাহুর (processes) সংখ্যার ভিত্তিতে।

আমরা পরপর দুটি সারণীর মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে চেষ্টা করব।

সারণী I : গড়ব্যাস এবং মায়েলিন সিথের ভিত্তিতে স্নায়ুকোষের শ্রেণিবিভাগ।

স্নায়ুর প্রকার	গড় ব্যাস	মায়েলিন সিথ্	সংবেদন প্রবাহের গতি	কার্য তথা উদাহরণ
A	2-20 μm	বর্তমান	12-120 m/Sec.	*
B	<3 μm	বর্তমান	3-15 m/Sec.	**
C	2-4 μm	অনুপস্থিত	0.5-2.0 m/Sec.	***

A*—সোমাটিক মোটর তন্তু; ভারসাম্য, অবস্থান, স্পর্শ, চাপ এবং বেদনা—এই সব অনুভূতি সংক্রান্ত সেন্সরি ফাইবার।

B**—কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS) থেকে অটোনমিক গ্যাংগ্লিয়াতে আনীত তন্তুসমূহ; চাপমাত্রা এবং বেদনা এই দুই অনুভূতি সংক্রান্ত কিছু কিছু সেন্সরি তন্তু।

C***— অটোনমিক গ্যাংগ্লিয়া থেকে অরেখ পেশী এবং গ্রন্থিকোষে আনীত তন্তুসমূহ; গন্ধ, বেদনা, তাপমাত্রা এবং কিছু যান্ত্রিক উত্তেজনা—এই সব অনুভূতি সংক্রান্ত সেন্সরি তন্তুসমূহ।

সারণী II : কোষদেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত বাহুর সংখ্যার ভিত্তিতে স্নায়ুর প্রকারভেদ।

স্নায়ুকোষের প্রকার	কার্য তথা উদাহরণ
ইউনিপোলার (unipolar)	স্পর্শ এবং বেদনার অনুভূতি সংক্রান্ত সেন্সরি তন্তু
বাইপোলার (bipolar)	দর্শন এবং ঘ্রাণসংক্রান্ত তন্তু যেমন রেটিনায় উপস্থিত রডকোষ অথবা অলফ্যাক্টরি নিউরন।
মাল্টিপোলার (multipolar)	পিরামিড কোষ (মস্তিষ্ক) অথবা পারকিন্‌জি কোষ (হৃদ্‌যন্ত্র)

5.6. সোয়ান কোষ এবং মায়েলিন সিদ্

পেরিয়েরাল স্নায়ুতন্ত্রে প্রত্যেকটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন সোয়ান কোষ দ্বারা সৃষ্ট সিদ্ দ্বারা আবৃত থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি সোয়ান কোষ বারম্বার অ্যাক্সনকে এমনভাবে আবৃত করে (প্রায় 100 বার) যে দুটি পর্দার মধ্যে সাইটোপ্লাজম প্রায় থাকেই না। এই স্তরগুলিকেই বলে মায়েলিন সিদ্, যার মধ্যে থাকে 20% প্রোটিন এবং 80% স্নেহপদার্থ (কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড এবং গ্লাইকোলিপিড)।

সবথেকে বাইরের সোয়ান কোষস্তরকে বলে নিউরিলেমা। এই নিউরোলেমা আবার পরপর দুটি পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এই পর্দাদ্বয় যথাক্রমে—(1) বেসমেন্ট পর্দা এবং (2) এন্ডোনিউরিয়াম। সোয়ান কোষের নিজস্ব নিউক্লিয়াসটি নিউরিলেমা স্তরে অবস্থান করে এবং তার ফলে ওই অংশটি একটু ফোলা দেখায়।

দুটি পরপর অবস্থানরত সোয়ানকোষের মধ্যে যে সামান্য ফাঁক থাকে তাকে পরিভাষায় র‍্যানভেয়ারের নোড [nodes of Ranvier, L. A. > Ranvier—French histologist and pathologist (1835—1922)] বলে। একটি নোড থেকে পরবর্তী নোডের মধ্যবর্তী অ্যাক্সনকে ইন্টারনোড বলা হয়। অ্যাক্সন হিলক এবং প্রথম সোয়ান কোষের মধ্যবর্তী অ্যাক্সনকে প্রাথমিক খণ্ডক (initial segment) বলে। অ্যাক্সন হিলকের সঙ্গে এই প্রাথমিক খণ্ডক যেহেতু স্নায়বিক সংবেদন প্রবাহের সূত্রপাত ঘটাতে বিশেষ উপযোগী তাই এর আর এক নাম হল ট্রিগার জোন (trigger zone)।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুতন্তুগুলি যে মায়েলিন সিদ দ্বারা আবৃত সেই আবরণ তৈরি করে অলিগোডেনড্রোসাইট নামক বিশেষ কোষ। এই কোষসমূহ সোয়ান কোষ সদৃশ নয়। এই মায়েলিন সিদের বিশেষত্ব হল এই যে এতে নিউরিলেমা, বেসমেন্ট পর্দা এবং এন্ডোনিউরিয়াম অনুপস্থিত। এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এক্ষেত্রে একটি অলিগোডেনড্রোসাইট অনেকগুলি নিউরনের অ্যাক্সনকে আবৃত করতে সমর্থ।

মানুষের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার 100 দিন নাগাদ মায়েলিন তৈরি শুরু হয়। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্ষেত্রে এই মায়েলিনের গঠন প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে। তাই শিশুদের মস্তিষ্ক তথা সমগ্র স্নায়বিক কাজ খুব একটা তাড়াতাড়ি হতে পারে না। শিশু যখন হাঁটতে শুরু করে তখন বুঝতে হবে যে তার স্নায়ুতন্ত্রের মায়েলিন গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, যদিও বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকে।

5.7 স্নায়ু সংবেদনের পরিবহন (Conduction of nerve impulse)

5.7.1. কোষপর্দা তড়িৎ বিভব (The electrical potential of the membrane) :

স্নায়বিক সংবেদনের অনুপস্থিতিতে একটি নিউরনের কোষপর্দার তড়িৎবিভব বলতে আমরা বুঝি কোষের ভিতর এবং বাইরের তড়িৎবিভবের তুলনামূলক অবস্থাকে। একে সাধারণভাবে বিশ্রামকালীন বিভব (resting potential) বলা হয়। এই অবস্থায় পর্দার বিভবের পরিমাণ −70 মিলিভোল্ট (−70 mV)। এর অর্থ হল স্নায়ুকোষের ভিতরের দিকটা বাইরের দিকের তুলনায় ঋণাত্মক।

স্নায়ুকোষের পর্দার বিভব তিনটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলি হল—(1) $Na^+ - K^+$ পাম্প, (2) বিভিন্ন আয়নের ক্ষেত্রে কোষপর্দার বিভিন্ন মাত্রার ভেদ্যতা এবং (3) কোষমধ্যস্থ স্থায়ী ঋণাত্মকতা (প্রোটিন এবং জৈব ফসফেটের কারণে)।

উপরের বর্ণিত তিনটি কারণের মধ্যে $Na^+ - K^+$ পাম্পের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এই পাম্প ATP এর খরচ সাপেক্ষে চালু থাকে। প্রতিবার এই পাম্প তিনটি Na^+ কোষের বাইরে বার করে দেয় এবং কোষের বাইরে থেকে দুটি K^+ কোষের ভিতরে নিয়ে আসে। $Na^+ - K^+$ পাম্পের প্রভাবে Na^+-এর কোষের বাইরে যাওয়া এবং K^+-এর কোষের ভিতরে প্রবেশ করার পরেও কোষপর্দার বাইরের দিকে ধনাত্মক অবস্থায় থাকে কারণ K^+-এর প্রবেশ ভিতরের স্থায়ী ঋণাত্মকতাকে প্রশমন করতে পারে না। $Na^+ - K^+$ পাম্পের কাজের ফলে যা হয় তার

পরোক্ষ কোষের ভিতরে এবং বাইরে Na^+ এবং K^+-এর ক্ষেত্রে একটা ঘনত্বজনিত তফাত (concentration gradient) লক্ষ করা যায়। এর ফলে K^+ কোষের বাইরে এবং অন্যদিকে Na^+ যথাক্রমে K^+ দ্বার এবং Na^+ দ্বারের (K^+ and Na^+-channel) মাধ্যমে। কোষের ভিতরে চলে আসতে থাকে কিন্তু যেহেতু K^+এর ক্ষেত্রে ভেদ্যতা Na^+এর ক্ষেত্রে ওই ভেদ্যতার তুলনায় প্রায় 100 গুণ বেশি, তাই যতগুলি K^+ কোষের বাইরে চলে যায় তার প্রায় 100 গুণ Na^+ কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসবের ফলে কোষের ভিতরে এবং কোষের বাইরে মোট চার্জের একটা সুস্পষ্ট বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়— কোষের বাইরের দিকটা হয় ধনাত্মক এবং ভিতরের দিকটা হয় ঋণাত্মক। এই ধরনের চার্জের যে বৈষম্য, সাধারণ অবস্থায় এর নাম বিশ্রামকালীন তড়িৎ-বিভব (resting membeance potential)। একেই আমরা চার্জের মেরুকরণ (polarization) বলি।

পরিশুদ্ধভাবে এই চার্জের পরিমাণ প্রায় 70 মিলিভোল্ট (mV), এর অর্থ এই যে কোষের ভিতরের মোট চার্জ বাইরের তুলনায় 70 mVকম, অর্থাৎ পর্দার বিভব হল –70 mV।

5.7.2. অ্যাকশন পোটেনশিয়াল (Action potential)

উত্তেজকের উপস্থিতিতে উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাকে এক্সাইটেবিলিটি (excitability) বলা হয়। আর উত্তেজনা বলতে যে কোন ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তনের ন্যূনতম পরিমাণকে বোঝায়। যদি ন্যূনতম শক্তির কোনও উত্তেজনা স্নায়ুকোষের পর্দার উপর বলবতী হয় তবে তাৎক্ষনিকভাবে Na^+ এর প্রবেশের জন্য নির্ধারিত পথগুলি (Voltage gaged Na^+ channel) বহুলাংশে উন্মুক্ত হয় এবং Na^+ এর ক্ষেত্রে পর্দার ভেদ্যতা বহুলাংশের বৃদ্ধি পায়। যে পরিমাণ Na^+ কোষের বাইরে বার হয়ে আসে তার তুলনায় বহুগুন Na^+ কোষের ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে পর্দার বিভবের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে পর্দার বিভবের পরিমাণ –70 mV থেকে বেড়ে 0 m V হয় এবং তারপর তা আরও বেড়ে +30 m V এ পৌঁছায়। পর্দার বিভবের এই রকম পরিবর্তনকে অমেরুকরণ বা depolarization বলা হয়। এই অমেরুকরণ হল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। যে ন্যূনতম অমেরুকরণ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল-এর প্রারম্ভিকতার (initiation) জন্য প্রয়োজন তাকে পরিভাষায়

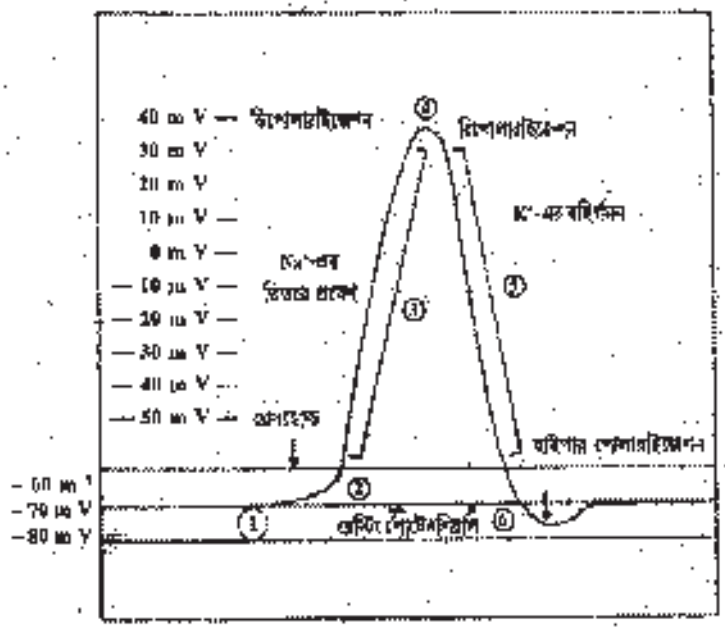

চিত্র : 13.5.3. অ্যাকশন পোটেনশিয়াল

থ্রেশহোল্ড (threshold) বলা হয়। নিচের লেখচিত্রের মাধ্যমে (চিত্র 13.5.3) অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল বিষয়টা বোঝানো হল—

1. বিশ্রামকালীন পর্দার বিভব (resting membrance portential)

2. অমেরুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপকের থ্রেশহোল্ড মাত্রা অর্জন।

3. দ্রুত অমেরুকরণের (rapid depolarization) ফলে অতিরিক্ত Na^+ -এর কোষের মধ্যে প্রবেশ—ফল সর্বোচ্চ অমেরুকরণ।

4. Na^+ -এর পথের (Na^+ channel) বন্ধ হওয়া এবং K^+ এর পথের উন্মুক্ত হওয়া শুরু।

5. উন্মুক্ত K^+ পথের মাধ্যমে K^+ এর কোষের বাইরে নির্গমন এবং পুনর্মেরুকরণের (repolarization) সূত্রপাত।

6. পুনর্মেরুকরণ তার বহমানতা ধরে রাখতে না পেরে পর্দার বিভব বিশ্রামকালীন অবস্থার তুলনায় সামান্য বেশি ঋণাত্মক করে তোলে যাকে পরিভাষায় বলে আন্ডারশুট (undershoot)। এর অব্যবহিত পরেই পর্দার বিভবের বিশ্রামকালীন অবস্থায় পুনরাগমন।

অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে—(1) হয় অথবা নয় (all or none principle) নীতি এবং (2) স্বশাসন (autonomy)।

5.7.2.1. সমস্ত অথবা নয় নীতি (all or none principle) :

যে ন্যূনতম পরিমাণ উত্তেজক অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল শুরু করতে সক্ষম তাকে থ্রেশহোল্ড উত্তেজক বলে। থ্রেশহোল্ড উত্তেজনার প্রভাবে অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের সূত্রপাত হয়। উত্তেজনার পরিমাণ বাড়লে যেমন অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে না, তেমনই থ্রেশহোল্ড উত্তেজনার চেয়ে কম শক্তির উত্তেজনা কোনো অবস্থাতেই অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের সূত্রপাত ঘটাতে পারে না—এটাই হয় অথবা নয় নীতি।

5.7.2.2. অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের স্বশাসন (Autonomy of action potential) :

প্রত্যেকটি অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল বস্তুতপক্ষে একেকটি স্বাধীন এবং মৌলিক ঘটনা। একদিকে বিভিন্ন অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের সংযুক্তির কোনো প্রশ্ন নেই, অন্যদিকে তেমনই কোনো একটি অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল অন্য কোনো একটির ক্ষেত্রে কখনই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। যে কোন একটি অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের ঘটনার পর স্নায়ুকোষের পর্দার ক্ষণস্থায়ী বিরামকালীন অবস্থায় (refractory period) প্রবেশ করে বলেই উপরে বর্ণিত দুটি অনন্য ধর্ম পরিলক্ষিত হয়।

5.7.3. অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহ (Propagation of action potential) :

যদিও অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহ একটি বহু উচ্চারিত ঘটনা, বাস্তবে অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহ বলতে কিছু নেই। বাস্তবত: এটাই যে অসংখ্য অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল স্নায়ুকোষের লম্ব অক্ষ বরাবর আলাদা আলাদা ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। মূল তত্ত্বটা হল এই যে অমেরুকরণ অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের সূত্রপাত ঘটায়। সংঘটিত অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল অনুরূপভাবে পরবর্তী অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে অমেরুকরণ সংক্রান্ত উদ্দীপকের (depolarization stimulus) ভূমিকা গ্রহণ করে।

অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল সংগঠিত হওয়ার কালে Na^+ সহজ তরল স্নায়ুকোষের ভিতরে প্রবেশ করার ফলে কোষপর্দার বিভব –70 m V থেকে +30 m V -এ পরিবর্তিত হয়। এই ধনাত্মক চার্জ পার্শ্ববর্তী অংশের একটি আলাদা অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের উপযুক্ত অমেরুকরণ সংক্রান্ত উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে (চিত্র 13.5.4) এর মধ্যে আগের অংশের পর্দার বিভব আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে একের পর এক নতুন

এবং অন্যান্য অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল যথাক্রমে সংগঠিত এবং ত্রিয়িত হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ্ডসন্নিকর্ষপূর্ব নবে (presynaptic knob) স্নায়বিক সংবেদন বহন করে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে স্নায়ুরোধের অ্যাক্সন বরাবর সংগঠিত অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালগুলি প্রত্যেকটি সমান বলশালী হয়ে থাকে যার ফলে প্রাণীর সংবেদনশীলতা সাধারণভাবে অপ্রতিহত হয়ে থাকে।

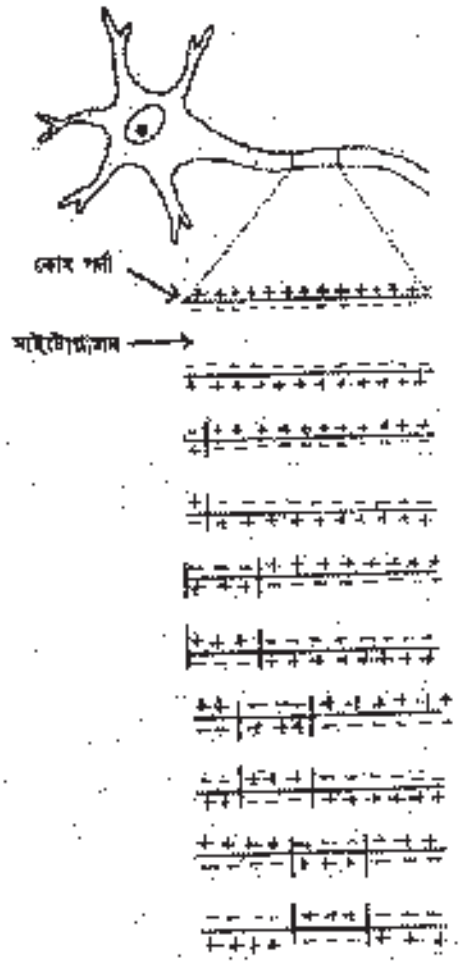

চিত্র : 13.5.4. নার্ভীয় সংবেদনের প্রবাহ

5.7.4. অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহের গতিবেগ এবং প্রকারভেদ (Speed and kinds of action potential propagation) :

দেখা গেছে যে দুটি ধর্ম অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে—

1. স্নায়ুকোষের অ্যাক্সনের ব্যাসের সঙ্গে অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহ সমানুপাতিক। অর্থাৎ যদি ব্যাস বৃদ্ধি পায় তবে প্রবাহের গতি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যাস কমলে প্রবাহ অনুরূপভাবে শ্লথ হয়ে পড়ে।

2. মায়েলিন পর্দা (শিদ্) থাকলে ওই স্নায়ু মাধ্যমে অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের প্রবাহের গতি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই মায়েলিনের অনুপস্থিতিতে ওই গতিবেগ হ্রাস পায়। মায়েলিন শিদ্ থাকলে কেবলমাত্র নোড অফ্ র‍্যানভেয়ারেই একেকটি অ্যাক্শন পোটেনশিয়ালের সূচনা হয়। ফলে মনে হয় যেন অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল লাফ

দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর ফলে মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুকোষের নার্ভীয় সংবেদনের প্রবাহকে সল্টেটরী প্রবাহ বা Saltatory conduction বলা হয় (চিত্র 14.5.5.)।

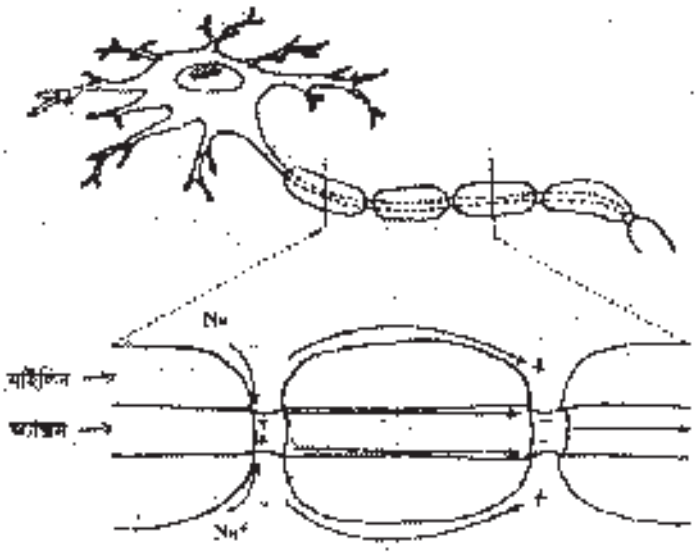

চিত্র 9.13.5.5. নার্ভীয় সংবেদনের সল্টেটরী প্রবাহ

5.7.5. প্রান্তসন্নিকর্ষ এবং স্নায়ুবিভবের স্থানান্তর (Synapse and synaptic transmission) :

স্নায়ুকোষের লব্ধ অক্ষ ধরাবর অ্যাক্শন পোটেনশিয়াল স্থান থেকে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়ে শেষে অ্যাক্সনের প্রান্তে বহুবিভক্ত শাখাপ্রশাখাতে প্রবেশ করে। এই শাখা প্রশাখাগুলি সাধারণত তিনভাবে প্রান্তসন্নিকর্ষ তৈরি করতে পারে—

(1) অন্য স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সঙ্গে

(2) পেশিকোষের সঙ্গে এবং

(3) কোনো গ্রন্থির সঙ্গে।

কোন একটি প্রান্তসন্নিকর্ষ অঞ্চলে বিভব আনয়নকারী স্নায়ুকোষকে বলা হয় প্রান্তসন্নিকর্ষপূর্ব স্নায়ুকোষ। অন্যদিকে বিভব গ্রহণকারী স্নায়ুকোষ অথবা পেশীকোষ অথবা গ্রন্থিকোষকে বলা হয় প্রান্তসন্নিকর্ষপশ্চাৎ কোষ। এই দুরকমের কোষের মধ্যে যে মুক্তস্থান বর্তমান তার নাম সাইন্যাপ্টিক ক্লেফ্ট (synaptic cleft)।

প্রান্তসন্নিকর্ষপূর্ব স্নায়ুকোষের শেষপ্রান্তটি (Presynaptic knob) একটু ফোলা (Swollen) এবং এর মধ্যে থাকে অগণিত সাইন্যাপটিক ভেসিকল যা বস্তুতপক্ষে নিউরোট্রান্সমিটারের নামক রাসায়নিক বস্তুর ধারক। প্রান্তসন্নিকর্ষপূর্ব স্নায়ুকোষের প্রান্তে (presynaptic knob) তড়িৎ-বিভব আনীত হলে তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রান্তের কোষপর্দায় অবস্থিত ভোল্টেজ গেটেড Ca^{++} দ্বারগুলি (Voltage gated Ca^{++} channel) উন্মুক্ত হয় এবং এর ফলে প্রান্তসন্নিকর্ষপূর্ব প্রান্তের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক Ca^{++} প্রবেশ করে। এই Ca^{++} এর প্রভাবে সাইন্যাপটিক ভেসিকল এবং কোষপর্দা এই দুইয়ের সংযুক্তিকরণ সম্ভব হয় নিউরিন এবং স্টেনিন নামক দুটি প্রোটিনের সক্রিয় সহযোগিতায় এর ঠিক পরেই সাইন্যাপ্টিক ভেসিকলের মধ্যস্থিত নিউরোট্রান্সমিটার কোষের বাইরে অর্থাৎ সাইন্যাপ্টিক ক্লেফ্টে উন্মুক্ত হয়। এই পদ্ধতির নাম এক্সোসাইটোসিস (exocytosis) এইভাবে উন্মুক্ত নিউরোট্রান্সমিটার অণুগুলি সাইন্যাপটিক ক্লেফ্টের অপরপ্রান্তে অবস্থিত প্রান্তসন্নিকর্ষপশ্চাৎ কোষের পর্দায়

বর্তমান গ্রাহক (receptor) 0, অণুর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়। এর ফলে প্রান্তসন্নিকর্ষপশ্চাৎ কোষের পর্দার অমেরুকরণ (depolarization) অথবা অতিমেরুকরণ (hyperpolarization) অবস্থা তৈরি হয়। নিউরোট্রান্সমিটারের রাসায়নিক প্রকারভেদে এইরকম হয়ে থাকে। এইভাবে সৃষ্ট অমেরুকরণ অথবা অতিমেরুকরণ প্রান্তসন্নিকর্ষপশ্চাৎ কোষে প্রবেশ করলে কোষের প্রকৃতি অনুসারে (স্নায়ু, পেশি, গ্রন্থি) অনুরূপ কার্য সাধিত হয় (চিত্র 13.5.6.)।

5.8. নিউরোট্রান্সমিটার

নিউরোট্রান্সমিটার যেহেতু রাসায়নিকভাবে নানারকমের হয় তাই প্রথমে বিভিন্নরকমের নিউরোট্রান্সমিটারের একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল— ।

নিউরোট্রান্সমিটার	রাসায়নিক গঠন	কার্যাবলি
A. অ্যাসিটাইল কোলিন		মাংসপেশি সংযোগস্থল, সমস্ত প্রাক্তসন্ধিকর্মপূর্ত অটোনমিক তন্তু, প্রাক্তসন্ধিবর্ধকশক্তি প্যারাসিম্প্যাথেটিক তন্তু, কোনো কোনো প্রান্ত সন্ধিকর্মপক্ষাৎ সিম্প্যাথেটিক তন্তু, রেটিনা এবং মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থল।
B. উদ্দীপক (Excitatory) অ্যামাইনো অ্যাসিড		
(a) গ্লুটামিক অ্যাসিড		সেরিব্রাল কর্টেক্স এবং হিপোক্যাম্প, মস্তিষ্কের 75% উদ্দীপনা সহযোগী (excitatory) প্রান্তসন্ধিকর্ম, শিক্ষা (learning) এবং স্মৃতি-সংরক্ষণে প্রান্তসন্ধিকর্ম।
(b) অ্যাসপারটিক অ্যাসিড		স্পাইনাল কর্ড, কাণ্ডের নিচ থেকে গ্লুটামিক অ্যাসিডের ন্যায়।
(C) অনুদীপক (inhibitory) অ্যামাইনো অ্যাসিড		
(a) গ্লাইসিন		মস্তিষ্কের অনুদীপক নিউক্লিয়াস, স্পাইনাল কর্ড এবং রেটিনা।
(b) γ অ্যামাইনোবিউটিরিক অ্যাসিড (GABA)		থ্যালামাস, সুইপোথ্যালামাস, সেরিবেলাম, সেরিব্রামের অপটিক লোব এবং রেটিনা।

নিউরোট্রান্সমিটার	রাসায়নিক গঠন	কর্মস্থল
(D) জৈবিক অ্যামাইনসকল (Biological amines)		
(a) ক্যাটেকল অ্যামাইন	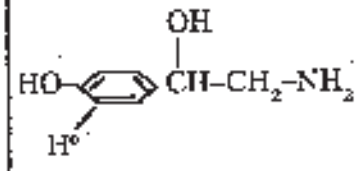	প্রায় সমস্ত প্যারাসিমপ্যাথেটিক প্রান্তসন্নিকর্ষপশ্চাৎ তন্তু, সেরিব্রাল কর্টেক্স, হাইপোথ্যালামাস, ব্রেনস্টেম, সেরিবেলাম এবং স্পাইনাল কর্ড, স্বপ্ন দেখা, হাঁটা এবং মানসিক সক্রিয়তা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত।
1. এরএপিনেফ্রিন		
2. এপিনেফ্রিন	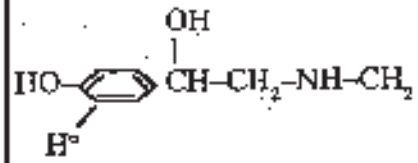	হাইপোথ্যালামাস, থ্যালামাস, স্পাইনাল কর্ড এবং অ্যাড্রেনাল মেডালা। কাজ নরএপিনেফ্রিনের অনুরূপ।
3. ডোপামাইন	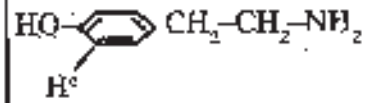	হাইপোথ্যালামাস, সেরিব্রাল কর্টেক্স এবং রেটিনা।
(b) ইন্ডোল্যামাইন	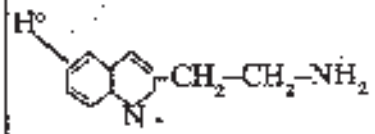	হাইপোথ্যালামাস, লিম্বিক সিস্টেম, সেরিবেলাম, রেটিনা, স্পাইনাল কর্ড, অনুচক্রিকা এবং কিছু অন্ত্রিক কোষ।
1. সেরোটোনিন		

5.9 প্রশ্নাবলি

1. স্নায়ুতন্ত্র কী এবং কয়প্রকারের সাজিয়ে লিখুন।
2. নিউরোগ্লিয়া কোষ কয়প্রকার ও কী কী?
3. স্নায়ুকোষের প্রকারভেদ সারণীসহ দেখান।
4. অ্যাকশন পোটেন্শিয়াল কাকে বলে লিখুন। (ছক সহ)
5. প্রান্ত সন্নিকর্ষ কীভাবে তৈরি হয় এবং স্নায়ুবিভব কীভাবে স্থানান্তরিত হয় বুঝিয়ে লিখুন।
6. টীকা লিখুন
   (a) অ্যাক্সন
   (b) কোষদেহ
   (c) মাইক্রোগ্লিয়া
   (d) সোয়ান কোষ
   (e) ডেনড্রাইট

5.10 উত্তরমালা

1.	5.1. — 5.2.	দেখুন
2.	5.3	"
3.	5.5	"
4.	5.7.2.	"
5.	5.7.5.	"
6.	5.4. এর থেকে লিখুন।	

একক 6 □ প্রাণীদের চলন

গঠন

6.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য
6.2. বিভিন্ন প্রাণীদের চলন
6.3. চলনের পদ্ধতি
6.4. দীর্ঘ স্ট্রাইড বা স্ট্রাইড দৈর্ঘ্য
6.5. স্ট্রাইড হার বৃদ্ধির কারণ
6.6. গেটস্ : দৌড়াবার পদ্ধতি
6.7. সারাংশ
6.8. প্রশ্নাবলী
6.9. উত্তরমালা

6.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

প্রাণীদের চলন সাধারণত নির্ভর করে, প্রাণীরা কোথায় বসবাস করে তার উপর (উদাহরণস্বরূপ— স্থল, জলে অথবা উভয়ক্ষেত্র)। অর্থাৎ, তারা নিজেদেরকে যখন হিংশ্রপ্রাণী থেকে রক্ষা করে, খাদ্য সন্ধান করে অথবা প্রজনন সম্পন্ন করে তখন এই চলন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। আবার কিছু প্রাণী উষ্ণতা ও খাদ্যের জন্য, কিংবা তাদের সন্তানদের জন্ম দেওয়ার জন্য চলন সম্পন্ন করে। দ্রুতগতি সম্পন্ন শুন্যপায়ীরা আবার সাধারণত তৃণভূমিতে বসবাস করে যেখানে তারা দৌড়ানোর জন্য বিস্তৃত উন্মুক্ত তৃণভূমি পায়। চিতাবাঘ তার শিকার ধরার জন্য 90 মাইল/ঘন্টা বেগে দৌড়ায়। জেব্রা, অ্যান্টিলোপ্ এবং অস্ট্রিচ খুব দ্রুত বেগে দৌড়ে নিজেদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করে। বিজ্ঞানী প্যাট্রিক জোলিনার এর মতে, চলন প্রক্রিয়াটি প্রাণী ও তার পরিবেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

উদ্দেশ্য :

এই অংশটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন

- বিভিন্ন প্রাণীদের চলন পদ্ধতি।
- স্ট্রাইড দৈর্ঘ্য বা দীর্ঘ স্ট্রাইড বলতে কী বোঝায়।
- বিভিন্ন দৌড়াবার প্রাণীদের বিভিন্ন গঠন।
- স্ট্রাইড হার কীভাবে দৌড়বাজ প্রাণীদের গতিবৃদ্ধি করে?
- স্ট্রাইড হার বৃদ্ধির কারণসমূহ কী?

6.2 বিভিন্ন প্রাণীদের চলন :

কীভাবে এবং কোথায় প্রাণীরা চলন সম্পন্ন করে তাহা বোঝানোর জন্য নিম্নে বিভিন্ন শব্দগুলি উল্লেখ করা হল।

(a) **জলজ (Aquatic) প্রাণীদের চলন :** জলজ প্রাণীরা সাঁতারের মাধ্যমে এই ধরনের চলনসম্পন্ন করে।

(b) **খেচর (Volant) প্রাণীদের চলন :** খেচর প্রাণীরা উড্ডয়ন পদ্ধতির সাহায্যে এই চলন সম্পন্ন করে।

(c) দ্রুতগামী (Cursorial) প্রাণীদের চলন : দৌড়বাজ প্রাণীরা (Cursors) খুব দ্রুত দৌড়িয়ে কম সময়ে বিস্তৃত এলাকা পেরিয়ে এই ধরনের চলন সম্পন্ন করে।

(d) আরোহী (Scansorial/or Arboreal) প্রাণীদের চলন : আরোহী প্রাণীরা বিস্তৃত প্রান্ত অবধি আরোহণের মাধ্যমে এই চলন সম্পন্ন করে। প্রধানত এই ধরনের প্রাণীরা অধিকাংশ সময় বৃক্ষে বসবাস করে।

(e) লম্ফনকারী (Saltatorial) প্রাণীদের চলন : এই ধরনের চলনে লম্ফনকারী প্রাণীরা (hoppers) তাদের পশ্চাৎপায়ের সাহায্যে খুব দ্রুত লাফিয়ে কম সময়ে বিস্তৃত এলাকা অতিক্রম করে। যদি তারা শুধুমাত্র পশ্চাৎ পা দুটির সাহায্যে লাফিয়ে চলে, তখন তাদেরকে রাইকোচিটল (Ricohetal) বলা হয়।

(f) গর্তবাসী (Fossorial) প্রাণীদের চলন : যে সমস্ত প্রাণীরা গর্তের মধ্যে অর্থাৎ ভূ-অভ্যন্তরে বসবাস করে এবং উহার মধ্যে চলাচল করে, তাদের চলনকে গর্তবাসী প্রাণীদের চলন বলা হয়।

বিবর্তনের মাধ্যমে বহু বছর পূর্বে লম্ফনকারী প্রাণীরা, ছোট তৃণভোজী চতুষ্পদী এবং আরোহী প্রাণীদের থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

যদিও সমস্ত দ্রুতগামী প্রাণীরা ভালোভাবে লাফাতে সক্ষম, কিন্তু লম্ফনকারী প্রাণীরাই খুব সহজে ভূমির উপর লাফাতে কিংবা আরোহণে সক্ষম।

চিত্রে (6.1) বিভিন্ন প্রাণীদের চলন দেখানো হয়েছে।

কোন প্রাণীর চলনের সময়, একটি পূর্ণচক্রগতির দৌড়ানোকে অথবা হাঁটাকে স্ট্রাইড (Stride) বলে।

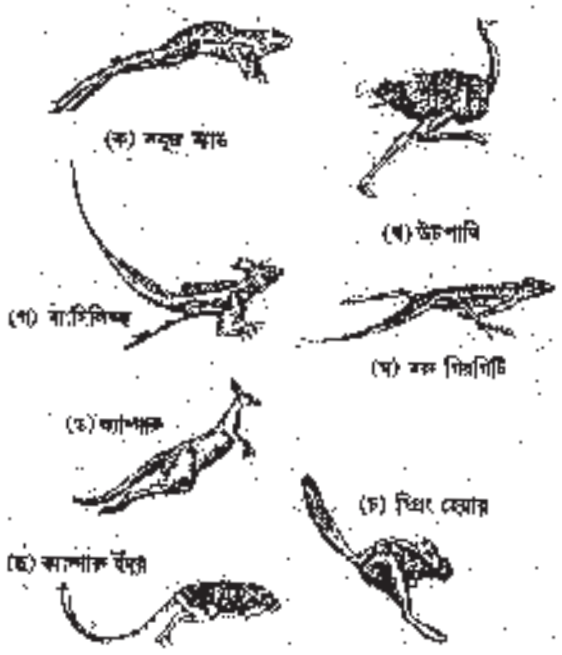

চিত্র : 13.4.5 বিভিন্ন প্রাণীদের চলন। (ক) লম্ফনকারী প্রাণী, সবুজ ব্যাঙ। (খ), (গ) ও (ঘ) দ্রুতগামী প্রাণীরা, (খ) ও (গ) দ্বিপদী দ্রুতগামী প্রাণী, উটপাখী ও ব্যাসিলিস্ক। (ঘ) চতুষ্পাদী দ্রুতগামী, মরু গিরগিটি। (ঙ), (চ) ও (ছ) লম্ফনকারী স্তন্যপায়ী প্রাণীরা, (ঙ) ক্যাঙ্গারু, (চ) স্প্রিং হেয়ার ও (ছ) ক্যাঙ্গারু ইঁদুর।

সুতরাং প্রাণীর গতি বলতে বোঝায় যে সময়ের সঙ্গে প্রাণীটির স্ট্রাইড দৈর্ঘ্যের (Stride length) পরিবর্তন। সুতরাং গতিশীল প্রাণীদের গতি বাড়ে দুইভাবে—

(A) পদক্ষেপের দৈর্ঘ্যের/স্ট্রাইড দৈর্ঘ্যের (Stride length) এর উপর

(B) পদক্ষেপের হারের/স্ট্রাইড হারের (Stride rate) উপর।

উদাহরণ—শ্রু (Shrews), ভোলস্ (Voles), ওয়ার্ট হগ্ (Wart hog) ঘোড়া, 9 মিঃ/স্ট্রাইড হিসাবে দৌড়াতে সক্ষম। সুতরাং স্ট্রাইড দৈর্ঘ্য বাড়ানোর মূল উপায়টি হল পায়ের অন্তিম অংশের (tips) সাহায্যে দৌড়ানো।

6.3. চলনের পদ্ধতি

নিম্নে চলনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করা হল—

(1) পায়ের তালু নির্ভর (Plantigrade) = Sole + Walking দৌড়ানো :

এই পদ্ধতিতে প্রাণীরা পায়ের তালুর উপর (sole) নির্ভর করে দৌড়ায় অর্থাৎ প্রতিটি স্ট্রাইডে পডিয়াল (Podial) এবং মেটা পডিয়াল (Metapodial) সাহায্যে ভূমির উপর দিয়ে দৌড়ায়। উদাহরণ—মানুষ, ভাল্লুক।

(2) পায়ের অন্তিম অংশ (Digitigrade = Finger + Walding) নির্ভর দৌড়ানো :

এই পদ্ধতিতে প্রাণীরা পায়ের অন্তিম অংশের উপর (finger) নির্ভর করে দৌড়ায়। কিন্তু পায়ের তালু ভূমি স্পর্শ করে না। উদাহরণ— কুকুর, বিড়াল।

(3) পায়ের ক্ষুর অঙ্গুলি নির্ভর (Unguligrade) = hoof + Walking দৌড়ানো :

এই পদ্ধতিতে প্রাণীরা পায়ের পাতার অগ্রাংশে অর্থাৎ ক্ষুর অঙ্গুলির (hoof) সাহায্যে ভূমির উপর চলাচল করে।

উদাহরণ— হরিণ, ঘোড়া।

6.4. দৌড়বাজ প্রাণীদের দীর্ঘ স্ট্রাইড বা স্ট্রাইড দৈর্ঘ্য (Stride length) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(a) পায়ের দৈর্ঘ্য এবং অনুপাত (Length and proportions of legs :

প্রাণীদের পায়ের দৈর্ঘ্য যত বেশি হয় স্ট্রাইড দৈর্ঘ্যও তত বেশি হয়। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে, কোনো প্রাণীর শুধুমাত্র দেহের সমস্ত অংশের সমানভাবে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হলে তবেই প্রাণীটির গতি দ্রুত হবে। তাই অধিকাংশ দৌড়বাজ প্রাণীরা দীর্ঘ হয়, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় পায়ের দৈর্ঘ্য শুধুমাত্র বেশি হলে তবেই প্রাণীটি দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে। দ্রুতগামী প্রাণীদের পায়ের দূরবর্তী অংশের অস্থিগুলি, নিকটবর্তী অংশের তুলনায় বেশি দীর্ঘ হয়। তাই, দ্রুতগামী অঙ্গুলি নির্ভর প্রাণীদের (Cursorial Ungulates) সাধারণত হিউমেরাসের তুলনায় রেডিয়াস্, টিবিয়ার তুলনায় ফিমার বেশি দীর্ঘ হয়। এছাড়াও মেটাকারপেল্ ও মেটাটারসাল্ও দীর্ঘ হয়।

(b) পায়ের গঠন (Foot Pressure) :

যে সমস্ত প্রাণীরা দৌড়াতে পারে তাদের পায়ের অস্থিগুলি খুবই দীর্ঘ হয়, কিন্তু দৌড়াবার জন্য পায়ের কার্যকরী দৈর্ঘ্য effective length হল, পায়ের যে অংশটি স্ট্রাইড দৈর্ঘ্যে কাজ করে। যে সমস্ত প্রাণীরা পায়ের তালু (sole) নির্ভর চলাচল করে, তাদের পায়ের অগ্রাংশই (sole) কার্যকরী দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ : মানুষ, ভাল্লুক, র‍্যাকুন।

আবার যে সমস্ত প্রাণীরা পায়ের অঙ্গুলি নির্ভর (digit finger) চলাচল করে, তাদের পায়ের অঙ্গুলিই কার্যকরী দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ—মাংসাশী প্রাণী (Carnivorse), দৌড়বাজ পাখি।

আবার যে সমস্ত প্রাণীরা ক্ষুর অঙ্গুলির (hoof) সাহায্যে চলাচল করে, তাহাদের ক্ষুর অঙ্গুলিই কার্যকরী দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে।

উপরিউক্তভাবে দ্রুতগামী প্রাণীর পায়ের কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটিয়ে দ্রুতগামী সম্পন্ন হয়।

পায়ের স্থলুতা, গঠন ও কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি, দৌড়বাজ প্রাণীদের অভ্যাসের ফলে বৃদ্ধি পায়, (চিত্র 6.2)।

(c) কাঁধের গঠনের ভূমিকা (Role of Shoulder) :

অধিকাংশ দৌড়বাজ প্রাণীদের কাঁধের গঠন ও কার্যকারিতার উপর পায়ের দৌড়ানোর কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে।

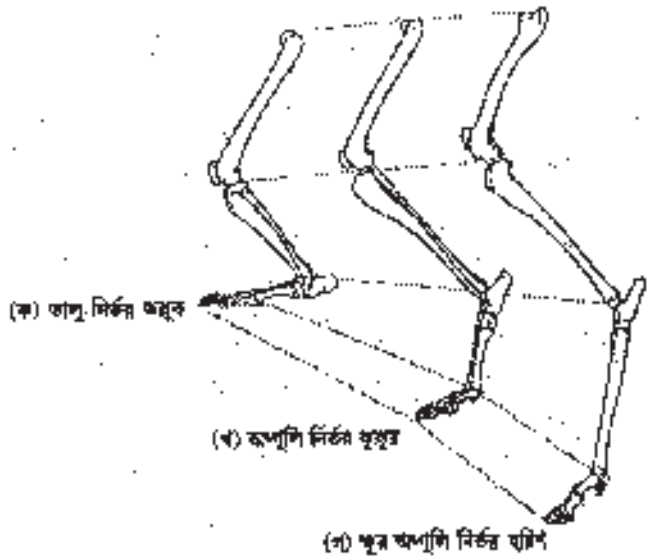

চিত্র 1 6.2. বিভিন্ন প্রাণীদের পায়ের গঠন। (ক) দ্রুতগতি অক্ষম প্রাণী, তালু নির্ভর ভল্লুক। (খ) মাঝারি গতি সম্পন্ন, অঙ্গুলি নির্ভর খুরধর। (গ) খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন, ক্ষুর অঙ্গুলি নির্ভর হরিণ

কিছু কিছু সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের স্টারনামের সাপেক্ষে কোরাকয়েডের পার্শ্ব চলাচলের ফলে স্ট্রাইড দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা স্বাধীনভাবে স্ক্যাপুলা ঘোরাতে পারে। দ্রুতগামী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ল্যাভিকেল্ ছোট হওয়ায় (কোন কোন ক্ষেত্রে খুপ্ত প্রায়) গতি দ্রুত হয়, (চিত্র 6.3)।

(ঘ) স্ট্রাইড হার কীভাবে দৌড়বাজ প্রাণীদের গতি বৃদ্ধি করে?

দ্রুতগামী অর্থাৎ দৌড়বাজ প্রাণীদের গতি নির্ভর করে সময়ের সঙ্গে স্ট্রাইড হারের উপর। তাই ছোট-পা-ইঁদুর লম্বা-পা-ব্যাঙের তুলনায় বেশি গতিতে দৌড়ায়।

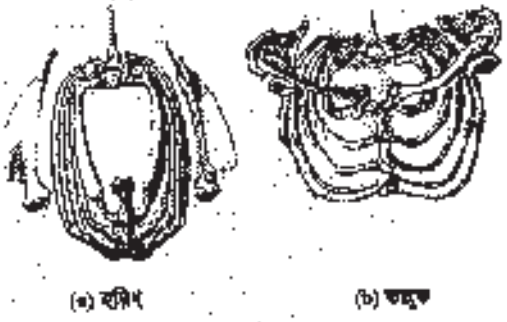

চিত্র : 6.3. বিভিন্ন প্রাণীদের কাঁধের গঠন : (a) দ্রুতগতি হরিণ, (b) দ্রুতগতি অক্ষম ভল্লুক।

কারণ ছোট পা ইঁদুরের স্ট্রাইড হার অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ ঃ দৌড়ের ঘোড়ার স্ট্রাইড হার ২১/$_{৪}$ স্ট্রাইড/সেকেন্ড, চিতার ৩১/$_{২}$ স্ট্রাইড/সেকেন্ড।

6.5 স্ট্রাইড হার বৃদ্ধির কারণ ঃ

নিম্নলিখিতভাবে দৌড়বাজ প্রাণীরা দ্রুত মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে স্ট্রাইড হার বৃদ্ধি করে।

(1) মাংসপেশীর সংকোচনের হার (Rate of Muscle Contraction) ঃ দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রাণীরা খুব দ্রুত মাংসপেশী সংকোচনের ফলে স্ট্রাইড হার বৃদ্ধি করে।

(2) মাংসপেশীর সংকোচন "উচ্চ গিয়ার অনুপাত" (Mechanics, high "Gear Ratio") ঃ চলমান গাড়িতে গতি বৃদ্ধির জন্য 'উচ্চ গিয়ার বা চাকা' ব্যবহার করা হয়। একই ভাবে দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে "উচ্চ গিয়ারের" অভিযোজন লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত প্রাণীদের পায়ের সংযোগস্থলের মাংসপেশীগুলি যদি অস্থির সঙ্গে কাছাকাছি যুক্ত থাকে তাহলে ঘূর্ণন কোণ বিস্তৃত হয়, কিন্তু দূরের অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঘূর্ণন কম ক্ষুত্র হয়।

তাই $V_0 = VL_0/l_i$ $\quad V_0$ = ভার বাহুর বেগ; শেষাগ্র বেগ।

l_0 = ভার বাহু, l_i বল বাহু।

অনুপাতে l_i কমলে (V_0) গতি বাড়বে। দ্রুতগামী প্রাণীদের ক্ষেত্রে L_0/l_i বেশি হয়।

চিত্রে [6.4] বিভিন্ন প্রাণীর l_i/l_0 দেখানো হইল।

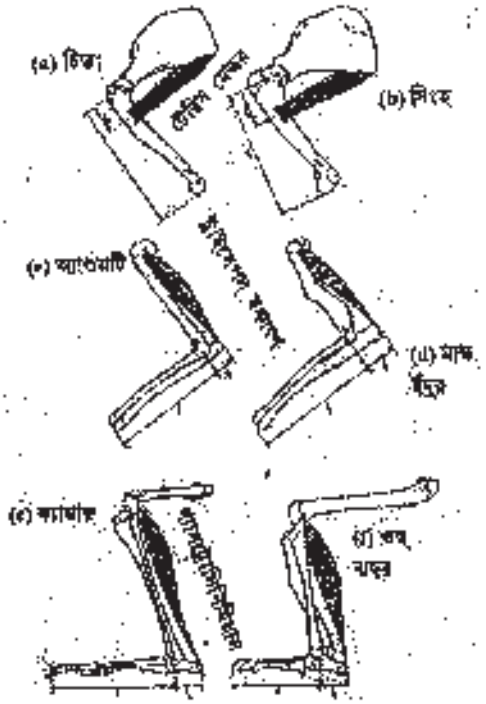

চিত্র ঃ 6.4. বিভিন্ন প্রাণীদের 'উচ্চ গিয়ারের অভিযোজন' অর্থাৎ অনুপাত দেখানো হয়েছে দ্রুত গতিসম্পন্ন প্রাণীদের l_0/l_i বেশি হয়. (a) চিতা (c) অ্যাওয়াটি (e) কাঙারু দ্রুতগতি অক্ষম প্রাণীদের কম হয়, (b) সিংহ, (d) মাস্ক ইঁদুর, (f) ওম্ব্যাট।

(3) গড়গতি (Summation of Velocities) :

যদি দ্রুতগামী প্রাণীদের পায়ের সংযোগস্থলের বিভিন্ন মাংসপেশীগুলি একই অভিমুখে ঘোরে, তা'হলে প্রত্যেকে মাংসপেশীর গতির গড় পায়ের মোট গতি বৃদ্ধি করে, (চিত্র 6.5)। অধিকাংশে স্তন্যপায়ী দ্রুতগামী প্রাণীদের স্ক্যাপুলা বুকের পরিপেক্ষিতে 20 থেকে 25° ঘুরতে পারে। এছাড়া এই সমস্ত প্রাণীদের বুক ও শ্রোণীচক্রের অংশ পায়ের অস্থির সংকোচনের একই দিকে ঘুরে প্রাণীর (গড়) গতি বৃদ্ধি করে।

(4) দ্রুত গতি প্রাণীদের ভর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Mass resistance economy effort) :

প্রথমত দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রাণীরা বিভিন্ন দোলায়মান গতির সাহায্যে নিজেদের ভর নিয়ন্ত্রণ করে। পাগুলি অবশ্যই একইদিকে ভাঁজ হয় এবং পায়ের পাতা কখনই মাটি থেকে বেশি উঁচুতে ওঠে না, কিন্তু পিঠ দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে, তাই ভরের কেন্দ্রবিন্দু খুব সামান্য উল্লম্বভাবে সরণ হয়। আডাক্টর ও অ্যাবডাকটর মাংসপেশীগুলি পায়ের গতির সঙ্গে ভাঁজ হতে সাহায্য করে। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসারে বল ও ভরের সম্পর্ক,

m = ভর $\quad a$ = ত্বরণ $\quad F$ = বল

যেহেতু গতি $(V) = at$ আবার $F = ma$

$$\therefore a = \frac{V}{t}$$

বা, $Ft = mV$

সুতরাং বল, কৌণিক বেগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অতএব মাংসপেশীগুলির ভর কমানো যেতে পারে যদি মাংসপেশীগুলির দোলায়নের গতি কমানো যায়। তাই দ্রুতগামী প্রাণীদের পায়ের নিম্নাংশের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে এবং সবচেয়ে কম মাংসপেশীগুলি থাকার ফলে, প্রাণীদের অস্থির ভাঁজ ও ঘূর্ণন খুব দ্রুত হয় এবং প্রাণীর মোট গতি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং মাংসপেশীগুলি সাধারণত দেহের কাছাকাছি অংশের অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই প্রাণীর গতির ত্বরণ বৃদ্ধি পায় (চিত্র 6.6)।

$$\therefore F = m\frac{V}{t}$$

চিত্র : 6.5. গড়পতি দ্রুতগামী প্রাণীদের

চিত্র : 6.6. ভিকিউনা প্রাণী (Vicugna) পশ্চাৎপায়ের গঠন

অধিকাংশ দ্রুতগতি প্রাণীদের পায়ের মধ্য অঙ্গুলির পার্শ্ব অঙ্গুলিগুলি লুপ্ত হয় কিংবা সংযুক্ত হয়ে একটি অস্থি গঠন করে, তার ফলে একটিমাত্র হাল্কা শক্ত পা দ্রুত গতির জন্য উপযুক্ত হয় (চিত্র 6.7)।

দ্রুতগতি প্রাণীরা কোন বাঁক ঘোরার সময় যাতে পড়ে না যায়, সেইজন্য বহির্মুখী অপকেন্দ্র বল, অন্তর্মুখী অভিকেন্দ্র বলের সমান ও বিপরীতমুখী হয়। অপকেন্দ্র বল প্রাণীর ভর ও গতির সমানুপাতিক এবং বৃত্তের (বাঁকের) ব্যাসার্ধের ব্যস্তানুপাতিক (চিত্র 6.8)। প্রাণীর অপকেন্দ্র বল, পায়ের সাহায্যে সৃষ্ট অভিকেন্দ্র বল ও বৃত্তের (ব্যাসার্ধের) দিকে ঝুঁকবার ফলে নিয়ন্ত্রিতভাবে সমান হয়।

গেটস্ (Gaits) : (দৌড়াবার পদ্ধতি) : দ্রুতগামী প্রাণীদের দৌড়বার সময় পর্যায়ক্রমে পায়ের দোলায়মানকে গেটস্ বা দৌড়বার পদ্ধতি বলে।

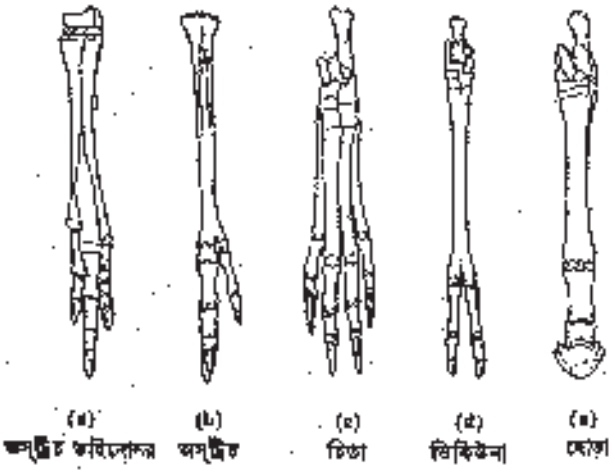

চিত্র 1 6.3. বিভিন্ন প্রাণীদের দৌড়াবার উপযোগী পায়ের অঙ্গুলির গঠন।

দ্রুতগামী প্রাণীরা দৌড়াবার সময় একজোড়া পা (সামনের বা পিছনের) যদি সমান সময় অন্তর মাটিতে পড়ে তাহলে দৌড়াবার পদ্ধতি অর্থাৎ গেটস্ প্রতিসম হয়। ঘোড়া, কুকুর এবং উটের ক্ষেত্রে ইহা লক্ষ্য করা যায়। আবার স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সামনের ও পেছনের পা বিপরীত দিকে মাটির উপর রেখে যাযাবরি গতিতে দৌড়াতে পারে। অধিকাংশ প্রাইমেটদের দৌড়াবার সময় অনেক কোলাকুলি ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, কারণ তারা যখন সামনের পায়ের সাহায্যে মাটির উপর চাপ দেয়, তখন বিপরীত দিকের পিছনের পা মাটির উপর চাপ প্রয়োগ করে।

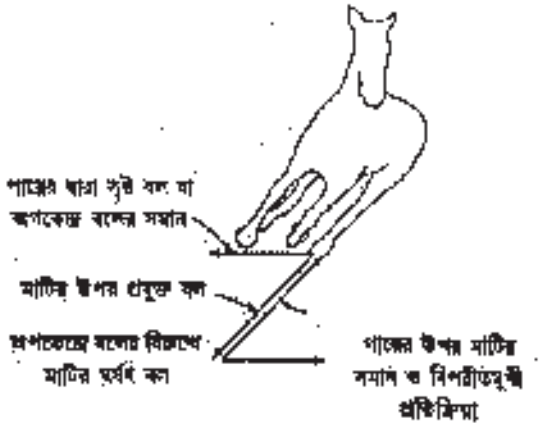

চিত্র 1 6.4. বৃত্তের বাঁকে দ্রুতগামী প্রাণীদের বল ও সাম্য।

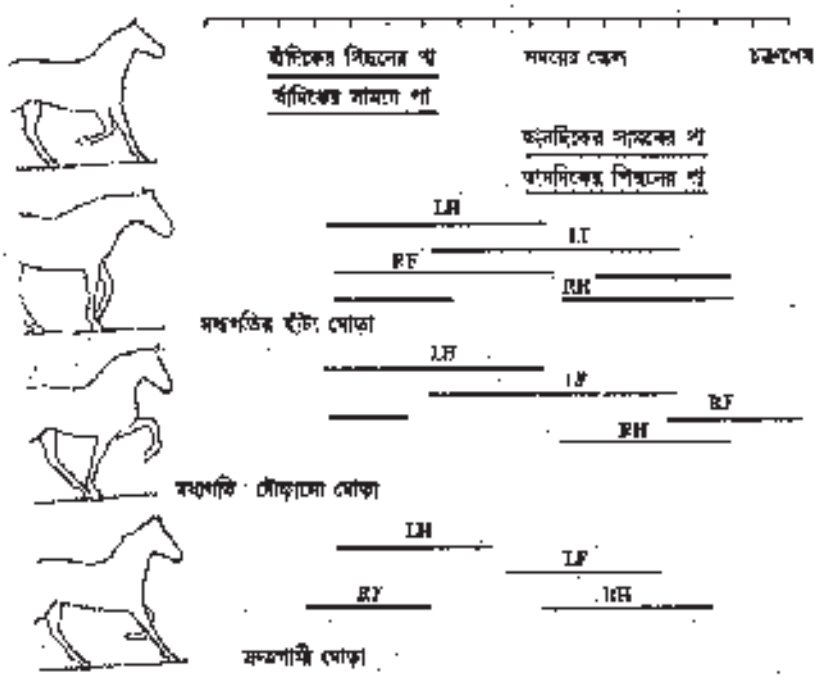

চিত্র : 6.9. ঘোড়ার বিভিন্নভাবে দৌড়ানো ও চলনের পদ্ধতি অর্থাৎ গেইস্ দেখানো হল।

সারাংশ : বসবাসকারী স্থান থেকে খাদ্য, আত্মরক্ষা, প্রজননের জন্য কোন প্রাণীর এক স্থান থেকে অন্যত্র গমনই চলন। মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণিসমূহের চলনে বিভিন্ন অঙ্গসমূহের গঠনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার একই সঙ্গে জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষে গমনের জন্য বিভিন্ন প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে লম্ফনকারী, গর্তবাসী, আরোহী প্রাণীরা চলনের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের গমন বহুলাংশেই পায়ের তাল, পায়ের অন্তিম অংশ বা পায়ের ক্ষুরের গঠনের উপর নির্ভরশীল। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা ফ্লজেলা, সিলিয়া সিটা ইত্যাদি গমন অঙ্গ ছাড়াও পাখনা দিয়ে গমন সম্পন্ন করে। অনেকক্ষেত্রেই নিম্নশ্রেণির অমেরুদণ্ডীরা দেহের সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে গমন সম্পন্ন করে।

6.8. প্রশ্নাবলি

1. গমন কাকে বলে?
2. গর্তবাসী প্রাণীরা কীভাবে গমন সম্পন্ন করে?
3. দৌড়নোর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করুন।
4. গমনে কাঁধের ভূমিকা কি?
5. স্ট্রাইড হার কিভাবে দৌড়বাজ প্রাণীদের পটিয়সি করে?
6. দ্রুতগতি প্রাণীদের ভর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনা করুন?

6.9 উত্তরমালা

1. প্রস্তাবনা অংশ দেখুন
2. একক 6.2 অংশ দেখুন।
3. একক 6.3 অংশ দেখুন।
4. একক 6.3 অংশ দেখুন।
5. একক 6.4 অংশ দেখুন।
6. একক 6.4 অংশ দেখুন।

একক 7 ❐ দৃষ্টি

গঠন

7.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

7.2. প্রাণীজগতে আলোক সংবেদন

7.3. মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের গঠন

7.3.1. চোখ উপাঙ্গ

7.3.2. নেত্রগোলকের গঠন

7.4. দৃশ্যগ্রহণের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া

7.4.1. দৃশ্যগ্রহণের ভৌত প্রক্রিয়া

7.4.2. আলোক সংবেদন

7.4.3. আলোক সংবেদনের বিবর্ধন

7.4.4. কোন কোষ এবং বর্ণসংবেদন

7.5. প্রশ্নাবলী

7.6. উত্তরমালা

7.1. প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা:

নানারকমের তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি (electromagnetic energy), যথা X-ray, অতিবেগুনী রশ্মি (UV light), সাধারণ দৃষ্টিগোচর আলো (visible light), তাপ, রেডিও তরঙ্গ ইত্যাদি আমাদের পৃথিবীকে সর্বদা স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থের (pigments) মাধ্যমে উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা এই বিপুল শক্তির কিছুটা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে। ক্লোরোফিলের সাহায্যে যেমন সবুজ উদ্ভিদ আলোকে সালোকসংশ্লেষে ব্যবহার করে, তেমনই বিশেষ রঞ্জকপদার্থের সাহায্যে প্রাণীকুলের একটা বড় অংশ আলোকে ব্যবহার করে মূলত উত্তেজক ও সংবেদক হিসাবে। আলোকে ব্যবহার করে কোনও বস্তুর দিক এবং দূরত্বগত অবস্থানে প্রায় সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে যে যন্ত্র তার নাম চোখ, যদিও চোখ ছাড়া আলোক সংবেদন প্রাণীজগতে বিরল নয়। বস্তুত আলোক সংবেদনের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্পর্কে যে নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায় তা আর অন্য কোনও ধরনের সংবেদন পাওয়া যায় না।

উদ্দেশ্য :

এই অধ্যায়টি পড়লে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- প্রাণীজগতে চোখের বিবর্তন।
- মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের গঠন।
- আলোকসংবেদী কোষ এবং আলোক সংবেদন।

- বিভিন্ন প্রকারের দর্শন।
- দর্শনের শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি।

7.2. প্রাণীজগতে আলোক সংবেদন (Photosensitivity in animals) :

সুগঠিত চোখ না থাকলেও কিছু কিছু প্রোটোজোয়ার মধ্যে আলোকসংবেদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের আলোকসংবেদী অঙ্গকে সাধারণভাবে eye-spot বলা হয়, (উদাঃ– *Euglena sp.*)। এই ধরনের অঙ্গ মোটামুটিভাবে আলোকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং তার তীব্রতা (intensity) বুঝতে সাহায্য করে। বিবর্তনের ফলে প্রাণীজগতে চোখের উৎপত্তি হয়েছে যদিও তার গঠনগত বৈষম্য থেকে গেছে। সাধারণভাবে মোলাস্কা, আর্থ্রোপোডা এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে চোখ একটা সুগঠিত অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। একটি ব্যাখ্যা চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের চোখের গঠন দেখানো হল।

চিত্র : 7.1. প্রাণীকুলের বিভিন্ন রকমের চোখ। এদের মধ্যে প্রচুর মিল দেখা গেলেও এই অঙ্গগুলি হোমোলোগাস নয়।

7.3. মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের গঠন (Structure of a vertebrate eye)

মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসাবে এখানে মানুষের চোখের (চিত্র 7.2) খুব সংশ্লিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হল। চোখ বলতে আমরা সাধারণভাবে অক্ষিগোলক বুঝি। আসলে অক্ষিগোলক ছাড়াও অনেক চোখ উপাঙ্গ থাকে যারা দেখার কাজে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

7.3.1. চোখ উপাঙ্গ

চোখ-উপাঙ্গের নাম এবং তার কাজ একটি ছকের মধ্যে আকারে দেওয়া হল :

চোখ-উপাঙ্গের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কাজ
1. পিউপিল (Pupil)	আইরিস নামক একধরনের গোলাকার পেশি-বলয়ের মধ্যস্থিত একটি ছিদ্র বলয়ের মধ্যস্থিত একটি ছিদ্র বিশেষ। পিউপিলের মধ্যে দিয়ে আলো অক্ষিগোলকে প্রবেশ করে।
2. আইরিস (Iris)	কর্ণিয়ার পশ্চাতে অবস্থিত গোলাকার/চক্রাকার পেশী বলয়। আইরিস পিউপিলের আয়তন নিয়ন্ত্রণ করে। বেশি আলোর প্রভাবে আইরিস প্রসারিত হয়ে পিউপিলকে ছোট করে দেয় এবং কম আলোর ক্ষেত্রে তা সঙ্কুচিত হয়ে পিউপিলকে বড় করে দেয়। ফলে চোখের অবস্থা অনুযায়ী পরিমিত আলোই প্রবেশ করে।
3. স্ক্লেরা (Sclera)	ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা গঠিত যা অক্ষিগোলকের বাইরের অংশকে আবৃত করে রাখে। সাধারণভাবে একে চোখের সাদা অংশ বলা হয়। কর্ণিয়া অংশে স্ক্লেরা থাকে না।

চোখ-উপাঙ্গের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং কাজ
4. কনজাংক্টিভা	এটি একটি আবরণী যা চোখের বাইরের অংশ এবং নেত্রপল্লবকে আবৃত (Conjunctiva) করে রাখে।
5 নেত্রপল্লব (Eyelid)	চোখের উপরিভাগে অবস্থিত আবরণী। এটি অক্ষিগোলককে রক্ষা করে।
6 মেডিয়াল ক্যানথাস (Medial canthus)	নাকের কাছে যেখানে দুটি নেত্রপল্লব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় সেই জায়গাটির নাম।
7. ল্যাটারাল ক্যানথাস (Lateral canthus)	নাকের সাপেক্ষে দূরবর্তী অঞ্চল, যেখানে দুটি নেত্রপল্লব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়।
8 ল্যাক্রাইমাল যন্ত্র (Lacrymal caruncle)	নাকের নিকটবর্তী মেডিয়াল ক্যানথাস অংশে হলুদবর্ণের এই গঠনটি আসলে পরিবর্তিত ঘর্ম এবং সিবেসিয়স গ্রন্থি। চোখকে সিক্ত রাখে ও জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করে।
9 আইল্যাশ (Eyelash)	নেত্রপল্লবের উপর দুই বা তিন স্তরে সাজানো লোম বিশেষ। ধুলোবালি থেকে চোখকে রক্ষা করে।
10 আইব্রো বা ভ্রু (Eyebrows)	চোখের উপরের পল্লবের উপরের লোমস্তর।

7.3.2. নেত্রগোলকের গঠন (Structure of eye ball) ;

1. নেত্রগোলক সাধারণত তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত (চিত্র 6.2 (a))। এগুলি হল— (1) ফাইব্রাস টিউনিক (Fibrous tunic) যার থেকে স্ক্লেরা (Sclera) এবং কর্ণিয়া (Cornea) তৈরি হয়, (2) ভাসকুলার টিউনিক (Vascular tunic) যার থেকে কোরয়েড (Choroid), সিলিয়ারি বডি (Ciliary body) এবং আইরিস (Iris) তৈরি হয়, এবং (3) রেটিনা (Retina) যা আলোক-সংবেদী রড (Rod) এবং কোন (Cone) কোষ দিয়ে গঠিত।

2. নেত্রগোলকের মধ্যবর্তী অংশকে বলে সম্মুখ অবকাশ (anterior chamber)। এই অংশ একপ্রকার তরলে ভর্তি থাকে, একে বলা হয় অ্যাকুয়াস হিউমার (Aqueous humor) এবং লেন্সের পশ্চাদ্‌বর্তী কক্ষ অংশকে বলে পশ্চাৎ কক্ষ বা অবকাশ (Posterior chamber)। এই কক্ষ যে তরলে ভরা থাকে তাকে বলা হয় ভিট্রিয়াস হিউমার (Vitreous humor)।

3. চোখের যে অংশগুলির মধ্যে দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে সেগুলি হল যথাক্রমে : কর্ণিয়া অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স এবং ভিট্রিয়াস হিউমার।

4. সাসপেন্সারি লিগামেন্টের সাহায্যে লেন্স সিলিয়ারি বডির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

5. রেটিনা বহুস্তর বিশিষ্ট এবং জটিল একটি অংশ। এর প্রধান প্রধান কোষস্তরগুলি হল : (a) গ্যাংলিয়ন কোষস্তর (Ganglion cell layer), (b) বাইপোলার কোষস্তর (Bipolar cell layer), (c) রড এবং কোন নিউক্লিয়াস কোষের বাইরের অংশ। গ্যাংলিয়ন কোষস্তর এবং বাইপোলার কোষস্তরের মধ্যে থাকে বিশেষ একধরনের কোষস্তর—আমাক্রাইন কোষস্তর (Amacrien cell layer)। এছাড়াও, রড/কোন কোষের স্তর এবং বাইপোলার স্তরের মধ্যে থাকে আণুভূমিক কোষস্তর (Horizontal cell layer)। রড এবং কোন কোষগুলি শেষে পিগমেন্টেড এপিথেলিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা অতি নিকটে অবস্থান করে। রড এবং কোন কোষের মধ্যে আলোক সংবেদী রঞ্জক বা পিগমেন্ট থাকে। রড কোষগুলি স্বল্পালোকে উদ্দীপিত হয় এবং দৃশ্যমান রঞ্জক

আকার আবৃতি তথা গতিময় অবস্থা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে কোণ কোষগুলি প্রকট আলোকেই উদ্দীপিত হয়। কোণ কোষের সাহায্যে আমরা বর্ণভেদ বুঝতে পারি। মানুষের চোখে কোণ কোষের সংখ্যা গড়ে প্রায় 7000000। এর তুলনায় রড কোষের সংখ্যা প্রায় 10 গুণ থেকে 20 গুণ বেশি (চিত্র 7.2)।

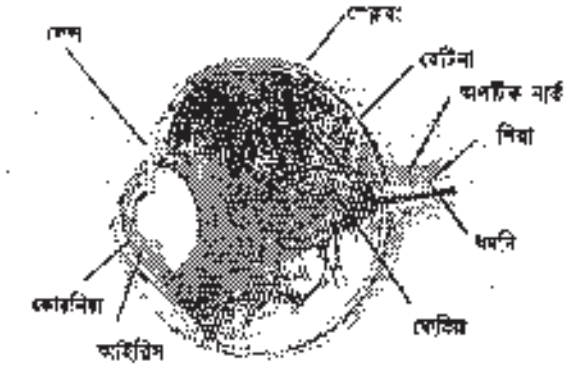

চিত্র : 7.2. (a) মানুষের চোখের গঠন (লম্বচ্ছেদ)

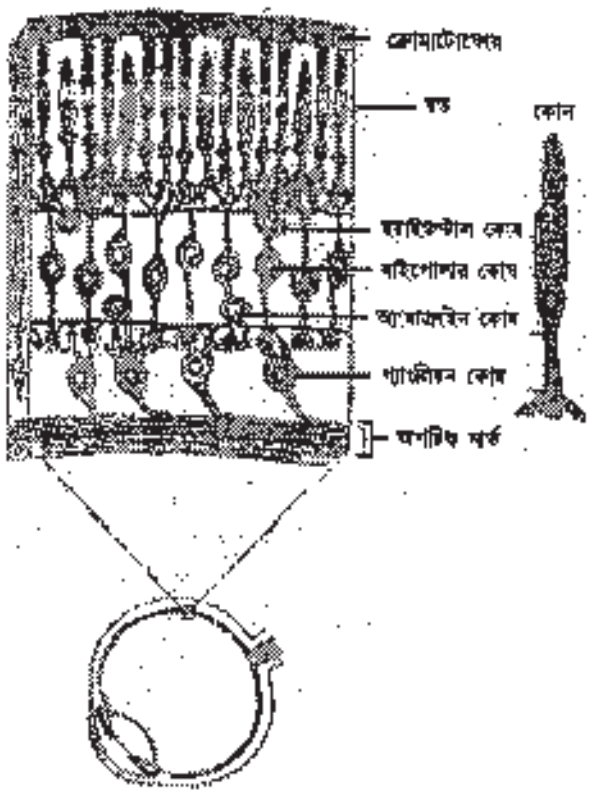

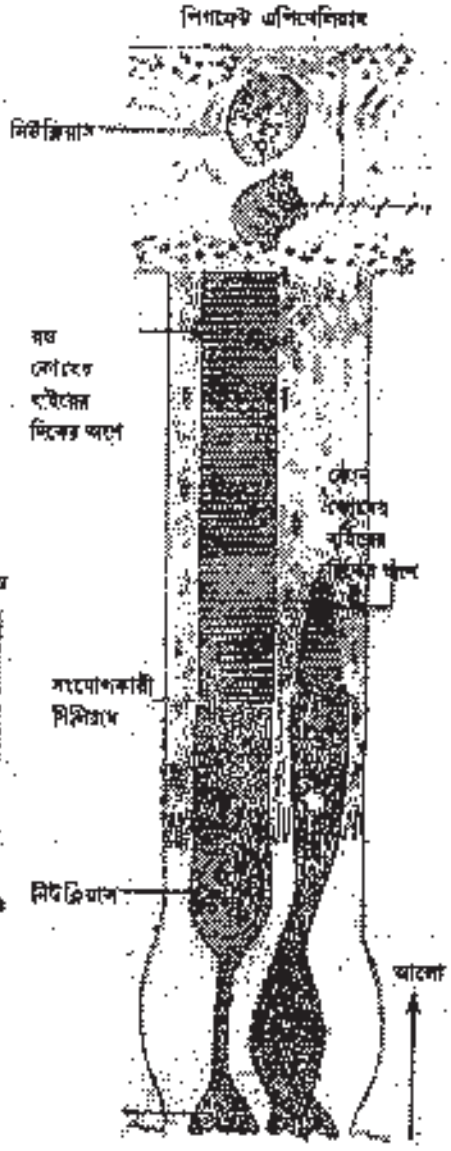

চিত্র : 7.2. (c) মেরুদণ্ডী প্রাণীর 'রড' এবং 'কোণ' কোষের চিত্ররূপ

চিত্র : 7.2. (b) রেটিনার গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)

রেটিনার মধ্যমঞ্চ বরাবর অংশটিকে বলে ম্যাকুলা লুটিয়া (macula lutea)। এই ম্যাকুলা লুটিয়ার কেন্দ্রে কোণ কোষের সংখ্যা সর্বাধিক—যাকে বিজ্ঞানীরা ফোবিয়া (Cetral fovea) বলে থাকেন। ম্যাকুলা লুটিয়া অঞ্চলে রড কোষ প্রায় অনুপস্থিত এবং এই অংশে যে বস্তু দৃশ্যমান হয় তার স্পষ্টতা সর্বাধিক হয়ে থাকে।

গ্যাংলিয়ন স্তর থেকে আক্সনগুলি রেটিনার মধ্যে একটি অংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে অপটিক ডিস্ক বা ব্লাইন্ড স্পট (Blind spot) তৈরি করে। এই অঞ্চল দিয়ে অপটিক নার্ভ (II) নির্গত হয়। রড বা কোণ—কোনও প্রকার কোষ না থাকায় এই অঞ্চল দৃশ্যগ্রহণে অক্ষম।

7.4 দৃশ্যগ্রহণের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া (Physiology of Vision)

7.4.1. দৃশ্যগ্রহণের ভৌত প্রক্রিয়া (Physics of Vision)

মানুষ তথা সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের লেন্সের গঠন এমনই যে এই লেন্স ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলিকে চোখে প্রবেশ করতে দেয় না। এর ফলে ক্রোমাটিক অ্যাবারেশন নামক একটি ভৌত সমস্যা দূরীভূত হয়। চোখের লেন্স স্বচ্ছন্দে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকে রেটিনার উপর কেন্দ্রীভূত করে। এই কেন্দ্রীভূত আলো সামগ্রিকভাবে চোখের মধ্যে সৃষ্ট দর্শনীয় বস্তুর প্রতিচ্ছবি গঠনের মৌল ভৌত পদ্ধতি (চিত্র 7.3)

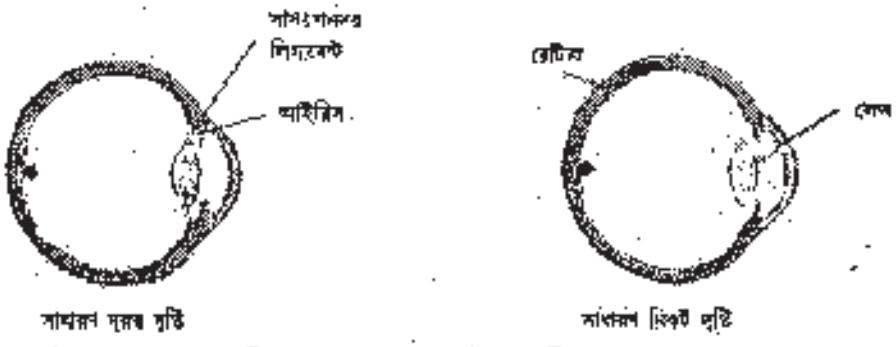

চিত্র : 7.3. দৃশ্যগ্রহণের ভৌত পদ্ধতি।

7.4.2. আলোক সংবেদন (Photoreception)

রেটিনার আলোক সংবেদী কোষগুলি এক একটি ফোটনের (Photon) প্রতি সংবেদনশীল। আলোক সংবেদী কোষে বর্তমান আলোক সংবেদী পিগমেন্টের সাহায্যে প্রথমে ফোটন শোষিত হয়। এই আলোক সংবেদী পিগমেন্টের রাসায়নিক নাম সিস্-রেটিনাল (Cis-retinal)। ফোটন শোষণের ঠিক পরেই এই পিগমেন্টের আকৃতি তথা গঠনগত উভমুখী পরিবর্তন ঘটে (reversible conformational change)। এর ফলে 11 সিস্-রেটিনাল-এ রূপান্তরিত হয়। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী তথা মানুষের ক্ষেত্রে এই পিগমেন্ট আসলে অপসিন নামক প্রোটিনের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে রোডাপসিন (rhodospin) তৈরি করে। রেটিনাল, অপসিন এবং রোডপসিনের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ :

$$\text{RHODOPSIN} \underset{\text{DARK}}{\overset{\text{LIGHT}}{\rightleftarrows}} \text{RETINAL} + \text{OPSIN}$$

$$\text{RETINAL} \rightleftarrows \text{RETINOL}$$

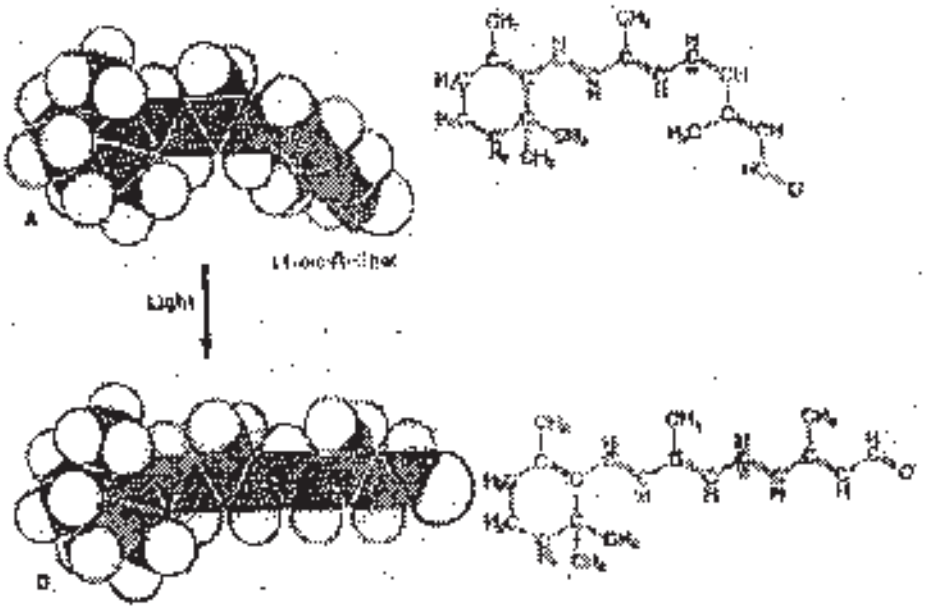

চিত্র : 7.4. (a)

7.4.3. আলোক সংবেদনের বিবর্ধন (Amplification of Photoreception)

এই বিবর্ধন নিম্নলিখিত ধাপে সংঘটিত হয়—

1. রড কোষের প্রত্যেকটি রোডপসিন এক একটি ফোটন শোষণ করে।

2. ফোটনের শোষণের ফলে রোডপসিন অণুর গঠন এবং আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তিত রোডপসিন উৎসেচকের ধর্ম অর্জন করে।

3. প্রতিটি পরিবর্তিত রোডপসিনের উৎসেচক ধর্ম ট্রান্সডিউসিন (Transducin) নামক প্রোটিনের শত সহস্র অণুকে উদ্দীপিত করে।

4. প্রত্যেকটি উদ্দীপিত ট্রান্সডিউসিন অণু কয়েকশত ফসফোডায়াস্টারেজ (Phosphodiesterase) অণুকে উদ্দীপিত করে।

5. এইভাবে উদ্দীপিত ফসফোডায়াস্টারেজ অণু শেষে অগণিত CGMP অণু তৈরি করে।

6. ফলত প্রত্যেকটি শোষিত ফোটন রডকোষের উপর বর্তমান প্রায় 100,00,00 Na^+ চ্যানেল বন্ধ করে দিয়ে রড কোষের মধ্যে Na^+ এর প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে এর ফলে প্রতিটি ফোটন শোষণের কারণে এক সেকেন্ড গতে প্রায় 1000টি Na^+ চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায়।

চিত্র : 7.4. (b) 11-cis রেটিনাল থেকে all-trans রেটিনাল-এর রূপান্তর

সুতরাং আলোকসংবেদী রডকোষগুলি প্রারম্ভিক আলোক সংবেদনকে ধাপে ধাপে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে এক অণু রোডপসিন যখন একটিমাত্র ফোটন কণা শোষণ করে সেই শোষিত ফোটন কণা ন্যূনতম 105টি CGMP অণুর হাইড্রোলিসিস করে থাকে।

7.4.4 কোণ কোষ এবং বর্ণসংবেদন (Cone cells and colour vision) :

রড্ কোষ যেমন স্বল্পালোকে সংবেদনশীল, কোণ কোষ তেমনই উজ্জ্বল আলোকে সংবেদনশীল। রড কোষের মাধ্যমে সংবেদিত দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি আমাদের মস্তিষ্কে সাদাকালো প্রতিচ্ছবির অনুভূতি জাগায়। অন্যদিকে কোণ কোষের আলোক সংবেদনের ফলে সৃষ্ট দর্শনীয় বস্তুর প্রতিচ্ছবি আমাদের মস্তিষ্কে বর্ণময় অনুভূতির সৃষ্টি করে। যদিও কোণ কোষের আলোক সংবেদন প্রক্রিয়া বহুলাংশে রড কোষের ওই প্রক্রিয়ার সমতুল্য। গঠনগতভাবে কোণ কোষ রড কোষের তুলনায় অনেকটাই ছোট। বস্তুত কোণকোষ তিনধরনের হয়ে থাকে যারা যথাক্রমে নীল (455 nm) সবুজ (530 nm) এবং লাল (625 nm) আলোকে সংবেদনশীল হয়। বাস্তবে অবশ্য এই তিনধরনের কোষের সামগ্রিক সংবেদনশীলতার ওপরে দৃশ্যমান বস্তুর বর্ণময় অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্ক মারফত হয়ে থাকে।

7.5. প্রশ্নাবলি

1. প্রাণীকুলের প্রধান অংশ আলোকে ব্যবহার করে স্নায়ু উত্তেজক ও সংবেদন হিসাবে—বুঝিয়ে লিখুন।
2. মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের গঠনের (চিত্রসহ) বর্ণনা লিখুন।
3. নেত্রগোলক সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
4. দৃশ্যগ্রহণের ভৌত পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
5. আলোক সংবেদনের ফলে পেটিনাল, আপসিন এবং রোডাপসিনের সম্পর্ক নির্ধারণ করুন, এবং আলোক সংবেদনের বিবর্ধন বর্ণনা করুন।
6. টীকা লিখুন
   (a) চোখ — আলোক সংবেদক
   (b) স্ক্লেরা
   (c) নেত্রপল্লব
   (d) রেটিনা
   (e) কোণ কোষ

7.6. উত্তরমালা

1. 7.1. — 7.2 অংশ দেখুন
2. 7.3 "
3. 7.3.2 "
4. 7.4.1 "
5. 7.4.2 — 7.4.3 "
6. পর্যায়টি পড়ে উত্তর লিখুন।

একক 9 ❐ কোষের রাসায়নিক উপাদানসমূহ

গঠন

9.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

9.1 কোষের উপাদান সমূহের বর্ণনা

9.1.1 জল

9.1.2 অজৈব আয়ন

9.1.3 জৈব অণু

9.1.3A কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

9.1.3B লিপিড (Lipid)

9.1.3C প্রোটিন (Protein)

9.1.3D নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)

9.2 প্রশ্নাবলী

9.3 উত্তরাবলী

9.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

কোষ হল জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক। একটি বাড়ি যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁট দিয়ে তৈরি হয়, তেমনি বহুকোষী জীবের দেহ অনেকগুলি কোষ দিয়ে গঠিত এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন কোষ সমষ্টি তথা কলার মধ্যে শ্রমবণ্টন থাকে। আবার এককোষী জীবের একটি কোষই গঠন ও সমস্ত রকম জৈবনিক কাজ করে থাকে। দুই জার্মান বিজ্ঞানী M.J. Schleiden এবং T. Schwann যথাক্রমে 1838 সালে উদ্ভিদকোষে ও 1839 সালে প্রাণিকোষে নিরীক্ষার পর একই সিদ্ধান্তে যেন যে, "প্রতিটি জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত এবং কোষ জীবদেহের গঠনমূলক ও জৈবনিক ক্রিয়ার একক"। ঐ দুই বিজ্ঞানীর মতবাদ কোষতত্ত্ব (cell theory) নামে পরিচিত।

কোষের গঠন অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র প্রকারের। এটি নিজের প্রতিলিপি গঠনে এবং বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজে সক্ষম। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার কিছু সূত্র যা জড় অণু পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, তা কোষকেও মেনে চলতে হয়। আধুনিক কোষবিদ্যায় কোষের কাজকর্ম তার রাসায়নিক ও ভৌত বিক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

9.1 কোষের উপাদান সমূহের বর্ণনা

কোষের রাসায়নিক উপাদান তিন প্রকারের : জল, অজৈব আয়ন ও কার্বন-যুক্ত জৈব অণু।

9.1.1 জল (Water)

জল কোষের সর্বাধিক পরিমাণের উপাদান। জলের পরিমাণ কোষের মোট ওজনের 70% বা বেশি। জল একটি পোলার (polar) অণু, যেখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর ঈষৎ ধনাত্মক চার্জ এবং অক্সিজেন পরমাণুর ঈষৎ ঋণাত্মক চার্জ আছে। এই পোলার প্রকৃতির জন্য জলের অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে অথবা অন্য পোলার অণুর সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে এবং তাছাড়া ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আয়নের সঙ্গেও ক্রিয়া করতে পারে। এই সমস্ত আন্তঃক্রিয়ার ফলে আয়ন ও পোলার অণুগুলি সহজেই জলে দ্রবণীয় (হাইড্রোফিলিক বা জলাকর্ষী); অপরদিকে ননপোলার অণুগুলি জলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, ফলে খুব অল্প পরিমাণে দ্রাব্য (হাইড্রোফোবিক বা জলবিকর্ষী)। পরিবর্তে ননপোলার অণুগুলি নিজেরা ঘনিষ্ঠ-সংযোগ হয়ে জলের সঙ্গে সংস্পর্শ হ্রাস করার প্রবণতা দেখায়। পোলার ও ননপোলার অণুগুলির নিজেদের মধ্যে এবং জলের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া কোষপর্দা গঠনে এক বড় ভূমিকা পালন করে।

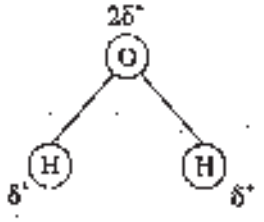

Fig.9.1 জল অণুর গঠন

9.1.2 অজৈব আয়ন (Inorganic ions)

কোষের অজৈব আয়ন, যথা সোডিয়াম (Na^+), পটাসিয়াম (K^+) ম্যাগনেসিয়াম (Mg^{2+}), ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}) ক্লোরাইড (Cl^-), বাইফসফেট (HPO_4^{2-}) এবং বাইকার্বোনেট (HCO_3^-) কোষীয় বস্তুর 1% বা কম পরিমাণ গঠন করে। এই আয়নগুলি কোষীয় বিপাকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িত এবং কোষের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

9.1.3 জৈব অণু (Organic molecules)

জৈব অণুগুলি কোষের অধিতীয় উপাদান। এইগুলিকে প্রধান চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড। এদের মধ্যে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ও অধিকাংশ কার্বোহাইড্রেট (পলিস্যাকারাইড) হল ম্যাক্রোমলিকিউল (macromolecule) বা বৃহৎ-অণু বিশিষ্ট, কারণ এরা শতাধিক বা হাজারখানেক কম অণুবিক ওজনের পূর্বসূরী একক (যেমন, যথাক্রমে অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিওটাইড, সরল শর্করা) নিয়ে গঠিত। এই ম্যাক্রোমলিকিউলগুলি অধিকাংশ কোষের শুষ্ক ওজনের 80-90% গঠন করে। তাছাড়া লিপিডও কোষের অপর প্রধান জৈব উপাদান। কোষীয় বস্তুর বাকি অংশ হল বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র জৈব অণু, যাদের মধ্যে কিছু ম্যাক্রোমলিকিউল জৈব অণুর পূর্বসূরী পদার্থরূপে কাজ করে।

9.1.3A কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শর্করা

কার্বোহাইড্রেট তিন প্রকারের :

a) মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide) বা সরল শর্করা

এই প্রকার কার্বোহাইড্রেট কেবল একটি মাত্র সরল শর্করা অণু নিয়ে গঠিত। এর সাধারণ আণবিক সংকেত হল $(CH_2O)_n$। কার্বন পরমাণুর সংখ্যা তিন থেকে সাতটি হয় এবং সেই অনুসারে যথাক্রমে ট্রায়োজ (Triose), টেট্রোজ (Tetrose), পেন্টোজ (Pentose), হেক্সোজ (Hexose) অথবা হেপটোজ (Heptose) নামে পরিচিত।

এদের মধ্যে হেক্সোজ শর্করা ($C_6H_{12}O_6$) গ্লুকোজ হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সর্বাধিক পরিমাণের শর্করা, কোষীয় শক্তির প্রধান উৎস এবং অন্যান্য উপাদান তৈরির প্রথম কাঁচামালরূপে কাজ করে। অন্যান্য হেক্সোজ শর্করা হল ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজ। ট্রায়োজ শর্করা ($C_3H_6O_3$) হল গ্লিসেরালডিহাইড ও ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন। উল্লেখযোগ্য পেন্টোজ শর্করা ($C_5H_{10}O_5$) হল রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ যা যথাক্রমে RNA ও DNA তে থাকে। কোষে পেন্টোজ অথবা অধিক কার্বনযুক্ত শর্করাগুলি রিং গঠন করে থাকে। এই রিং আবার প্রথম কার্বনের সঙ্গে যুক্ত অণুর বিন্যাসের ভিত্তিতে α এবং β আকারের হতে পারে।

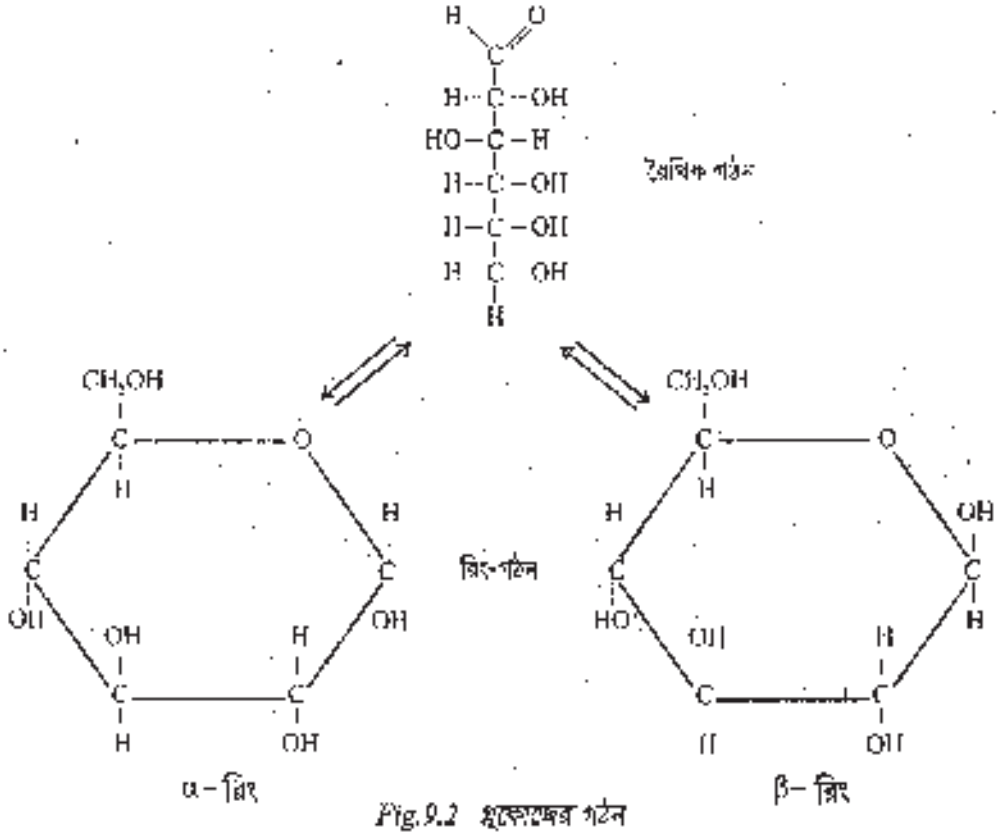

Fig. 9.2 গ্লুকোজের গঠন

b) **অলিগোস্যাকারাইড** (Oligosaccharide)

কয়েকটি সরল শর্করা অণু গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র শৃঙ্খলের অলিগোস্যাকারাইড তৈরি করে। ডাইস্যাকারাইড (Disaccharide) বা দ্বিশর্করা, ট্রাইস্যাকারাইড (Trisaccharide) বা ত্রিশর্করা ইত্যাদি এর অন্তর্গত। কোষের উল্লেখযোগ্য দ্বিশর্করা হল সুক্রোজ (Sucrose), মলটোজ (Maltose), ল্যাকটোজ (Lactose) ও ট্রিহালোজ (Trehalose)।

c) **পলিস্যাকারাইড** (Polysaccharide) **বা বহুশর্করা**

শতখানেক অথবা হাজারখানেক সরল শর্করা অণু গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে পলিস্যাকারাইড তৈরি করে। দুটি সাধারণ পলিস্যাকারাইড হল গ্লাইকোজেন (Glycogen) ও শ্বেতসার (Starch); যারা যথাক্রমে প্রাণী কোষ ও উদ্ভিদ কোষের সঞ্চয়ী পদার্থ। গ্লাইকোজেনের আণবিক ওজন 1–4 মিলিয়ন ডালটন হতে পারে। প্রাণীকোষে ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় গ্লাইকোজেন ঘন-সন্নিবিষ্ট দানাদার বস্তুরূপে পুঞ্জিত আছে। গ্লাইকোজেন ও শ্বেতসার উভয়ই সম্পূর্ণরূপে গ্লুকোজ অণু দিয়ে তৈরি, যারা α-আকারে বিন্যস্ত। এখানে প্রধানতঃ একটি গ্লুকোজের প্রথম কার্বনের সঙ্গে পরবর্তী গ্লুকোজের চতুর্থ কার্বনের বন্ধন ঘটে এবং একে **1⟶4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ড** (1⟶4 glycosidic bond) বলে। গ্লুকোজের প্রথম কার্বন অণুর সঙ্গে যুক্ত অণুর বিন্যাসের ভিত্তিতে এটি প্রকৃতপক্ষে α (1⟶4) গ্লাইকোসাইডিক বন্ড। এরূপভাবে যুক্ত গ্লুকোজ শৃঙ্খলের সঙ্গে 1-6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা অপর একটি (1⟶4) গ্লুকোজ

শৃঙ্খল যুক্ত হয় এবং এইভাবে শাখা সৃষ্টি হয়। এই প্রকার শাখা সৃষ্টি গ্লাইকোজেন এবং অ্যামাইলোপেকটিন (Amylopectin) নামক শ্বেতসারে পাওয়া যায়। অ্যামাইলোজ (Amylose) নামক শ্বেতসার এক শাখাবিহীন অণু। গ্লাইকোজেন ও শ্বেতসার এইভাবে মৌলিক গঠনে এবং কার্যগতভাবে মিল দেখায়। উভয়ের কাজই গ্লুকোজ সঞ্চয় করা।

অপর প্রকার পলিস্যাকারাইড হল সেলুলোজ (Cellulose), যা উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের প্রধান গঠনগত উপাদানরূপে কাজ করে। এটি সম্পূর্ণরূপে গ্লুকোজ অণু নিয়ে গঠিত। তবে এখানে গ্লুকোজ অণুগুলি β (1 → 4) গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে লম্বা শৃঙ্খল তৈরি করে এবং শৃঙ্খলগুলি পাশাপাশি বিন্যস্ত হয়ে এক যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়।

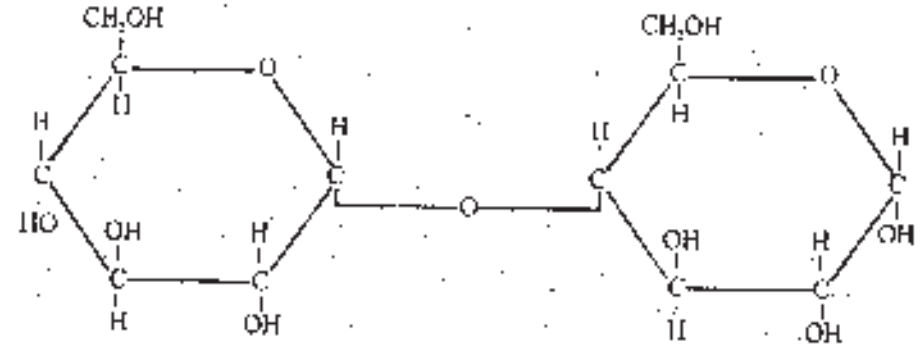

Fig.9.3 দুইটি α-লিং গ্লুকোজ অণুর মধ্যে α (1 → 4) গ্লাইকোসাইডিক বন্ড গঠন

মন্তব্য : শক্তি বা খাদ্যসঞ্চয় এবং কোষ গঠনের কাজ ছাড়াও অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড লিপিড অথবা প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে গ্লাইকোলিপিড ও গ্লাইকোপ্রোটিন তৈরি করে এবং প্লাজমা পর্দা থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কোষীয় বার্তা প্রেরণে (Signalling) ভূমিকা নেয়। অলিগোস্যাকারাইড প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে বহন করে কোষগুলে অথবা কোষীয় অঙ্গাণুতে চালান করে। তাছাড়া, অলিগোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড কোষ সনাক্তকরণে এবং কোষের অন্তঃক্রিয়ায় অংশ নেয়।

9.1.3B লিপিড (Lipid)

কোষে লিপিড প্রধান তিনটি ভূমিকা পালন করে। প্রথমত এটি শক্তির বড় উৎস। 1 gm ফ্যাট সম্পূর্ণ জারণে 9.3 Kcal শক্তি যোগান দেয়। দ্বিতীয়তঃ এটি সমস্ত রকম কোষপর্দার এক প্রধান গঠনগত উপাদান। তৃতীয়ত : এটি স্টেরয়েড হর্মোনরূপে এবং বাহক অণুরূপে কোষের সঙ্কেত বা বার্তা পাঠানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এটি নিম্ন প্রকারের :-

a) **চর্বি ও মোম (Fat and Wax)**

এগুলি সরল লিপিড নামে পরিচিত এবং ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের এস্টার (Ester)। ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি লম্বা হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলের গঠন, প্রায়শই 16 অথবা 18টি কার্বন পরমাণুযুক্ত এবং একপ্রান্তে কার্বক্সিল গ্রুপ (–COOH) যুক্ত। ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত উভয় প্রকৃতির

হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসেরলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চর্বি বা ফ্যাট তৈরি করে অথবা অন্য অ্যালকোহলের (সিটাইল অ্যালকোহল, মিরিসিল অ্যালকোহল) সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোম তৈরি করে। কোষের সাইটোপ্লাজমে ফ্যাট সাধারণতঃ ট্রাইঅ্যাসিলগ্লিসেরল (Triacylglycerol) (ট্রাইগ্লিসেরাইড, প্রশম ফ্যাট) রূপে জমা থাকে। এতে একটি গ্লিসেরল অণুর সঙ্গে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড অণু যুক্ত হয়।

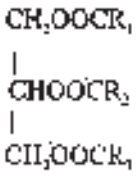

Fig.9.4 ট্রাইঅ্যাসিলগ্লিসেরল, এখানে R_1, R_2 ও R_3 তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডের পার্শ্বশৃঙ্খল।

b) **ফসফোলিপিড (ফসফ্যাটাইড) ঃ**

ফসফোলিপিড কোষ পর্দার প্রধান উপাদান। এটি ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যালকোহল, ফসফেট গ্রুপ এবং অন্যান্য অনুষঙ্গিক পদার্থ নিয়ে গঠিত। এটি অ্যাম্ফিপ্যাথিক (Amphipathic) চরিত্রের অর্থাৎ আংশিকভাবে (মস্তক প্রান্ত) জলে দ্রবণীয় বা পোলার (Hydrophilic) কিন্তু অপর আংশিকভাবে (পুচ্ছ প্রান্ত) জলে অদ্রবণীয় বা ননপোলার (Hydrophobic)।

এটি দুই প্রকারের ঃ-

1) **ফসফোগ্লিসেরাইড (Phosphoglyceride) ঃ**

যে ফসফোলিপিডে গ্লিসেরল অ্যালকোহল রূপে থাকে, তাকে ফসফোগ্লিসেরাইড বলে। গ্লিসেরলের দুটি কার্বনের সঙ্গে ফ্যাটি অ্যাসিড ও তৃতীয় কার্বনের সঙ্গে একটি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত থাকে, যা অপরদিকে কোলিন, ইথানলামিন, সেরিন, অ্যাইনোসিটল অথবা দ্বিতীয় গ্লিসেরল অণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে যথাক্রমে ফসফাটাইডিলকোলিন (লেসিথিন), ফসফাটাইডিল ইথানলামিন (সেফালিন), ফসফাটাইডিলসেরিন, ফসফাটাইডিল অ্যাইনোসিটল ও ডাই ফসফাটাইডিল গ্লিসেরল (কার্ডিওলিপিন) তৈরি হয়। লেসিথিন প্রাণীকোষ পর্দার প্রধান ফসফোলিপিড এবং সেফালিন প্রধানত ব্যাকটেরিয়ার কোষ পর্দায় থাকে।

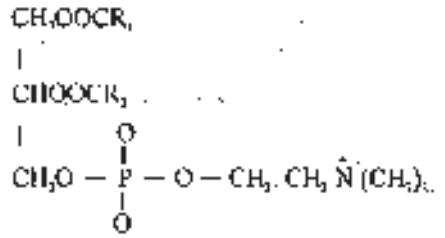

Fig.9.5 ফসফাটাইডিল কোলিন, এখানে R_1 ও R_2 দুইটি ফ্যাটি অ্যাসিডের পার্শ্বশৃঙ্খল

2) স্ফিংগোমাইলিন (Sphingomyelin) বা ফসফোস্ফিংগোসাইড (Phosphosphingoside)

এটি স্ফিংগোসিন (Sphingosine) নামক অসম্পৃক্ত অ্যামাইনো ডাইহাইড্রক্সি অ্যালকোহল, ফ্যাটি অ্যাসিড, ফসফেট গ্রুপ ও একটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক (সাধারণত কোলিন) নিয়ে গঠিত। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়ার কোষ পর্দায় স্ফিংগোমাইলিন বা অন্য স্ফিংগোলিপিড থাকে না।

c) গ্লাইকোলিপিড (Glycolipid) :

এটি ফসফরাসবিহীন স্ফিংগোলিপিড এবং স্ফিংগোসিন, ফ্যাটি অ্যাসিড ও অতিরিক্ত কোন কার্বোহাইড্রেট গ্রুপ নিয়ে গঠিত। যদি কার্বোহাইড্রেট সরল শর্করা যথা গ্লুকোজ অথবা গ্যালাকটোজ প্রকৃতির হয়, তখন তাকে সেরিব্রোসাইড (Cerebroside) বলে। যদি কার্বোহাইড্রেট অলিগোস্যাকারাইড প্রকৃতির হয়, তখন তাহাকে গ্যাংগ্লিওসাইড (Ganglioside) বলে। বিশেষত স্নায়ুতন্তে গ্লাইকোলিপিড প্রচুর পরিমাণে থাকে। স্নায়ুতন্তুর মাইলিন আবরণে গ্যালাকটোসেরিব্রোসাইড নামক গ্লাইকোলিপিড বেশি থাকে।

d) কোলেস্টেরল (Cholesterol) :

প্রাণীকোষ পর্দায় কোলেস্টেরল নামক লিপিড তথা স্টেরল থাকে এবং কিছুক্ষেত্রে এর পরিমাণ মোট লিপিডের 50% অবধি হতে পারে। কোলেস্টেরল অধিকাংশ উদ্ভিদের কোষপর্দায় এবং সমস্ত ব্যাকটেরিয়ার পর্দায় অনুপস্থিত। এটি চারটি মিলিত হাইড্রোকার্বন রিং, একটি ক্ষুদ্র অ্যালিফ্যাটিক শৃঙ্খল এবং একটি একক হাইড্রক্সিল গ্রুপ নিয়ে গঠিত। এটিও অ্যাম্ফিপ্যাথিক প্রকৃতির। ইস্ট্রোজেন (Estrogen), প্রোজেস্টেরন (Progesterone), টেস্টোস্টেরন (Testosterone) গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid), মিনেরালোকর্টিকয়েড নামক স্টেরয়েড হর্মোন কোলেস্টেরলজাত পদার্থ। তাছাড়া, পিত্ত অ্যাসিড (কোলিক অ্যাসিড, ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, চেনোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, লিথোকোলিক অ্যাসিড) কোলেস্টেরল থেকে সংশ্লেষিত হয়।

9.1.3C প্রোটিন (Protein)

কোষের সমস্ত ম্যাক্রোমলিকিউলের মধ্যে প্রোটিন হল সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ। একটি আদর্শ ইন্যপায়ীকোষে 10,000 বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন থাকতে পারে, যারা বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে থাকে।

যেখানে কোষের নিউক্লিক জিনগত বার্তা বহন করে, সেখানে প্রোটিনের প্রাথমিক দায়িত্ব হল উক্ত বার্তা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করা। প্রোটিনের ভূমিকা বহুমুখী : কোষ ও কলার গঠনগত উপাদান প্রদান করা, ক্ষুদ্র অণুর বহন ও সঞ্চয়, যেমন হিমোগ্লোবিন দ্বারা অক্সিজেন বহন, মায়োগ্লোবিন দ্বারা অক্সিজেন সঞ্চয়; বিভিন্ন কোষের মধ্যে বার্তা প্রেরণ, যেমন পলিপেপটাইড হর্মোন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড হর্মোন; সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যেমন অ্যান্টিবডি, গমনে সংকোচী উপাদানরূপে কাজ করা, যেমন অ্যাকটিন, মায়োসিন; রক্তে তঞ্চনকারী উপাদানরূপে কাজ করা, যেমন ফাইব্রিনোজেন; বিষরূপে কাজ করা, যেমন সাপের বিষ; আলোশোষণ বা

নির্গত করা, যেমন জোনাকি পোকার লুসিফেরিন (Luciferin)। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল প্রোটিনের উৎসেচকরূপে প্রায় সমস্ত প্রাণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটন করা। এইভাবে প্রোটিন বস্তুতঃ কোষের সমস্ত কাজে অংশ নেয়।

প্রোটিন হল অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার। প্রোটিনে 20 প্রকারের α–অ্যামাইনো-অ্যাসিড সচরাচর পাওয়া যায়। এছাড়াও কতকগুলি অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড অল্প পরিমাণে প্রোটিনে এবং প্রোটিন বিহীন যৌগে পাওয়া যায়। এই অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ α–অ্যামাইনো অ্যাসিডের রূপান্তর। প্রতিটি α–অ্যামাইনো অ্যাসিড একটি α–কার্বন পরমাণু এবং তার সঙ্গে যুক্ত একটি কার্বক্সিল গ্রুপ ($-COO^-$), একটি অ্যামাইনো গ্রুপ ($-NH_3^+$), একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি নির্দিষ্ট পার্শ্বশৃঙ্খল (R) নিয়ে গঠিত। এই প্রোটিনের গঠনে ও কাজে সংশ্লিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভূমিকা তার পার্শ্বশৃঙ্খলের রাসায়নিক ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় ঃ-

1) চার্জবিহীন ননপোলার অ্যামাইনো অ্যাসিড, যথা গ্লাইসিন, অ্যালানিন ইত্যাদি সহ দশটি অ্যামাইনো অ্যাসিড।

2) চার্জবিহীন পোলার অ্যামাইনো অ্যাসিড, যথা সেরিন, টাইরোসিন ইত্যাদি সহ পাঁচটি অ্যামাইনো অ্যাসিড।

3) চার্জযুক্ত ক্ষারীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, যথা লাইসিন, আর্জিনিন ও হিসটিডিন নামক তিনটি আমাইনো অ্যাসিড।

4) চার্জযুক্ত আম্লিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, যথা অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ও গ্লুটামিক অ্যাসিড নামক দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিড।

প্রোটিন তৈরিতে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি পরস্পরের সঙ্গে পেপটাইড (–CO.NH–) দ্বারা যুক্ত হয়। একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের α–অ্যামাইনো গ্রুপ পাশের অ্যামাইনো অ্যাসিডের α–কার্বক্সিল গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেপটাইড বন্ড তৈরি করে। এইভাবে শতখানেক বা হাজার আমাইনো অ্যাসিড পরপর যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড তৈরি করে। ফলে প্রতি পলিপেপটাইডের একপ্রান্তে মুক্ত α–অ্যামাইনো গ্রুপ থাকে, যা অ্যামাইনো প্রান্ত বা N-প্রান্ত (N-terminal end) তৈরি করে এবং অপর প্রান্তে মুক্ত α–কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে, যা কার্বক্সি প্রান্ত বা C-প্রান্ত (c-terminal end) তৈরি করে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম পলিপেপটাইড শৃঙ্খল হল টাইটিন (Titin) নামক পেশী প্রোটিন, যার প্রায় 27000 অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

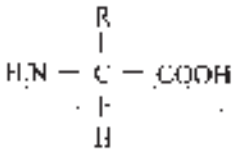

Fig.9.6 অ্যামাইনো অ্যাসিড, এখানে *R* পার্শ্বশৃঙ্খল।

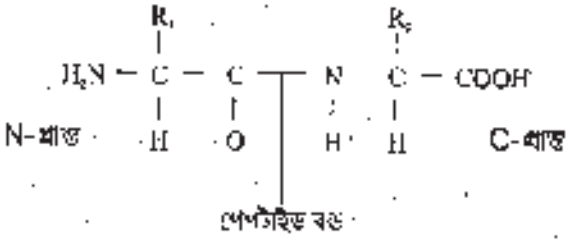

Fig.9.7 প্রোটিনের অংশবিশেষ (ডাইপেপটাইড), এখানে R_1 ও R_2 পার্শ্বশৃঙ্খল।

9.1.3D নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic acid)

DNA ও RNA নামক দুইটি নিউক্লিক অ্যাসিড কোষের প্রধান বার্তাবাহক অণু। RNA ভাইরাস ছাড়া সব জীবেই DNA জিনবস্তুরূপে কাজ করে এবং এটি ইউক্যারিওট কোষে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। RNA ভাইরাসে RNA জিনবস্তুরূপে কাজ করে। তাছাড়া, RNA-এর গঠনগত ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনুঘটনজনিত ভূমিকাও থাকে। ইউক্যারিওট কোষে নন-জেনেটিক (Non-genetic) বা অজিন RNA চার প্রকারের : m RNA, r RNA, t RNA এবং ক্ষুদ্র নিউক্লিয়ার RNA (SnRNA)। DNA-তে যে জিনবস্তুর বার্তা রক্ষিত থাকে, তা m RNA (ম্যাসেঞ্জার RNA)-তে সঞ্চারিত হয় (ট্রান্সক্রিপশন)। m RNA রাইবোজোমে চলে আসে ও এখানে টেমপ্লেটরূপে কাজ করে। এর বার্তা (কোডন) অনুযায়ী নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংযুক্তি ঘটে প্রোটিন তৈরি হয় (ট্রান্সলেশন)। t RNA (ট্রান্সফার RNA) নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডকে রাইবোজোমে ধরে আনে এবং এর অ্যান্টিকোডন m RNA-এর যে কোডনের সঙ্গে মিল খায় সেখানেই তার বহন করা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে যুক্ত করে। r RNA (রাইবোজোমাল RNA) রাইবোজোম গঠনের উপাদান।

DNA ও RNA উভয়ই অসংখ্য নিউক্লিওটাইডের পলিমার। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডের তিনটি অংশ থাকে : একটি ফসফেট গ্রুপ, একটি পাঁচ-কার্বনের শর্করা ও একটি নাইট্রোজেন ক্ষারক। DNA ও RNA-এর নিউক্লিওটাইডকে যথাক্রমে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড ও রাইবোনিউক্লিওটাইড বলে। DNA ও RNA-এর নিউক্লিওটাইডে যথাক্রমে **ডিঅক্সিরাইবোজ** ও **রাইবোজ** শর্করা থাকে। DNA-তে অ্যাডিনিন (Adenine), গুয়ানিন (Guanine), থাইমিন (Thymine) ও সাইটোসিন (Cytosine) এবং RNA-তে অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল (Uracil) ও সাইটোসিন নামক ক্ষারক থাকে। অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন পিউরিন জাতীয় ক্ষারক ও দুটি রিং নিয়ে গঠিত। থাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল পিরিমিডিন জাতীয় ক্ষারক ও একটি রিং নিয়ে গঠিত। একটি নিউক্লিওটাইডের 5' ফসফেট ও অপর নিউক্লিওটাইডের 3'-হাইড্রক্সিল গ্রুপের মধ্যে ফসফোডাইএস্টার বন্ড (Phosphodiester bond) তৈরি হয়। DNA একটি দ্বিতন্ত্রী গঠন। RNA একতন্ত্রী বটে, তবে কিছু অংশ ভাঁজ হয়ে দ্বিতন্ত্রী অংশ তৈরি করে এবং জটিল প্রবেণি বা টারশিয়ারি গঠন (Tertiary structure) দেখায়।

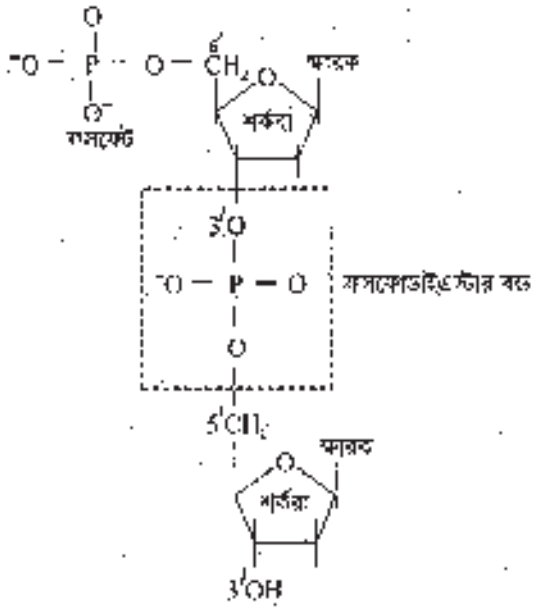

Fig. 9.8 একটি নিউক্লিক অ্যাসিডের দুইটি নিউ-নিউক্লিওটাইডের মধ্যে বন্ড।

নিউক্লিওটাইড কেবল নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠনগত একক নয়, এটি কোষের অন্য প্রক্রিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ATP অর্থাৎ অ্যাডিনোসিন 5' - ট্রাইফসফেট যা কোষের মধ্যে রাসায়নিক শক্তির প্রধান উৎস। অন্য নিউক্লিওটাইডও (যথা GTP বা গুয়ানোসিন 5'-ট্রাইফসফেট) একইভাবে শক্তির উৎসরূপে কাজ করে। কখনও নিউক্লিওটাইড বিক্রিয়াকারী রাসায়নিক গ্রুপের বাহকরূপে কাজ করে। কিছু নিউক্লিওটাইড (যথা, সাইক্লিক AMP, সাইক্লিক GMP) কোষের মধ্যে বার্তাপ্রেরক অণুরূপে (Second messenger) কাজ করে।

9.2 প্রশ্নাবলী

9.2.1 অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :-

1) কোষের সংজ্ঞা লিখুন।
2) কোষের রাসায়নিক উপাদান প্রধানত কয়প্রকারের ও কি কি?
3) কোষে প্রাপ্ত দুটি হেক্সোজ শর্করার নাম লিখুন।
4) কোষে প্রাপ্ত দুটি পেন্টোজ শর্করার নাম লিখুন।
5) কোষে প্রাপ্ত দুটি ডিশর্করার নাম লিখুন।
6) কোষে প্রাপ্ত দুটি পলিস্যাকারাইডের নাম লিখুন।
7) কোষে প্রাপ্ত দুটি সরল লিপিডের নাম লিখুন।
8) কোষে প্রাপ্ত দুটি ফসফোলিপিডের নাম লিখুন।
9) কোষে প্রাপ্ত কোলেস্টেরল জাত দুটি হর্মোনের নাম লিখুন :
10) সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম প্রোটিন শৃঙ্খল কোনটি?

9.2.2 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :-

1) কোষে অবস্থিত জল ও অজৈব আয়ন সমূহের বিবরণ দিন।
2) কোষে অবস্থিত কার্বহাইড্রেটের বিবরণ দিন।
3) কোষে অবস্থিত লিপিডের বিবরণ দিন।
4) কোষে অবস্থিত প্রোটিন উপাদানের বিবরণ দিন।

9.2.3 দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :-

1) কোষের রাসায়নিক উপাদান সমূহের বর্ণনা দিন।
2) কোষের উপাদানরূপে বিভিন্ন জৈব অণু সমূহের বর্ণনা দিন।

9.3 উত্তরাবলী

9.3.1 1) কোষ হল জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত একক।

2) কোষের রাসায়নিক উপাদান প্রধানত তিন প্রকারের - জল, অজৈব আয়ন ও কার্বন-যুক্ত অণু।

3) গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজ।

4) রাইবোজ ও ডি-অক্সিরাইবোজ।

5) সুক্রোজ ও মলটোজ।

6) গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ।

7) চর্বি ও মোম।

8) ফসফোগ্লিসেরাইড ও স্ফিংগোমাইলিন।

9) ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন।

10) টাইটিন

9.3.2 1) 9.1.1 ও 9.1.2 দেখুন।

2) 9.1.3A দেখুন।

3) 9.1.3.B দেখুন।

4) 9.1.3C দেখুন।

9.3.3 1) 9.1 দেখুন।

2) 9.1.3 দেখুন।

একক 10 □ উৎসেচক (Enzyme)

গঠন

10.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

10.1 সংজ্ঞা

10.2 নামকরণ (Nomenclature)

10.3 শ্রেণী বিন্যাস (Classification)

10.4 উৎসেচকের ধর্ম

10.5 ধাতব কো-ফ্যাক্টর ও তাদের উৎসেচকের নাম

10.6 উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি

10.7 উৎসেচক বিক্রিয়ার হার

10.8 উৎসেচক বিক্রিয়ার হারের প্রভাবক শর্তসমূহ

10.9 উৎসেচকের ক্রিয়ায় বাধাদান

10.10 আইসোএনজাইম (Isoenzyme)

10.11 প্রশ্নাবলী

10.12 উত্তরমালা

10.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

দেহের বা কোষের জৈবনিক কাজ করার জন্য যে অসংখ্য জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া চলে, তা এক প্রকার জৈব অনুঘটকের মাধ্যমে ঘটে। উৎসেচকের অভাবে এই সব বিক্রিয়ার হার এত ধীর হয়ে যায় যে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরা সাধারণতঃ রাসায়নিক অনুঘটক থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পৃথক। একটি আদর্শ মানব কোষে কয়েক হাজার উৎসেচক থাকে। বিজ্ঞানী Kühne (1878) সর্বপ্রথম 'এনজাইম' শব্দটি ব্যবহার করেন।

10.1 সংজ্ঞা

উৎসেচক হল জৈব কোষ কর্তৃক সংশ্লেষিত এক প্রকারের প্রোটিন যা কোন নির্দিষ্ট জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে ঐ বিক্রিয়াকে কয়েক লক্ষগুণ ত্বরান্বিত করে এবং যারা বিক্রিয়ার শেষে নিজে অপরিবর্তিত থাকে।

10.2 নামকরণ (Nomenclature)

প্রায়শই সাবস্ট্রেট (substrate) অর্থাৎ যে বস্তুর উপর উৎসেচক ক্রিয়া করে, তার শেষে 'ase' ('এজ') সাফিক্স যোগ করে উৎসেচকের নামকরণ করা হয় : যেমন, ইউরিয়েজ (Urease) যা ইউরিয়ার উপর ক্রিয়া করে, সুক্রেজ (sucrase) যা সুক্রোজের উপর ক্রিয়া করে, অ্যামাইলেজ (amylase) যা স্টার্চ বা শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া করে। আবার উৎসেচক যে ধরনের বিক্রিয়া ঘটায়, তার ভিত্তিতে উৎসেচকের নাম দেওয়া হয় : যেমন, জারণ বিক্রিয়ার জন্য ডিহাইড্রোজিনেজ বা ডিহাইড্রোজিনেজ (dehydrogenase); বিজারণ বিক্রিয়ার জন্য রিডাকটেজ (reductase); আর্দ্র বিশ্লেষণের জন্য হাইড্রোলেজ (hydrolase); ATP থেকে অন্য অণুতে ফসফেট গ্রুপ স্থানান্তরকরণের জন্য কাইনেজ (Kinase) ইত্যাদি।

1972 সালে International Union of Biochemistry উৎসেচক নামের জন্য এক নিয়মের ছক চালু করেন। এই ছকে প্রতিটি উৎসেচককে চারটি পূর্ণসংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় - যার প্রথম সংখ্যাটি উৎসেচকের প্রধান শ্রেণী (main class), দ্বিতীয় সংখ্যা উপশ্রেণী (sub class), তৃতীয় সংখ্যা পরাউপশ্রেণী (sub sub class) ও শেষ সংখ্যাটি ক্রমিক সংখ্যা (পরাউপশ্রেণীর মধ্যে) নির্দেশ করে।

10.3 শ্রেণী বিন্যাস (Classification)

কোন প্রকারের বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে, তার ভিত্তিতে উৎসেচককে ছয়টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :-

1. অক্সিডোরিডাকটেজ (Oxidoreductase)

   এই শ্রেণীর উৎসেচকগুলি জারণ-বিজারণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা ইলেকট্রন (e^-) ও

হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) স্থানান্তর করণে কার্যকরী হয়।

উদা ঃ ডিহাইড্রোজিনেজ, অক্সিডেজ, অক্সিজিনেজ, রিডাকটেজ ইত্যাদি।

2. ট্রান্সফারেজ (Transferase)

এই উৎসেচকগুলি একটি যৌগ থেকে অন্য যৌগে ফাংশনাল গোষ্ঠী তথা নির্দিষ্ট মূলকের স্থানান্তর ঘটায়। এদের ক্রিয়ায় সাবস্ট্রেটের কার্বন, অ্যালডিহাইড বা কিটো অংশ, সালফার, ফসফরাস অথবা নাইট্রোজেন যুক্ত অংশ অন্য কোন যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উদা ঃ কাইনেজ, ফসফোরাইলেজ, ট্রান্স অ্যামাইনেজ (transaminase), ট্রান্স অ্যাসিটিলেজ (transacetylase) ইত্যাদি।

3. হাইড্রোলেজ (Hydrolase)

এই শ্রেণীর উৎসেচকগুলি জলের উপস্থিতিতে সাবস্ট্রেটের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটায়।

উদা ঃ অ্যামাইলেজ, ইউরিয়েজ, পেপটাইডেজ, ফসফাটেজ, ATP-এজ ইত্যাদি।

4. লায়েজ (Lyase)

এই শ্রেণীর উৎসেচকগুলি সাবস্ট্রেট থেকে একটি মূলককে অপসারিত করে ডবল বন্ড তৈরি করে অথবা কোন মূলককে ডবল বন্ডে যোগ করে।

উদা ঃ অ্যালডোলেজ, আইসোসাইট্রেট লায়েজ, সাইট্রেট সিন্থেটেজ ইত্যাদি।

5. আইসোমারেজ (Isomerase)

এই শ্রেণীর উৎসেচকগুলি সাবস্ট্রেটের আন্তঃআণবিক পুনর্বিন্যাস ঘটায়।

উদা ঃ এপিমারেজ, মিউটেজ, সিস-ট্রান্স আইসোমারেজ ইত্যাদি।

6. লাইগেজ (Ligase)

এই শ্রেণীর উৎসেচকগুলি দুইটি সাবস্ট্রেটের মধ্যে বন্ড সৃষ্টি করে (C–O, C–S, C–N, C–C) এদের যুক্ত করে।

উদা ঃ পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, সাক্সিনেট থায়োকাইনেজ, সাক্সিনিল কো-A সিন্থেটেজ ইত্যাদি।

10.4 উৎসেচকের ধর্ম

1. রাসায়নিক প্রকৃতি

সমস্ত উৎসেচক বর্তুলাকার প্রোটিন জাতীয়। অধিকাংশ উৎসেচক সংযুক্ত প্রকৃতির অর্থাৎ ক্রিয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্ষুদ্র অণু যুক্ত থাকে, যাকে **কোফ্যাক্টর** (Cofactor) বলে। কোফ্যাক্টর সরল অজৈব ধাতব আয়ন

(Fe^{2+}, Mg^{2+}, Mn^{2+}, Zn^{2+} ইত্যাদি) হতে পারে অথবা জটিল জৈব অণু তথা কোএনজাইম (Coenzyme) হতে পারে। যখন কোএনজাইম দৃঢ়ভাবে কেভ্যালেন্ট (Covalent) বন্ড তৈরির মাধ্যমে উৎসেচকের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন ঐ কোএনজাইমকে প্রসথেটিক গ্রুপ (Prosthetic group) বলে। কোফাক্টরবিহীন উৎসেচককে অ্যাপোএনজাইম (Apoenzyme) বলে এবং কোফ্যাক্টরযুক্ত সম্পূর্ণ উৎসেচককে হলোএনজাইম (Holoenzyme) বলে।

2. অনুঘটন ধর্ম

উৎসেচক কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটনের কাজ করে ঐ বিক্রিয়ার হার কয়েক লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে। এটি বিক্রিয়ার সক্রিয়ন শক্তি (Activation energy) হ্রাস করে। এর অভাবে বিক্রিয়ার হার অতি ধীর হয়।

3. স্বল্পতায় উচ্চক্ষমতা

এর অনুঘটন ক্ষমতা অতি উচ্চ অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ উৎসেচক অল্প সময়ে বিশাল পরিমাণ সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া করতে পারে। যেমন, এক অণু ক্যাটালেজ প্রতি সেকেন্ডে দেহ তাপমাত্রায় প্রায় 600 হাজার অণু হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে ভেঙে জল ও অক্সিজেন তৈরি করে। একটি উৎসেচক গড়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 1000 টি বিক্রিয়া অনুঘটন করে।

4. সুনির্দিষ্টতা (Specificity)

একটি উৎসেচক কেবল একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা সাবস্ট্রেটের উপর ক্রিয়া করে, ঠিক যেমন একটি নির্দিষ্ট চাবিকাঠি এক নির্দিষ্ট তালাতে প্রবিষ্ট হয়।

উদা : আর্জিনেজ উৎসেচক আর্জিনিন অ্যামিনো অ্যাসিডের জলবিশ্লেষণ ঘটিয়ে ইউরিয়া ও অর্নিথিন তৈরি করে।

5. সক্রিয় স্থান (Active site)

উৎসেচকের একটি নির্দিষ্ট সক্রিয় স্থান থাকে, যেখানে বিক্রিয়া ঘটে। ঐ স্থানের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে।

6. বিপরীতমুখী বিক্রিয়া

উৎসেচক দ্বারা অনুঘটিত বিক্রিয়া সাধারণতঃ বিপরীতমুখী।

7. উত্তাপজনিত প্রভাব

উৎসেচক উত্তাপে সহজে বিনষ্ট হয়।

8. শর্ত নির্ভরশীলতা

উৎসেচকের ক্রিয়া pH, তাপমাত্রা, সাবস্ট্রেটের পরিমাণ ও উৎসেচকের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

10.5 কিছু ধাতব কোফ্যাক্টর ও তাদের উৎসেচকের নাম

1. Cu^{+} ⟶ সাইটোক্রোম অক্সিডেজ।
2. Fe^{2+} বা Fe^{3+} ⟶ ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ
3. K^{+} ⟶ পাইরুভেট কাইনেজ
4. Mg^{2+} ⟶ হেক্সোকাইনেজ
5. Mn^{2+} ⟶ আর্জিনেজ
6. Zn^{2+} ⟶ কার্বোনিক অ্যানহাইড্রেজ, কার্বক্সিপেপটাইডেজ A ও B।

10.6 উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি

উৎসেচকের অনুঘটন ক্ষমতা প্রধানত পরিণামে মুক্ত শক্তি (free energy) থেকে প্রাপ্ত হয়। এই শক্তি উৎসেচক ও তার সাবস্ট্রেটের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া এবং দুর্বল বন্ড (নন্ কোভ্যালেন্ট) সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয়। এই মুক্ত শক্তি উৎসেচকের সুনির্দিষ্টতা ও অনুঘটনের জন্য দায়ী। উৎসেচক মুক্ত শক্তির সাহায্যে বিক্রিয়ার সক্রিয়তা শক্তিকে কমিয়ে দেয়। সক্রিয়তা শক্তি হ্রাসের মাধ্যমে উৎসেচকের বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়।

A. সক্রিয় বা অনুঘটনকারী স্থান (Active or Catalytic site)

সাবস্ট্রেট বা বিক্রিয়ক উৎসেচক অণুর এক নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হলে উৎসেচকের ক্রিয়া শুরু হয়। এই স্থানকে বলে সক্রিয় বা অনুঘটনকারী স্থান। এটি 3–12টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত, যারা পেপটাইড শৃঙ্খলে পরস্পর থেকে দূরে থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার সময় উৎসেচকের সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি গঠনের ভাঁজের (folding) ফলে কাছে চলে আসে। সক্রিয় স্থানের জটিল ত্রি-মাত্রিক আকার থাকে ও এটি প্রধানত নন পোলার খাঁজ সৃষ্টি করে, যেখানে সাবস্ট্রেট যুক্ত হয়।

B. উৎসেচক সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স বা যৌগ (Enzyme-substrate complex)

Henri (1903) এবং পরে Michaelis ও Menten (1913)-এর মতে এনজাইম (E) প্রথমে সাবস্ট্রেট (S)-এর সঙ্গে দুর্বল নন-কোভ্যালেন্ট বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক অস্থায়ী এনজাইম-সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স (ES) তৈরি করে। এই কমপ্লেক্স বা যৌগ শীঘ্র বিয়োজিত হয়ে অপরিবর্তিত উৎসেচক ও প্রোডাক্ট (উৎপন্ন পদার্থ) (P) তৈরি করে। এই প্রোডাক্ট উৎপাদনের হার এনজাইম-সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্সের ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক।

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ-

$$E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons EP \rightleftharpoons E + P$$

প্রোডাক্ট তৈরি হলে তা আর সক্রিয়স্থানে যুক্ত থাকতে পারে না এবং মাধ্যমে চলে আসে। তখন অপরিবর্তিত উৎসেচক পুনরায় অন্য সাবস্ট্রেটের সঙ্গে ক্রিয়া করে।

C. **এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগের বন্ড সমূহ :**

এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ প্রধানত নন-কোভ্যালেন্ট বন্ড বা দুর্বল বন্ড যথা, H-বন্ড, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড, হাইড্রোফোবিক বন্ড, ভ্যান ডার ওয়ালস্ বল দ্বারা গঠিত হয়। কখনও একটি কোভ্যালেন্ট বন্ডও এনজাইমকে তার সাবস্ট্রেটের সঙ্গে আবদ্ধ করে।

D. **এনজাইম-সাবস্ট্রেট যৌগ সৃষ্টির মডেল :**

দুটি মডেল বা তত্ত্ব আছে

1. **তালা-চাবি তত্ত্ব** (Lock and Key hypothesis) / **টেমপ্লেট মডেল** (Template model)

Fisher (1890) এই তত্ত্বের প্রস্তাবক। এই মতে সাবস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে এনজাইমের সক্রিয়স্থান আগে থেকেই যথাযথ আকারে থাকে। সক্রিয়স্থান (তালা) নিজে থেকে একটি ছাঁচ (টেমপ্লেট) প্রদান করে, যা সাবস্ট্রেটের (চাবি) আকার, আকৃতি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে উপযুক্ত ও নির্দিষ্ট। এনজাইমের সক্রিয় স্থান সাবস্ট্রেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনুঘটন ঘটায়। কিন্তু এর নিজের ত্রিমাত্রিক গঠনের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এই মডেল দ্বারা অনেক উৎসেচকের নির্দিষ্ট প্রকার সাবস্ট্রেটের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ধর্মকে ব্যাখ্যা করা যায়।

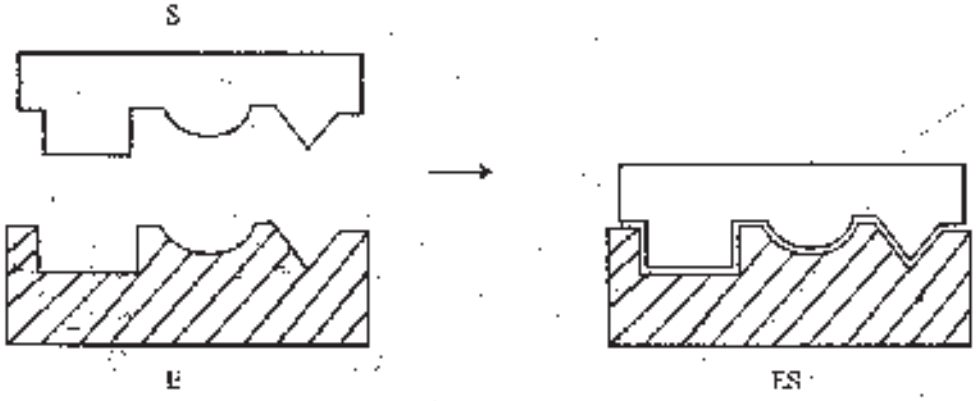

Fig.1 তালা-চাবি মডেল

2. **আবেশিত যোগ্য তত্ত্ব / ইনডিউসড্ ফিট মডেল** (Induced fit model)

Koshland (1959) এই তত্ত্বের প্রস্তাবক। এই মতে এনজাইমের সক্রিয় স্থানের ত্রিমাত্রিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে। সাবস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতে এনজাইমের সক্রিয় স্থান যুক্ত হওয়ার জন্য সঠিক আকারে থাকে না। সাবস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ও তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কালে এনজাইমের সক্রিয়স্থানের আকারের পরিবর্তন ঘটে ও তারপরই অনুঘটন ঘটে।

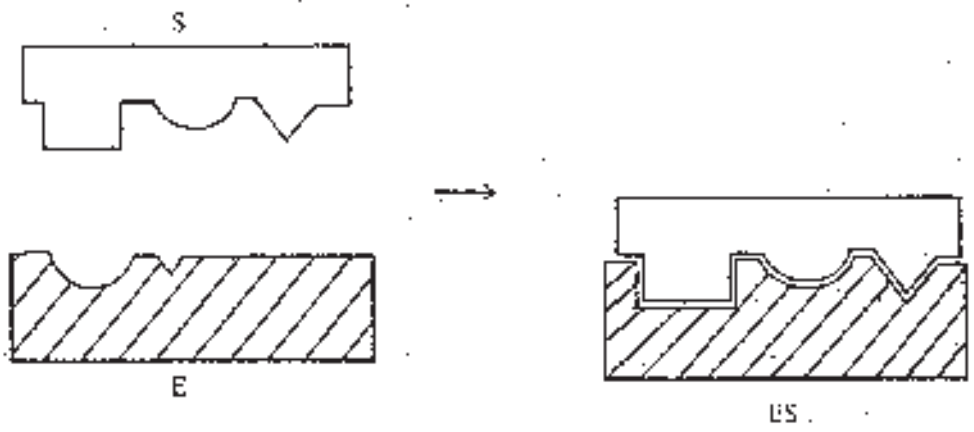

Fig.2 আবেশিত যোগ মডেল

এই মডেল দ্বারা এনজাইমের জটিল সম্পৃক্ত কাইনেটিকস্ (Complex Saturation Kinetics), কমপিটিটিভ ইনহিবিশন (Competitive Inhibition) ও অ্যালোস্টেরিক মডিউলেশন (Allosteric Modulation) ব্যাখ্যা করা যায়।

10.7 উৎসেচক বিক্রিয়ার হার (Rate of enzyme reaction)

নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ সাবস্ট্রেট পরিবর্তিত হয় অথবা প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়, তার ভিত্তিতে উৎসেচক বিক্রিয়ার হার পরিমাপ করা হয়। এই হার বিক্রিয়ার প্রারম্ভ দশায় গ্রাফে স্পর্শকের (tangent) ঢাল বা ক্রমাবনতি মেপে নির্ধারিত হয়। ঢাল যত খাড়া প্রকৃতির হবে, বিক্রিয়ার হার তত বেশি। যদি উৎসেচকের সক্রিয়তা অনেক সময় ধরে মাপা হয়, তখন দেখা যায় যে বিক্রিয়ার হার সাধারণত হ্রাস পায়। এটা প্রধানত সাবস্ট্রেট ঘনত্বের হ্রাসের কারণে হয়।

10.8 উৎসেচক বিক্রিয়ার হারের প্রভাবক শর্তসমূহ (Factors affecting rate of enzyme reaction)

উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়ার হারের উপর কোন একটি প্রদত্ত শর্তের প্রভাব দেখতে গেলে অন্যান্য শর্তগুলিকে ধ্রুবক এবং অপটিমাম (optimum) বা সর্বোচ্চ অনুকূল মাত্রায় রাখতে হবে।

A. উৎসেচকের ঘনত্ব (Enzyme concentration)

যদি সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব উচ্চমাত্রায় রাখা হয় এবং অন্যান্য শর্ত, যথা pH ও তাপমাত্রা ধ্রুবক রাখা হয়, তবে বিক্রিয়ার গতি উৎসেচক ঘনত্বের সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

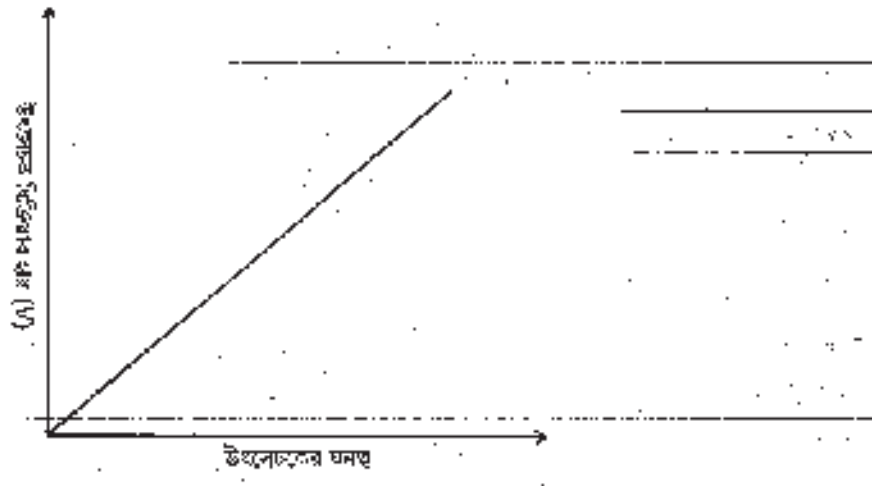

Fig.3 বিক্রিয়ার হার ও উৎসেচক ঘনত্বের সম্পর্ক

B. **সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব ও মাইকেলিস-মেনটেন গতিবিদ্যা:** (Substrate concentration and Michaelis-Menten Kinetics)

যদি সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব অত্যন্ত কম ঘনত্ব থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা হয়, তবে উৎসেচক ক্রিয়া প্রথমে আনুপাতিক হারে বাড়ে। তা গ্রাফে রৈখিক বৃদ্ধিরূপে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সাবস্ট্রেট ঘনত্বের পুনঃবৃদ্ধিতে প্রাথমিক গতিবেগের বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমে। অবশেষে এক উচ্চ সাবস্ট্রেট ঘনত্বে প্রাথমিক গতিবেগ সর্বোচ্চ মান 'V_{max}'-এ পৌঁছায় এবং তা সাবস্ট্রেট ঘনত্বের পুনঃবৃদ্ধিতেও আর বৃদ্ধি পায় না। সাবস্ট্রেটের মোলার ঘনত্বের [S] সাপেক্ষে উৎসেচকের প্রাথমিক গতিবেগ 'V'-এর মান বসালে, গ্রাফের গঠন তখন আয়তাকার হাইপারবলিক (rectangular hyperbolic) প্রবৃত্তির হয়। অনেক উৎসেচকই এই হাইপারবলিক সম্পৃক্ত গতিবেগ (hyperbolic saturation kinetics) দেখায়।

নিম্ন সাবস্ট্রেট ঘনত্বে সমস্ত উৎসেচক অণুগুলি সাবস্ট্রেট অণুদ্বারা সম্পৃক্ত হয় না। সাবস্ট্রেট ঘনত্ব ধীরে ধীরে বাড়ানোর ফলে ক্রমশ আরো বেশি উৎসেচক অণু সাবস্ট্রেট অণুর সাথে বিক্রিয়া করতে থাকে, ফলে উৎসেচক বিক্রিয়ার গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়ে। কিন্তু যেহেতু উৎসেচক অণুর সংখ্যা সাবস্ট্রেট অণুর তুলনায় কম, এমন এক অবস্থা এক সময় আসে যখন সমস্ত উৎসেচক অণু সাবস্ট্রেট অণুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতায় সর্বোচ্চ গতিবেগ (V_{max}) দেখায়। এরপর সাবস্ট্রেট ঘনত্ব পুনরায় বৃদ্ধি করলেও উৎসেচক ক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ে না, কারণ তখন মুক্ত উৎসেচক অণু থাকে না।

মাইকেলিস ও মেনটেন (1913)-এ সম্পর্কে কাজ করে যে সমীকরণ তৈরি করেন তা মাইকেলিস-মেনটেন সমীকরণ (Michaelis-Menten equation) নামে পরিচিত।

তা নিম্নরূপ :-

$$V=\left(\frac{V_{max}[S]}{k_m+[S]}\right) \text{ অথবা } K_m=[S]\times\left(\frac{V_{max}}{V}-1\right)$$

এখানে V = উৎসেচক ক্রিয়ার গতি, S = সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বা পরিমাণ, V_{max} = উৎসেচক ক্রিয়ার সর্বোচ্চ গতি, K_m = মাইকেলিস ধ্রুবক;

যখন $V = \frac{1}{2} V_{max}$,

তখন $K_m = [S]\left(\frac{V_{max}}{\frac{1}{2}V_{max}} - 1\right) = [S]$

সুতরাং, K_m হল সাবস্ট্রেটের যে মোলার ঘনত্বে উৎসেচক ক্রিয়ার সর্বাধিক গতির অর্ধেক অর্জিত হয়, তাকে বোঝায়। K_m এর মান প্রায় 10^{-6} থেকে 10^{-1} মোল প্রতি লিটারে। এটি একটি উৎসেচকের সাবস্ট্রেটের প্রতি আসক্তির মাত্রা নির্দেশ করে। K_m মান যত কম হবে, উৎসেচকের সাবস্ট্রেটের প্রতি আসক্তি তত বেশি হবে। একটি উৎসেচকের সাবস্ট্রেট বিশেষে K_m মান ভিন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ, পাইরুভেট কার্বক্সিলেজের K_m মান তার তিনটি সাবস্ট্রেটের পরিপ্রেক্ষিতে (যথা, ATP, পাইরুভেট ও HCO_3^-) যথাক্রমে 6×10^{-5}, 4×10^{-4} এবং 1×10^{-3}M। K_m-এর মান উৎসেচক ঘনত্ব অথবা অপ্রতিযোগিতামূলক বাধাদানকারী পদার্থ (non competitive inhibitor) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাধাদানকারী পদার্থ (Competitive inhibitor), pH বা তাপমাত্রা বা আয়নিক ঘনত্বের পরিবর্তন দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

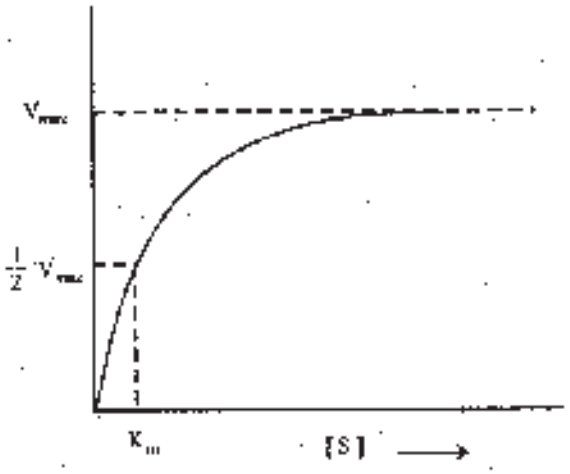

Fig.4 হাইপারবলিক সাবস্ট্রেট সম্পৃক্ত গতিরেখ

C. প্রোডাক্ট (Product) বা উৎপন্ন পদার্থের প্রভাব

বিক্রিয়াজাত প্রোডাক্ট উৎসেচকের সক্রিয় স্থান অধিকার করে থাকতে পারে এবং ফলে তখন সাবস্ট্রেটের জন্য লভ্য হয় না। প্রোডাক্ট আবার বিপরীতমুখী বিক্রিয়ায় পুনরায় সাবস্ট্রেট তৈরি করতে পারে। সুতরাং, প্রোডাক্ট ঘনত্ব বেশি হলে উৎসেচক বিক্রিয়ার হার হ্রাস পায়।

D. pH-এর প্রভাব :

প্রতিটি উৎসেচক এক নির্দিষ্ট pH মানে সর্বোচ্চ সক্রিয়তা দেখায়। একে বলে **অপটিমাম pH** বা **সর্বোচ্চ অনুকূল pH** (Optimum pH)। এর কম বা বেশি মানে উৎসেচক ক্রিয়া হ্রাস পায়। pH-এর পরিবর্তনে সাবস্ট্রেট ও উৎসেচকের সক্রিয় স্থান উভয়েরই চার্জের পরিবর্তন অথবা উৎসেচকের

অ্যাপোএনজাইম ও প্রসথেটিক গ্রুপের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অথবা অয়নিক ও হাইড্রোজেন বন্ড বিনষ্ট হওয়া দ্বারা উৎসেচকের ত্রিমাত্রিক গঠন ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি ঘটতে পারে। ফলে তখন উৎসেচক ক্রিয়া পাল্টে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, পেপসিন, সুক্রেজ ও অগ্ন্যাশয়ের লাইপেজের অপটিমাম pH যথাক্রমে 2.00, 4.50 ও 9.00। সাবস্ট্রেট বিশেষে একটি উৎসেচকের অপটিমাম pH ভিন্ন হয়।

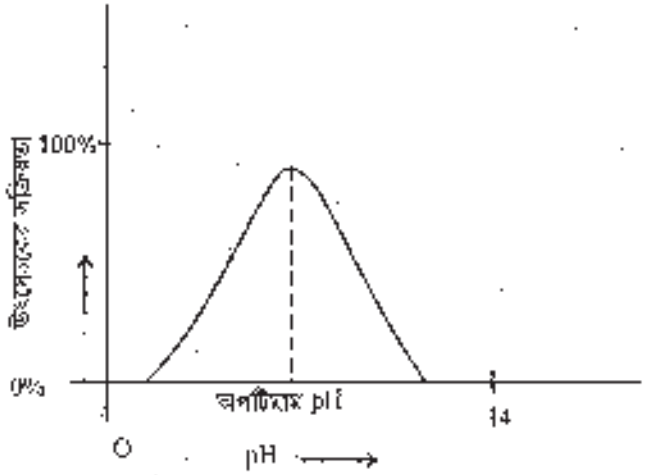

Fig.5 উৎসেচকের সক্রিয়তায় pH-এর প্রভাব

E. তাপমাত্রার প্রভাব

প্রতিটি উৎসেচক এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ সক্রিয়তা দেখায়। একে বলে অপটিমাম তাপমাত্রা বা সর্বোচ্চ অনুকূল তাপমাত্রা (optimum temperature)। এর কম বা বেশি মানে উৎসেচক ক্রিয়া ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। তাপমাত্রা উৎসেচক ক্রিয়ার দ্বিমুখী প্রভাব দেখায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে একদিকে বিক্রিয়াকারী অণুগুলির গতিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে উৎসেচক অণুর ডিনেচারেশন (denaturation) ঘটে। অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে উক্ত দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি প্রথম প্রক্রিয়া থেকে বেশি হারে ঘটে। কিন্তু অপটিমাম তাপমাত্রা মানে ঐ দুই প্রভাব এমনভাবে ভারসাম্যে থাকে যে উৎসেচকের সক্রিয়তা সর্বোচ্চভাবে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎসেচকের অপটিমাম তাপমাত্রা দেহ তাপমাত্রার কাছাকাছি (37-40°C)।

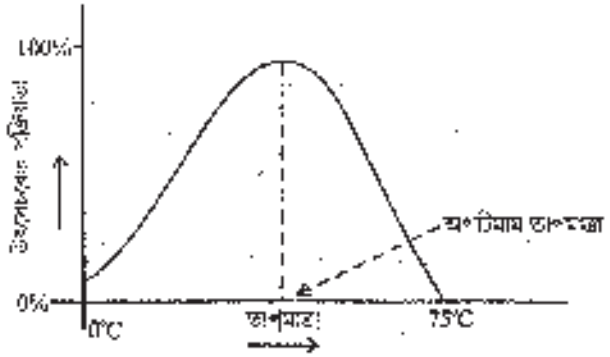

Fig.6 উৎসেচকের সক্রিয়তায় তাপমাত্রার প্রভাব

10.9 উৎসেচকের ক্রিয়ায় বাধাদান (Inhibition of enzyme activity)

কিছু প্রকারের ক্ষুদ্র অণু উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়ার হ্রাস ঘটায়। এদের উৎসেচক বাধাদানকারী (Enzyme inhibitors) বলে। যেমন, অনেক ভারী ধাতু, ওষুধ বা বিষাক্ত পদার্থ।

এই বাধাদান আবার বিভিন্ন প্রকারের ঃ-

A. প্রতিযোগিতামূলক বাধাদান (Competitive inhibition)

এই প্রকার বাধাদানে বাধাদানকারী পদার্থগুলির গঠন ও আকৃতি স্বাভাবিক সাবস্ট্রেটের ন্যায়। ফলে ঐ পদার্থগুলি উৎসেচকের সক্রিয় স্থানের সঙ্গে সংলগ্ন হয় ও ঐ স্থানে সাবস্ট্রেটের সংযুক্তিতে বাধা দেয়। সুতরাং এখানে উৎসেচকের সক্রিয়স্থান দখলের জন্য সাবস্ট্রেট ও বাধাদানকারী পদার্থের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রকার বাধাদানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে বাধাদানকারী পদার্থগুলি উৎসেচকের সক্রিয় স্থান থেকে খসে পড়ে ও ঐ স্থানে সাবস্ট্রেট যুক্ত হয়। ফলে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়।

B. অপ্রতিযোগিতামূলক বিপরীত পরিবর্তনযোগ্য বাধাদান (Non-competitive reversible inhibition)

এই প্রকারে বাধাদানকারী পদার্থগুলির আকৃতি ও গঠন সাবস্ট্রেটের ন্যায় নয় এবং উৎসেচকের সক্রিয়স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থানে সংলগ্ন হয়। ফলে বাধাদানকারী পদার্থের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে সাবস্ট্রেট ঘনত্বের কোন হেরফের হয় না। ফলে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় না।

C. অপ্রতিযোগিতামূলক স্থায়ী বাধাদান (Non-competitive irreversible inhibition)

কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ উৎসেচকের স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করে ও তার ক্রিয়াশীলতা বিনষ্ট করে। যেমন, কিছু ভারী ধাতব আয়ন যথা - Hg^{2+}, Ag^{+}, As^{2+}, কিছু আয়োডিনযুক্ত যৌগ ইত্যাদি যৌগ উৎসেচকের সালফহাইড্রিল গ্রুপের (–SH) সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে।

D. অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক (Allosteric enzyme)

কিছু উৎসেচকের আকৃতি পরিবর্তন যোগ্য, যা নিয়ন্ত্রিত হয় অপ্রতিযোগিতামূলক বাধাদানকারীদের দ্বারা। এই পদার্থগুলি উৎসেচকের নির্দিষ্ট স্থানে সংলগ্ন হয়ে সক্রিয়স্থানের আকৃতিগত অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়। এই প্রকার বাধাদানকারীদের অ্যালোস্টেরিক বাধাদানকারী বলে।

10.10 আইসোএনজাইম (Isoenzyme)

একই কার্যকরিতাযুক্ত কিন্তু আণবিক গঠনে সামান্য পার্থক্যযুক্ত উৎসেচকগুলিকে আইসোএনজাইম বা আইসোজাইম (Isozyme) বলে। যেমন, মানবদেহে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের পাঁচ প্রকার গঠন পাওয়া যায়। যকৃত কোষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার এবং বিশেষ করে কঙ্কালপেশীতে প্রথমটি বেশি পাওয়া যায়। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার হৃৎপেশীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

10.11 প্রশ্নাবলী

10.11.1 সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-

1) 'এনজাইম' শব্দটি প্রথম কে প্রচলন করেন?

2) প্রস্থেটিক গ্রুপ কি?

3) উৎসেচকের সংজ্ঞা লিখুন।

4) উৎসেচকের সক্রিয় স্থান কাকে বলে?

5) উৎসেচক ক্রিয়ায় তালা-চাবি মডেল লিখুন।

6) উৎসেচক ক্রিয়ায় আবেশিত যোগ্য মডেল লিখুন।

7) উৎসেচক ক্রিয়ায় pH-র প্রভাব বর্ণনা করুন।

8) উৎসেচকের নামকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

9) হলোএনজাইম কি?

10) অ্যাপো-এনজাইম কাকে বলে?

10.11.2 দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-

1) উৎসেচকের শ্রেণীবিন্যাস করুন।

2) উৎসেচকের ধর্মগুলি বর্ণনা করুন।

3) উৎসেচকের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করুন।

4) উৎসেচক বিক্রিয়া হারের প্রভাবক শর্তগুলি আলোচনা করুন।

10.12 উত্তরমালা

10.12.1 1) বিজ্ঞানী Kühne

2) যখন কো-এনজাইম দৃঢ়ভাবে কো-ভ্যালেন্ট বন্ড তৈরির মাধ্যমে উৎসেচকের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন ঐ কো-এনজাইমকে প্রস্থেটিক গ্রুপ বলে।

3) 10.1 দেখুন।

4) 10.6A দেখুন।

5) 10.6D (1) দেখুন।

6) 10.6D (2) দেখুন।

7) 10.8D দেখুন।

8) 10.2 দেখুন।

9) কো-ফ্যাক্টর যুক্ত সম্পূর্ণ উৎসেচককে হলোএনজাইম (holo enzyme) বলে।

10) 10.10 দেখুন।

10.12.2 1) 10.3 দেখুন।

2) 10.4 দেখুন।

3) 10.6 দেখুন।

4) 10.8 দেখুন।

একক 11 ☐ কার্বোহাইড্রেট বিপাক (Carbohydrate metabolism)

গঠন

11.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

11.1 কার্বোহাইড্রেটের বিপাক

11.2 কার্বোহাইড্রেট বিপাকের বিভিন্ন পথ

11.2.1 গ্লাইকোজেনেসিস

11.2.2 গ্লাইকোজেনোলাইসিস

11.2.3 গ্লাইকোলাইসিস

11.2.4 বায়বীয় অপচিতি ও TCA চক্র

11.2.5 গ্লুকোনিও জেনেসিস বা নিওগ্লুকোজেনেসিস

11.3 প্রশ্নাবলী

11.4 উত্তরাবলী

11.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য (Carbohydrate Metabolism)

দেহকোষের মধ্যে বিভিন্ন শোষিত খাদ্যকণার যে সব রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকে বিপাক বলে। এই ক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায় — উপচিতি বা অ্যানাবলিজম্ এবং অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম্।

কোষের মধ্যে গঠনমূলক রাসায়নিক পরিবর্তনকে অ্যানাবলিজম্ বলে। এই পদ্ধতিতে প্রাণিদেহে সরল জৈব পদার্থ জটিল জৈব পদার্থে পরিণত হয়। যেমন - গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন-এ পরিণত হওয়া। অপরপক্ষে কোষের মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাকে ক্যাটাবলিজম্ বলে। এই পদ্ধতিতে কোষের বিভিন্ন জটিল জৈব পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে সরল জৈব বা অজৈব পদার্থে পরিণত হয়, ফলে শক্তিমুক্ত হয় ও এক প্রকার শক্তি অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন - পেশীস্থিত গ্লাইকোজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড কিংবা CO_2, জল ও শক্তিতে (ATP) পরিণত হয়।

11.1 কার্বোহাইড্রেটের বিপাক

কার্বোহাইড্রেট আমাদের দেহে প্রধানতঃ খাদ্য থেকে আসে। তাছাড়া অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লিসেরল, প্রোপায়োনেট ও ল্যাকটেট থেকেও তৈরী হয়। এটা প্রধানতঃ শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। তা থেকে বিভিন্ন পদার্থ, যথা - গ্লাইকোলিপিড, গ্লাইকোপ্রোটিন, মিউকোপ্রোটিন, নিউক্লিওটাইড, নিউক্লিক অ্যাসিড, গ্লিসেরল, পরফাইরিন ও অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয়। কুদ্রান্তে কার্বহাইড্রেটের পরিপাকজাত গ্লুকোজ প্রধানতঃ পোর্টাল শিরার মাধ্যমে শোষিত হয়ে যকৃতে যায়। গ্লুকোজ ব্যতীত অন্যান্য মনোস্যাকারাইড যেমন, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ ইত্যাদি শোষিত হয়, কিন্তু এরা যকৃতে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।

11.2 কার্বহাইড্রেট বিপাকের বিভিন্ন পথ

কার্বোহাইড্রেটের বিভিন্ন বিপাকীয় পথগুলির (চিত্র 11A) মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ গ্লাইকোজেনেসিস, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লাইকোলাইসিস, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র, গ্লুকোনিওজেনেসিস, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে, ইউরোনিক অ্যাসিড পাথওয়ে ও অ্যামাইনো সুগার পাথওয়ে এদের মধ্যে অধিক উল্লেখযোগ্যগুলি বর্ণনা করা হল ঃ

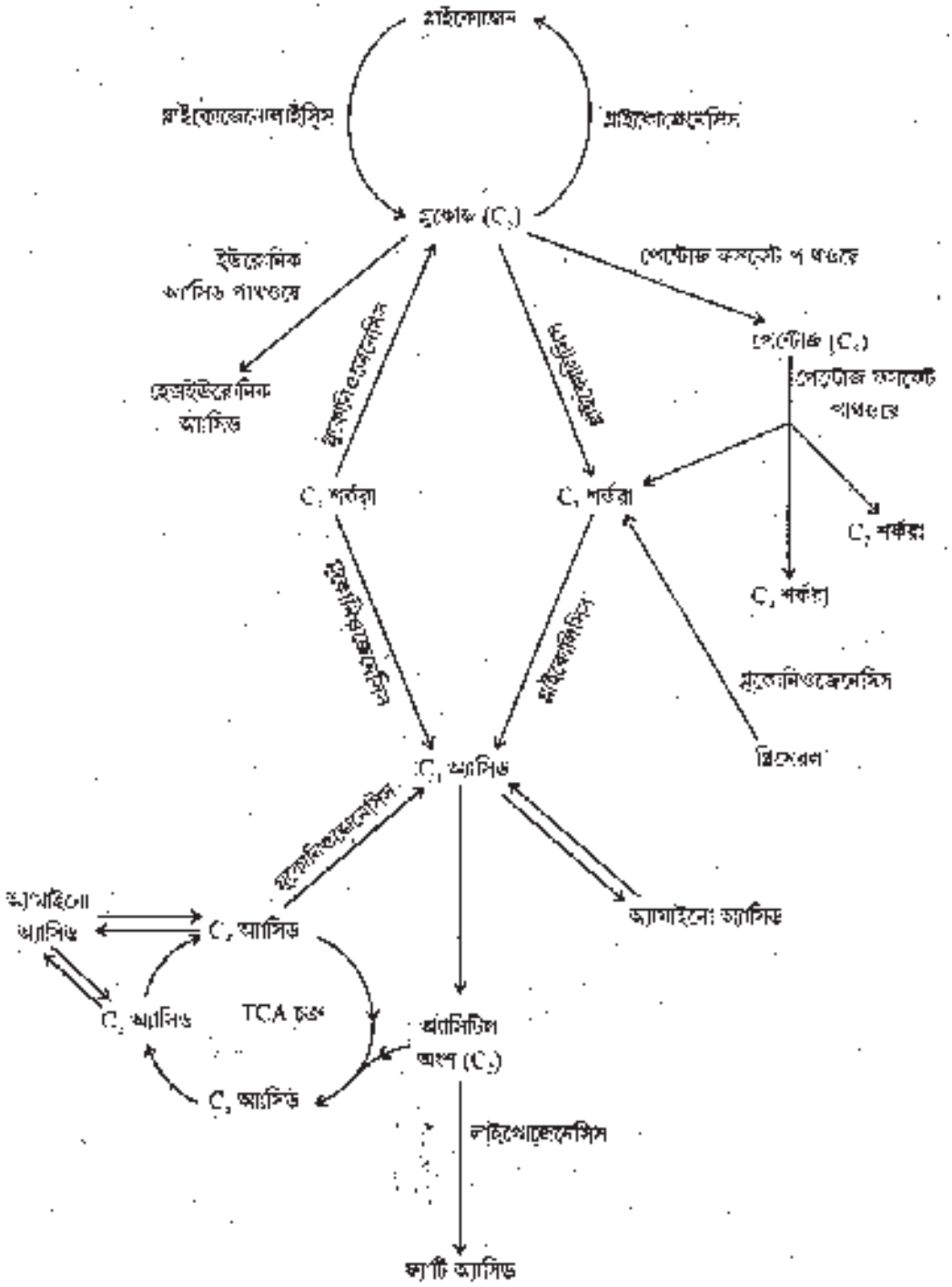

চিত্র 11A : কার্বোহাইড্রেটের বিভিন্ন বিপাকীয় পথ

2.1 গ্লাইকোজেনেসিস (Glycogenesis)

A. সংজ্ঞা

যে প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ পেশী ও যকৃতে এবং কিছু পরিমাণে অন্যান্য কলাতে (ব্যতিক্রম পরিণত RBC, মস্তিষ্ক ও বৃক্ক) গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয়, তাকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে। এটি কোষের সাইটোসলে ঘটে।

B. বিক্রিয়ার ধাপ সমূহ

এটা নীচের ছকে দেখান হল (চিত্র 11B)।

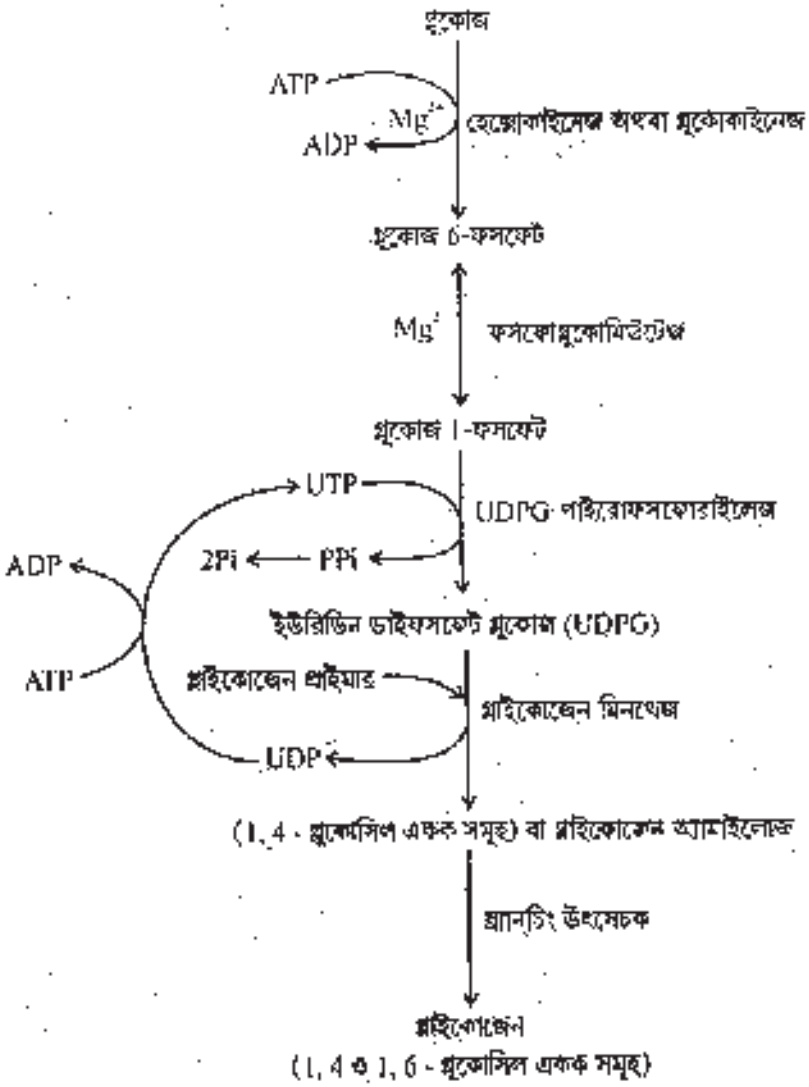

চিত্র 11B : গ্লাইকোজেনেসিসের ধাপসমূহ

C. বর্ণনা

1) ATP ও Mg^{2+} আয়নের সাহায্যে গ্লুকোজ প্রথমে ফসফেট যুক্ত হয়ে গ্লুকোজ 6-ফসফেট তৈরী করে। এই বিক্রিয়ায় পেশীকোষে হেক্সোকাইনেজ (Hexokinase) ও যকৃতে গ্লুকোকাইনেজ (Glucokinase) উৎসেচক অনুঘটকের কাজ করে।

2) এবার Mg^{2+} আয়নের উপস্থিতিতে ফসফোগ্লুকোমিউটেজ উৎসেচকের সাহায্যে আইসোমারাইজেশন হয়ে গ্লুকোজ 6-ফসফেট গ্লুকোজ 1-ফসফেটে পরিণত হয়।

উৎসেচক প্রথমে নিজের সক্রিয় স্থান থেকে একটি ফসফেট গ্রুপকে স্থানান্তরিত করে গ্লুকোজ 6- ফসফেটের প্রথম কার্বন অবস্থানে (C_1) যুক্ত করে এক অন্তর্বর্তী যৌগ তথা গ্লুকোজ 1, 6 বিসফসফেট (Glucose 1, 6-bisphosphate) তৈরী করে. এরপর উৎসেচক অন্তর্বর্তী যৌগের ষষ্ঠ কার্বন অবস্থান (C_6) থেকে ফসফেট গ্রুপকে সরিয়ে নিজের সক্রিয় স্থানে পুনরায় যোগ করে। ফলে গ্লুকোজ 1-ফসফেট তৈরী হয়।

3) এখন গ্লুকোজ 1-ফসফেট ইউরিডিন ট্রাইফসফেট (UTP/Uridine triphosphate)-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইউরিডিন ডাইফসফোগ্লুকোজ (UDPG/Uridine diphosphoglucose) তৈরী করে। এই বিক্রিয়া ইউডিপি - গ্লুকোজ পাইরোফসফোরাইলেজ (UDP-glucose pyrophosphosylase) দ্বারা অনুঘটিত হয়। ইউটিপি-এর প্রান্তীয় দুইটি ফসফেট গ্রুপ অজৈব পাইরোফসফেট (PPi) রূপে দূর হয়। পরে একটি অজৈব পাইরোফসফাটেজ PPi-কে দুইটি অজৈব ফসফেটে বিশ্লিষ্ট করে।

4) এবার গ্লাইকোজেন সিনথেজ (Glycogen synthase) উৎসেচকের প্রভাবে UDPG-এর সক্রিয় গ্লুকোজের প্রথম কার্বন (C_1) আগে থেকে অবস্থানকারী 'গ্লাইকোজেন প্রাইমার' (Glycogen primer)-এর প্রান্তীয় গ্লুকোজের চতুর্থ কার্বনের C_4 সঙ্গে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড তৈরী করে। ফলে ইউরিডিন ডাইফসফেট (UDP) নির্গত হয়।

সুতরাং এই ধাপে বিক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য অবশ্যই আগে থেকে "গ্লাইকোজেন প্রাইমার"-অণু থাকতে হবে। এই প্রাইমার অপরদিকে গ্লাইকোজেনিন (Glycogenin) নামক প্রোটিন কাঠামোর উপর তৈরী হয়। এইভাবে একের পর এক গ্লুকোজ অণু পরস্পরের সঙ্গে 1, 4-গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়।

5) যখন 1, 4-গ্লুকোসিল একক সমূহের শৃঙ্খল ন্যূনতম 11টি গ্লুকোজ অণুযুক্ত হয়, তখন একটি দ্বিতীয় উৎসেচক তথা ব্র্যানচিং উৎসেচক (Branching enzyme) শৃঙ্খলের একটি অংশকে (ন্যূনতম 6 গ্লুকোজ অণু যুক্ত) আদি শৃঙ্খলের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানের গ্লুকোজ অণুর ষষ্ঠ কার্বন স্থানে (C_6) যুক্ত করে 1, 6-গ্লাইকোসাইডিক বন্ড তৈরী করে। এইভাবে শাখা সৃষ্টি হয় (চিত্র 11C)। ক্রমশঃ আরো 1, 4-গ্লুকোসিল একক যুক্ত হয়ে শৃঙ্খলটি বৃদ্ধি পায় এবং 1, 6- গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের মাধ্যমে শাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে গ্লাইকোজেন অণু তৈরী হয়, যার মধ্যে 1, 4-গ্লাইকোসাইডিক বন্ড ও 1, 6-গ্লাইকোসাইডিক বন্ড উভয়ই পাওয়া যায়। এইভাবে সৃষ্ট গ্লাইকোজেনের আণবিক ওজন 1–4 মিলিয়ন বা বেশী হতে পারে।

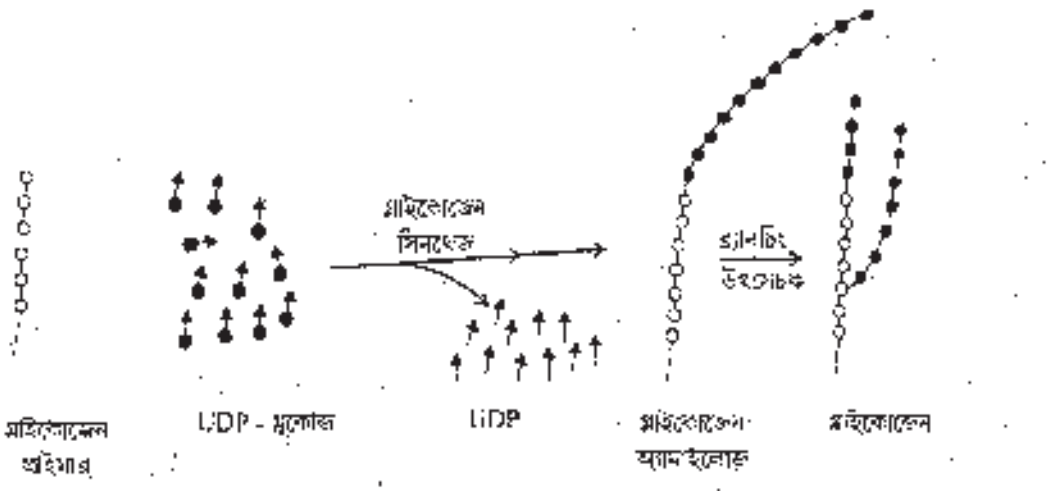

চিত্র I.I.C : গ্লাইকোজেনের শাখা সৃষ্টি

D) **শক্তির খরচ :**

1) গ্লুকোজ 6-ফসফেট তৈরীর সময় এক অণু ATP খরচ হয়।

2) UDPG তৈরীর সময় UTP দুইটি উচ্চশক্তির ফসফেট বণ্ড (~ফসফেট বণ্ড) PPi রূপে হারায়, কিন্তু পরে গ্লাইকোজেন সিনথেজের বিক্রিয়াকালে একটি ~ ফসফেট বণ্ড লাভ করে UDP-তে পরিণত হয়।

3) UDP এরপর ATP-এর কাছ থেকে একটি ~ফসফেট বণ্ড লাভ করে UTP-তে পরিণত হয়।

সুতরাং, বলা যায় গ্লাইকোজেন তৈরীতে একটি গ্লুকোজ অনুর অন্তর্ভুক্তিকালে ATP-এর দুইটি ফসফেট বণ্ড (~ফসফেট বণ্ড) খরচ হয়।

E) **তাৎপর্য :-**

গ্লাইকোজেনেসিসের ফলে যে গ্লাইকোজেন তৈরী হয়, তা খরচ না হলে প্রাণী শরীরে সঞ্চয়ী পলিস্যাকারাইড রূপে জমা থাকে এবং একারণে গ্লাইকোজেনকে "প্রাণী শ্বেতসার" (Animal starch) বলে। প্রয়োজনে দেহে গ্লুকোজ সরবরাহ করার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়া কার্বোহাইড্রেট আহারের পর বর্ধিষ্ণু রক্ত শর্করার মাত্রাকে কমিয়ে আনে। আবার, অত্যধিক পরিশ্রমকালে এটি শক্তির যোগান দেয়।

F) **নিয়ন্ত্রণ :-**

গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়া বহুলাংশে গ্লাইকোজেন সিনথেজ উৎসেচকের ফসফোরাইলেশন এবং ডিফসফোরাইলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই উৎসেচক গ্লাইকোজেনেসিসের হার-

নির্ধারণকারী ধাপের অনুঘটন করে। জানা যায় যে গ্লাইকোজেন সিনথেজ পেশীতে দুই প্রকার গঠনে পাওয়া যায় : গ্লাইকোজেন সিনথেজ b-যা কম সক্রিয় ও ফসফোরাইলেটেড গঠন এবং গ্লাইকোজেন সিনথেজ a-যা অতি সক্রিয় ও ফসফোটবিহীন গঠন।

11.2.2 গ্লাইকোজেনোলাইসিস (Glycogenolysis) :

A. সংজ্ঞা

যে প্রক্রিয়ায় প্রধানত যকৃতে গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়, তাকে গ্লাইকোজেনোলাইসিস বলে।

B) বিক্রিয়ার ধাপসমূহ

এটা নীচের ছকে দেখান হল (চিত্র 11D)।

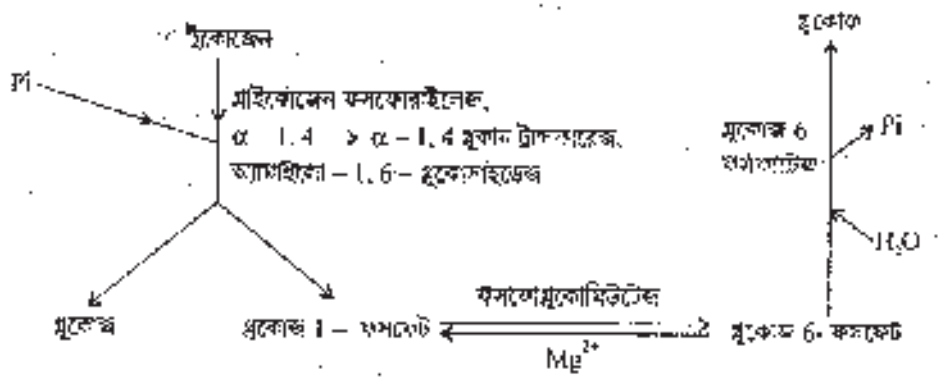

চিত্র 11D : গ্লাইকোজেনোলাইসিসের ধাপসমূহ

C) বর্ণনা

এর শেষ ধাপটি কোষের মসৃণ এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের পর্দায় ঘটে এবং বাকী ধাপগুলি সাইটোসলে ঘটে।

1) গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ উৎসেচক অজৈব ফসফেটের সাহায্যে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনের α–1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধের ফসফোরাইলোসিস ঘটায়। এতে গ্লাইকোজেনের এক বাইরশৃঙ্খলের অবিজারণ ধর্মী প্রান্ত দিক থেকে পর পর অবস্থিত গ্লুকোজ অংশগুলির অন্তবর্তী α–1, 4 বন্ধ ভেঙে যায় এবং প্রতি ধাপে এক অণু গ্লুকোজ 1–ফসফেট নির্গত হয়। এই উৎসেচক গ্লাইকোজেনের শাখা সৃষ্টি স্থানে α–1, 6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ধকে ভাঙতে পারে না। গ্লাইকোজেন অণুর শাখায় পরপর α–1, 4 বন্ধের ভাঙনে গ্লাইকোজেন ক্রমশঃ ছোট শাখায় পরিনত হয়। যখন একটি শাখায় চারটি গ্লুকোজ অংশ পড়ে থাকে, তখন সেখানে ঐ উৎসেচক তার ক্রিয়া বন্ধ করে।

2) গ্লাইকোজেন ডিব্র্যানচিং উৎসেচক (Glycogen debranching enzyme) এখন ঐ সংক্ষিপ্ত শাখার উপর ক্রিয়া করে তাকে অপসারিত করে। এই উৎসেচক অণুর দুই ভিন্ন স্থানে দুই রকম উৎসেচক ক্রিয়া দেখা যায় — α–1, 4 $\longrightarrow$ α–1, 4 গ্লুকান ট্রান্সফারেজ ক্রিয়া এবং অ্যামাইলো –1, 6-গ্লুকোসাইডেজ ক্রিয়া।

i) প্রথমে α–1, 4 $\longrightarrow$ α–1, 4 গ্লুকান ট্রান্সফারেজ ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত শাখার শেষ α –1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ড ভেঙে দেয়, ফলে মুক্ত ত্রিশর্করাকে (Trisaccharide) অন্য শাখায় নতুন α–1, 4 গ্লাইকোসাইডিক বন্ড সৃষ্টি দ্বারা যুক্ত করে। সুতরাং এখন সংক্ষিপ্ত শাখার শেষ গ্লুকোজ অণুটি কেবল শাখাসৃষ্টি স্থানে α–1, 6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা সংলগ্ন থাকে।

ii) এখন অ্যামাইলো –1, 6– গ্লুকোসাইডেজ ক্রিয়া উপরোক্ত α–1, 6 গ্লাইকোসাইডিক বন্ডকে ভেঙে শেষ গ্লুকোজকে মুক্ত করে দেয় (চিত্র 11E)।

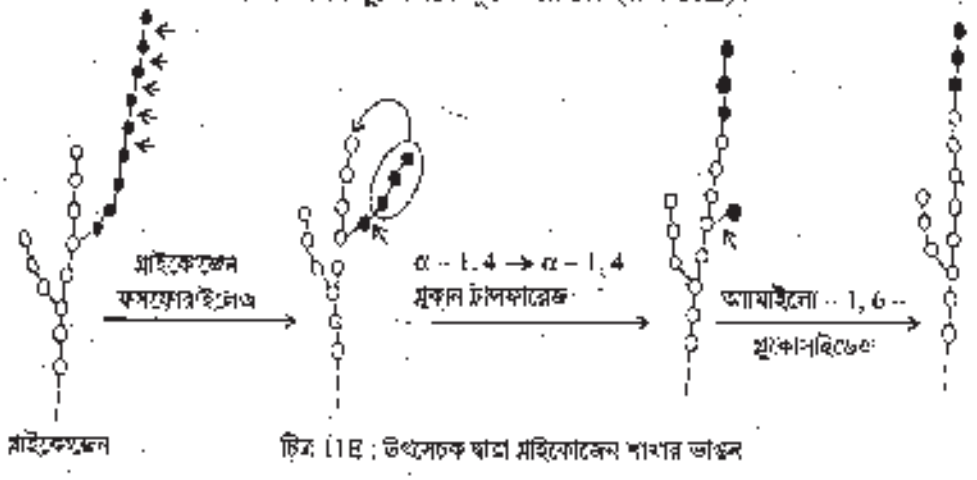

চিত্র 11E : উৎসেচক দ্বারা গ্লাইকোজেন শাখার ভাঙন

উপরে বর্ণিত বিক্রিয়া দুইটি (1, 2) গ্লাইকোজেন অণুর অন্যান্য শাখায় বারংবার চলতে থাকে। গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজের ক্রিয়ায় প্রায় 90% গ্লুকোজ অংশ গ্লুকোজ 1-ফসফেটরূপে নির্গত হয় এবং বাকী 10% ডিব্র্যানচিং উৎসেচকের ক্রিয়ায় গ্লুকোজ রূপে নির্গত হয়।

3) ফসফোগ্লুকোমিউটেজ এরপর Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে গ্লুকোজ 1-ফসফেটকে গ্লুকোজ 6-ফসফেটে পরিণত করে। এটা দুই ধাপে ঘটে। প্রথমে উৎসেচকটি নিজের একটি ফসফেট গ্রুপকে গ্লুকোজ 1-ফসফেটের C_6 স্থানে যুক্ত করে ও গ্লুকোজ 1, 6-বিসফসফেট নামক অন্তর্বর্তী যৌগ তৈরী করে। তারপর যৌগের C_1 স্থান থেকে একটি ফসফেট গ্রুপ উৎসেচকের কাছে স্থানান্তরিত হয়। ফলে গ্লুকোজ 6-ফসফেট তৈরী হয়।

4) গ্লুকোজ 6-ফসফেট প্লাজমা পর্দার মধ্য দিয়ে রক্তে আসতে পারে না। যকৃত কোষের এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের পর্দায় গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ উৎসেচক থাকে। তা গ্লুকোজ 6-ফসফেটকে ভেঙে গ্লুকোজ ও অজৈব ফসফেট তৈরী করে। এখন গ্লুকোজ সহজেই কোষ পর্দা দিয়ে রক্তে চলে আসে।

পেশীকোষে ও মস্তিষ্ক কোষে গ্লুকোজ 6-ফসফাটেজ না থাকায় ঐসব স্থানে গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঘটে না; আবার বৃক্কে ঐ উৎসেচক থাকে ঘটে, কিন্তু খুব সামান্য গ্লাইকোজেন সঞ্চিত থাকে এবং সেজন্য বৃক্ক কোষে গ্লাইকোজেনোলাইসিস খুব সামান্য ঘটে।

D) তাৎপর্য :

যকৃতের গ্লাইকোজেনোলাইসিসের ফলে গ্লুকোজ তৈরী হয়ে রক্তে মেশে এবং ফলে রক্ত শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে। তবে যদি অনাহার অবস্থা বহুদিন চলতে থাকে, তখন যকৃতের গ্লাইকোজেন খরচ হয়ে যাওয়ায় গ্লাইকোজেনোলাইসিস গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

E) নিয়ন্ত্রণ :

গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ গ্লাইকোজেনোলাইসিসের হার-নির্ধারণকারী ধাপের অনুঘটন করে। এই উৎসেচকের ফসফোরাইলেশন ও ডিফসফোরাইলেশন (Dephosphorylation) আন্তঃপরিবর্তন দ্বারা প্রক্রিয়াটি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অ্যাড্রিন্যালিন ও গ্লুকাগন হর্মোন যকৃতে ক্যাসকেড সিস্টেম (cascade system) বা জলপ্রপাত পড়ার ন্যায় এই প্রক্রিয়াটিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। যকৃতে কোষ পর্দার গ্রাহক স্থানে ঐ হর্মোন যুক্ত হয়ে অ্যাডিনিল সাইক্লেজকে (adenyl cyclase) উদ্দীপিত করে। এটা তখন ATP থেকে cAMP (cyclic adenosine monophosphate)-এর উৎপাদন ঘটায়। cAMP এখন নিষ্ক্রিয় প্রোটিন কাইনেজ b-কে সক্রিয় প্রোটিন কাইনেজ a-তে পরিণত করে। শেষোক্ত উৎসেচক ATP-এর সাহায্যে নিষ্ক্রিয় ফসফোরাইলেজ কাইনেজ b-এর ফসফেট সংযুক্তি ঘটিয়ে সক্রিয় ফসফোরাইলেজ কাইনেজ a তৈরী করে। এরপর ফসফোরাইলেজ কাইনেজ a ATP-এর সাহায্যে নিষ্ক্রিয় ফসফোরাইলেজ b-এর ফসফেট সংযুক্তি ঘটিয়ে তাকে সক্রিয় গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ a-তে পরিণত করে।

11.2.3 গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) :

গ্লাইকোলিসিস প্রায় সমস্ত জীবিত কোষে বিদ্যমান এক বিপাকীয় পদ্ধতি। এটা এক আদিম পদ্ধতি, যার উদ্ভব পরিবেশে আণবিক অক্সিজেন সৃষ্টির আগে এবং ইউক্যারিওট কোষের অক্সাণু সৃষ্টির আগে ঘটেছিল। প্রধান বিপাকীয় পদ্ধতিগুলির মধ্যে এর বিক্রিয়াসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রথম জানা যায়। এর অধিকাংশ তথ্য 1930-এর দশকে জার্মান বায়োকেমিস্ট G. Embden, O. Meyerhof এবং O. Warburg আবিষ্কার করেন। এইজন্য অনেক সময় গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতির অপর এক নাম '**Embden-Meyerhof পথ**' ব্যবহার করা হয়।

A) সংজ্ঞা :

যে বিপাকীয় পদ্ধতি দ্বারা গ্লুকোজ অথবা গ্লাইকোজেন ভাঙিয়া প্রথমে পাইরুভেট এবং পরে ল্যাকটেট অথবা ইথানল ও CO_2 উৎপন্ন হয় তাকে গ্লাইকোলিসিস বলে। এটা কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

প্রকৃতপক্ষে গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়াকে বলা যায় অপচিতি (catabolism) ও উপচিতির (anabolism) উভধর্মী, কারণ একদিকে এটা গ্লুকোজের অপচিতি ঘটিয়ে কোষকে শক্তি যোগান দেয় এবং অপরদিকে

ঙ) অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় C_3 পূর্বসূরী পদার্থ তৈরী করে উপচিতি ঘটায়

B) বিক্রিয়ার ধাপ সমূহ

এটি নীচের ছকে দেখান হল (চিত্র 11F)।

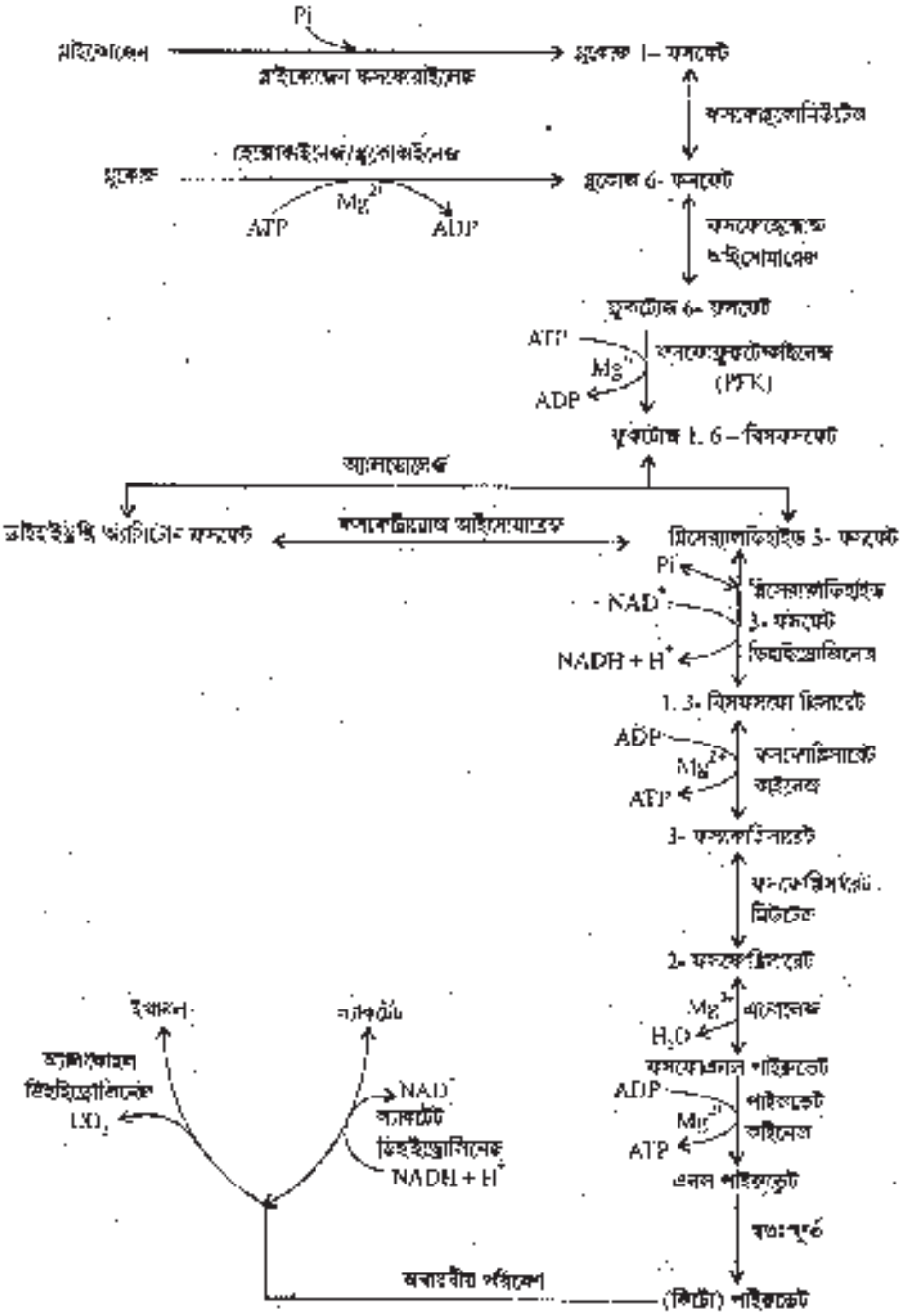

চিত্র 11F : গ্লাইকোলিসিসের ধাপসমূহ

Q) বর্ণনা : গ্লাইকোলিসিসে গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :-

গ্লুকোজ + 2ADP + 2Pi + 2NAD$^+$ ⟶ 2 পাইরুভেট +2ATP + 2NADH + 2H$^+$ + 2H_2O

এটি নিম্নোক্ত ধাপগুলির মধ্য দিয়ে ঘটে :-

1) গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লাইকোজেন ফসফেটযুক্ত হয়ে গ্লুকোজ 1-ফসফেট তৈরী করে।

2) গ্লুকোজ 1-ফসফেট এরপর গ্লুকোজ 6-ফসফেট নামক আইসোমারে (Isomer) পরিণত হয়। এখানে ফসফোগ্লুকোমিউটেজ নামক উৎসেচক ক্রিয়া করে।

অপরদিকে গ্লুকোজ ফসফেটযুক্ত হয়ে গ্লুকোজ 6-ফসফেটে পরিণত হয়। এইজন্য পেশী কোষে ও অন্যান্য কোষে হেক্সোকাইনেজ কিন্তু যকৃতকোষে গ্লুকোকাইনেজ উৎসেচক ক্রিয়া করে। উভয়ক্ষেত্রেই ATP ও Mg^{2+}-এর প্রয়োজন হয়।

3) গ্লুকোজ 6-ফসফেট ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুকটোজ 6- ফসফেটে পরিণত হয়। এখানে অ্যালডোজকিটোজ আইসোমারাইজেশন ঘটে।

4) ফ্রুকটোজ 6-ফসফেট ATP ও Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে ফসফোফ্রুকটোকাইনেজ (PFK) উৎসেচকের সাহায্যে ফ্রুকটোজ 1, 6-বিসফসফেট উৎপন্ন করে। PFK উৎসেচক গ্লাইকোলিসিসের হার-নির্ধারণকারী উৎসেচক এবং এর ক্রিয়া বস্তুতঃ অবিপরীতমুখী (irreversible)।

5) ফ্রুকটোজ 1, 6-বিসফসফেট এখন অ্যালডোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে দুইটি ট্রায়োজ ফসফেটে পরিণত হয় — একটি গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3-ফসফেট ও অপরটি ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট। অ্যালডোলেজ কয়েক প্রকারের হয়।

অ্যালডোলেজ A ও C গ্লাইকোলিসিসে ফ্রুকটোজ 1,6-বিসফসফেটকে ভেঙে দেয়, অপরদিকে অ্যালডোলেজ B গ্লুকোনিওজেনেসিসে বিপরীত মুখী বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

এই দুই ট্রায়োজ ফসফেট যৌগ আবার ফসফোট্রায়োজ আইসোমারেজ দ্বারা আন্তঃপরিবর্তিত হয়।

6) পরবর্তী পর্যায়ে গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3-ফসফেট আয়িত হয়ে 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। এখানে NAD$^+$ $NADH_2$-তে রূপান্তরিত হয়।

অপরদিকে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট অণুটি গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3-ফসফেটের মধ্য দিয়ে 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়।

7) এখন 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেট যৌগ ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ উৎসেচকের মাধ্যমে 3-ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। এখানে Mg^{2+}-আয়নের উপস্থিতিতে ATP অণু তৈরী হয়। অতএব

এই ধাপে প্রতি গ্লুকোজ অণু থেকে উৎপন্ন 2 অণু 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেট থেকে 2 অণু ATP তৈরী হয়।

8) 3-ফসফোগ্লিসারেট যৌগ ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ উৎসেচকের সাহায্যে আইসোমা- রাইজেশন হয়ে 2-ফসফোগ্লিসারেট তৈরী করে।

9) 2-ফসফোগ্লিসারেট জল বিয়োজন দ্বারা ফসফোএনল পাইরুভেট তৈরী করে। এখানে Mg^{2+}-আয়ন ও এনোলেজ উৎসেচক লাগে।

10) তখন পাইরুভেট কাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফসফোএনল পাইরুভেট যৌগ এনল পাইরুভেটে পরিণত হয়। Mg^{2+}-এর উপস্থিতিতে এই ধাপে প্রতি গ্লুকোজ অণু থেকে 2 অণু ATP তৈরী হয়।

11) এনল পাইরুভেট স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিটোপাইরুভেটে পরিণত হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত শক্তি তাপরূপে বিনষ্ট হয়।

12) এখন অবাত অবস্থায় যথা পরিণত RBC, চর্মের এপিডারমিস কোষ, রেটিনা, লেন্স, কর্ণিয়া, রেমাল মেডোলা ও অতিরিক্ত কার্যকরী শ্বেত পেশী তন্তুতে সাইটোপ্লাজমে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক (LDH) NADH-কে জারিত করে অর্থাৎ এর H^+ ও e^- পাইরুভেটে স্থানান্তরিত করে তাকে বিজারিত করে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। অথবা যেমন ইস্টে অবাত পরিবেশে পাইরুভেট অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় ইথানল ও CO_2-তে পরিণত হয়। এখানে প্রাণীকোষে NADH থেকে যে NAD^+ তৈরী হয়, তা গ্লিসেরাল্ডেহাইড 3-ফসফেট থেকে 1, 3–বিসফসফোগ্লিসারেট উৎপন্ন হওয়ার সময় কাজে লাগে।

সবাত পরিবেশে যথা লোহিত সরেখ পেশী কোষ, হৃৎপেশী ও রেনাল কর্টেক্সে সাটোপ্লাজমের NADH পুনঃজারিত হয় এবং তার বিজারণকারী পদার্থগুলিকে (H^+ ও e^-) তখন মাইটোকনড্রিয়ার NAD^+-এর কাছে এক মাইটোকনড্রিয়ার ইলেকট্রন শাটলের মাধ্যমে চালান করে। ফলে পাইরুভেট বিজারণ থেকে মুক্তি পায়। সুতরাং, সবাত পরিবেশে গ্লাইকোলিসিসের শেষ উৎপন্ন পদার্থ হল পাইরুভিক অ্যাসিড।

) ATP উৎপাদন ও খরচ (প্রতি গ্লুকোজ অণুর হিসাবে)

a) অবাত পরিবেশ (ল্যাকটিক অ্যাসিড চূড়ান্ত উৎপন্ন পদার্থ)

1). 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেট ⟶ 3- ফসফোগ্লিসারেট } ⟶ 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়

2). ফসফোএনল পাইরুভেট ⟶ এনল পাইরুভেট } ⟶ 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়।

3) গ্লুকোজ ——→ গ্লুকোজ 6-ফসফেট } ——→ 1 অণু ATP খরচ হয়।

4) ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট } ——→ 1 অণু ATP খরচ হয়।
——→ ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট }

সুতরাং, সমগ্র পরিবেশে গ্লাইকোলিসিস এ 1 টি গ্লুকোজ অণুতে নীট শক্তি লাভ হয় 2 অণু ATP।

b. অক্সিজেন উপস্থিতি (সুস্থাস উপযোগী পদার্থ পাইরুভিক অ্যাসিড বা মাইটোকনড্রিয়ায় ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে।

1) গ্লিসেরালডিহাইড 3-ফসফেট } 2 অণু NADH যা মাইটোকনড্রিয়ায় ইলেকট্রন
——→ 1, 3-ডাইফসফোগ্লিসারেট } ট্রান্সপোর্ট শৃঙ্খলের মাধ্যমে 6 অণু ATP তৈরী করে।

2) ফসফোইনল পাইরুভেট } ——→ 2 অণু ATP উৎপন্ন হয়
——→ ইনল পাইরুভেট

3) গ্লুকোজ ——→ গ্লুকোজ 6-ফসফেট ——→ 1 অণু ATP খরচ হয়।

4) ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট } ——→ 1 অণু ATP খরচ হয়।
——→ ফ্রুক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট }

সুতরাং, বায়ু অবস্থায় গ্লাইকোলিসিসে প্রতি গ্লুকোজ অণুতে মোট নীট শক্তি লাভ হয় 8 অণু ATP।

E) নিয়ন্ত্রণ :

ফসফোফ্রুক্টো কাইনেজ (PFK) হল গ্লাইকোলিসিসের প্রধান হার-নির্ধারণকারী উৎসেচক। বিশ্লেষণ পেশীতে ATP-এর শারীরবৃত্তীয় মাত্রা (≈ 5mM) PFK-এর সাবস্ট্রেটের (ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট) প্রতি তার নির্ধণ কমিয়ে দেয়। ATP ঘনত্বের 20% হ্রাস হলে গ্লাইকোলিসিসের হার দশগুণ বৃদ্ধি পায়। এটা ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজের সক্রিয়তা 50% বৃদ্ধি পায়।

F) সুরাসার প্রক্রিয়া (Fermentation)

এটি হল অক্সিজেন পরিবেশে অর্থাৎ অবায়বিক অক্সিজেন ব্যবহার না করে বিপাকীয় শক্তি তথা উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ফসফেট গ্রুপযুক্ত ATP অণু তৈরীর পদ্ধতি। এতে জৈব বস্তুর জারণ ঘটে কিন্তু জারণকারক (ইলেকট্রন গ্রহণকারী) হিসেবে, যা আণবিক অক্সিজেনের পরিবর্তে অন্যান্য জৈব বস্তু ব্যবহৃত হয়। এই সুরাসান প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত বস্তুর ওপর ঘটে তারা প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় — যেমন গ্লুকোজ, ফ্রাক্টোজ, সুক্রোজ, গ্লিসারোল, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ ইত্যাদি (বিভিন্ন প্রজাতি অনুসারে)। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। সুরাসান প্রক্রিয়ায় বহুসংখ্যক অক্সিজেন যুক্ত না এবং সেজন্য এর কোন উৎপন্ন পদার্থের পুনরায় সুরাসান জারণ সম্ভব। বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান পদার্থ উৎপন্ন হয় — প্রাণিকলা থেকে **Lactobacillus**

ব্যাকটেরিয়াতে ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়াতে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং ইস্টে ইথানল ও বিস্ব পরিমাণ গ্লিসেরল।

11.2.4 বায়বীয় অপচিতি ও TCA চক্র (Aerobic catabolism and TCA cycle)

কার্বোহাইড্রেটের বায়বীয় অপচিতিতে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র (TCA চক্র) কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এই চক্রের আবিষ্কারে জেন্ট-জিওরগী (szent-Gyorgyi) ও ক্রেবস (Krebs) নামক দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তবে বিজ্ঞানী ক্রেবস (1937) TCA চক্রের প্রস্তাব দেন। এইজন্য একে ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) অথবা সাইট্রেট চক্র (citrate cycle) বলে।

বায়বীয় অবস্থায় গ্লুকোজের অপচিতিতে গ্লাইকোলিসিস হল প্রারম্ভিক দশা। অন্যান্য তিনটি অংশ হল TCA চক্র যা পাইরুভেটের জারণ ঘটায়, তারপর ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র যা আণবিক অক্সিজেনের সাহায্যে কোএনজাইম অণুর ($NADH$, $FADH_2$) পুনর্জারণ ঘটায় এবং জারণমূলক ফসফোরাইলেশন (oxidative phosphorylation) যেখানে ADP অণু ATP-তে পরিণত হয়।

TCA চক্র শুরুর আগে গ্লাইকোলিসিস থেকে সরাসরি প্রাপ্ত পাইরুভেট অথবা ল্যাকটেট থেকে বায়বীয় পরিবেশে প্রাপ্ত পাইরুভেট প্রথমে জারিত ও ডিকার্বক্সিলেটেড হয়ে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A (Acetyle-CoA) তৈরী করে। তারপর অ্যাসিটাইল-কো A TCA চক্রের মাধ্যমে জারিত হয়।

A) **অ্যাসিটাইল-কো-A (Acetyl-CoA) উৎপাদন :**

পাইরুভেট সাইটোসলে উৎপন্ন হয়। অন্তঃমাইটোকনড্রিয়া পর্দায় অবস্থিত নির্দিষ্ট পাইরুভেট বাহক পাইরুভেটকে H^+ সহ সাইটোসল থেকে বহন করে মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে নিয়ে আসে। এখানে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্স (Pyruvate dehydrogenase complex) নামক তিনটি এনজাইমের এক কমপ্লেক্স দ্বারা পাইরুভেটের অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন (Oxidative decarboxylation) ঘটে এবং ফলে অ্যাসিটাইল-কোA (সক্রিয় অ্যাসিটেট) উৎপন্ন হয়। এই কমপ্লেক্সের তিনটি উৎসেচক হল : পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেজ, ডাইহাইড্রোলাইপোইল ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ (Dihydrolipoyl transacetylase) ও ডাইহাইড্রোলাইপোইল ডিহাইড্রোজিনেজ। এখানে প্রয়োজনীয় পাঁচটি কোএনজাইম হল : থায়ামিন পাইরোফসফেট (TPP) লাইপোয়িক অ্যাসিড (Lipoic acid) ও CoASH, FAD ও NAD^+।

অ্যাসিটাইল-কোA উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ বিক্রিয়ার রূপটি নিম্নরূপ :-

পাইরুভেট + কোA + NAD^+ $\longrightarrow$ অ্যাসিটাইল-কোA + NADH + CO_2.

B) **TCA চক্র**

TCA চক্র হল মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে ঘটিত পরপর ধারাবাহিক কতকগুলি বিক্রিয়ার এক চক্র যেখানে অ্যাসিটাইল-কোA-এর বিপাক ঘটে। এই চক্র কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও প্রোটিনের জারণের সর্বশেষ সাধারণ পথ, কারণ গ্লুকোজ, ফ্যাটি অ্যাসিড ও অনেক অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাকে অ্যাসিটাইল-কোA তৈরী হয়। আবার, এই চক্রের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও অ্যামাইনো অ্যাসিডের জারণ থেকে নির্গত মুক্ত শক্তি পাওয়া যায়। অ্যাসিটাইল-কোA-এর জারণকালে বিজারণধর্মী পদার্থ যথা হাইড্রোজেন অথবা ইলেকট্রন তৈরী হয়, যারা ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে প্রবেশ করে অক্সিডেটিভ

ফসফোরাইলেশন পদ্ধতিতে ATP উৎপন্ন করে। TCA চক্রের উৎসেচকগুলি মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে মুক্তভাবে অথবা তার অন্তঃপর্দার ভিতরতলে যুক্ত থাকে। এই চক্রের অপর এক তাৎপর্য হল এটি অপচিতি ছাড়া উপচিতিতেও ভূমিকা নেয়। এটি গ্লুকোনিওজেনেসিস এবং ফ্যাটি অ্যাসিড অথবা অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষেও পদার্থ যোগান দেওয়ার উৎস রূপে কাজ করে।

a) ধাপ :

এই চক্রের ধাপগুলি নীচের ছকে দেখান হল (চিত্র 11G)।

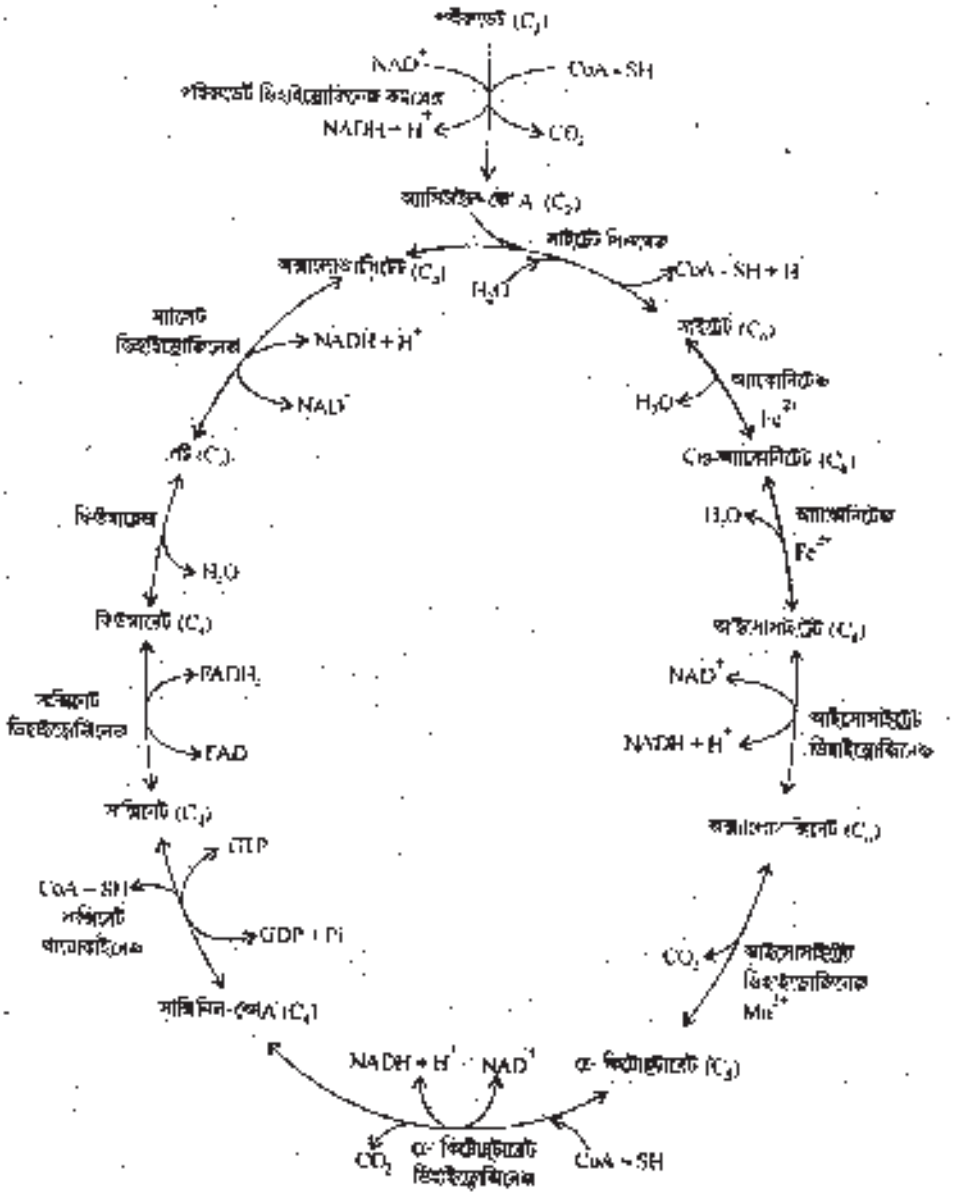

চিত্র 11G : TCA চক্রের ধাপসমূহ

b) বর্ণনা ঃ

1) প্রথমে সাইট্রেট সিনথেজ উৎসেচকের প্রভাবে অ্যাসিটাইল-কো.A (C_2) এবং অক্সালো অ্যাসিটেটের (C_4) মিলন ঘটে সাইট্রেট (citrate) (C_6) উৎপন্ন হয়। এখানে অ্যাসিটাইল-কো.A-এর মিথাইল কার্বন এবং অক্সালো অ্যাসিটেটের কার্বনিল কার্বনের মধ্যে বন্ধ তৈরী হয়। তারপর কো.A-এর থায়োএস্টার বন্ধের জলবিশ্লেষণ ঘটে এবং প্রচুর মুক্ত শক্তি তাপরূপে নির্গত হয়। ফলে সাইট্রেটের সাথে মুক্ত কোএনজাইমA উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া বিপরীতমুখী নয়।

2) অ্যাকোনিটেজ উৎসেচকের সাহায্যে সাইট্রেট আর আইসোমার আইসোসাইট্রেটে পরিণত হয়। এই উৎসেচকে Fe^{2+} থাকে। বিক্রিয়াটি বিপরীতমুখী এবং দুই ধাপে ঘটে ঃ প্রথমে সাইট্রেট জলবিয়োজন দ্বারা cis-অ্যাকোনিটেট তৈরী করে এবং তারপর জলযুক্ত হয়ে আইসোসাইট্রেট তৈরী করে। অ্যাকোনিটেজ cis-trans সুনির্দিষ্টতা দেখায় — এটা কেবল cis-অ্যাকোনিটেটের উপর ক্রিয়া করে এবং trans-অ্যাকোনিটেট দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

3) এখন আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক চার পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের ($\alpha_2 \beta\gamma$) উৎসেচক আইসোসাইট্রেটকে (C_6) α-কিটোগ্লুটারেটে পরিণত করে। এটা দুই ধাপে ঘটে। প্রথমে এটা NAD^+-এর সাহায্যে আইসোসাইট্রেটকে অক্সালোসাক্সিনেটে জারিত করে এবং NADH তৈরী হয়। এটাই TCA-এর চক্রের প্রথম জারণধর্মী ধাপ। এরপর উৎসেচকটি Mn^{2+}-এর উপস্থিতিতে অক্সালোসাক্সিনেটের β-ডিকার্বক্সিলেশন ঘটিয়ে α-কিটোগ্লুটারেট তৈরী করে এবং সাথে CO_2 মুক্ত হয়।

এখানে অন্তর্বর্তী পদার্থ অক্সালোসাক্সিনেট উৎসেচকের সঙ্গে যুক্ত থেকে যায়।

4) এখন α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক α-কিটোগ্লুটারেটের অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন ঘটিয়ে সাক্সিনিল-কো.A (Succinyl-CoA) তৈরী করে। এখানে NADH তৈরী হয় ও CO_2 মুক্ত হয়। এই উৎসেচকও তিন উৎসেচকের কমপ্লেক্স এবং এর ক্রিয়াও পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্সের ন্যায়। এখানেও একই ধরনের কোফ্যাক্টর যথা - থায়ামিন ডাইফসফেট, লাইপোয়িক অ্যাসিড, CoASH, FAD ও NAD^+ দরকার হয়।

5) সাক্সিনেট থায়োকাইনেজ (সাক্সিনিল-কো.A সিনথেটেজ) নামক দুইটি ভিন্ন পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের উৎসেচক ($\alpha\beta$) সাক্সিনিল-কো.A-এর উচ্চ শক্তি থায়োএস্টার বন্ধের ভাঙন ঘটিয়ে সাক্সিনেট ও কোএনজাইমA তৈরী করে এবং GTP উৎপাদন ঘটায়।

6) সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক দুইটি ভিন্ন পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের উৎসেচক ($\alpha\beta$) সাক্সিনেটের ডিহাইড্রোজিনেশন ঘটিয়ে ফিউমারেট তৈরী করে। এই উৎসেচক প্রসথেটিক গ্রুপরূপে FAD বহন করে, যা H গ্রাহক রূপে কাজ করে $FADH_2$ তৈরী করে। এই উৎসেচক cis-trans নির্দিষ্টতা দেখায় এবং কেবল ফিউমারেটের trans আইসোমার তৈরী করে।

7) ফিউমারেজ উৎসেচকের প্রভাবে ফিউমারেট জলযুক্ত হয়ে L-ম্যালেট তৈরী করে। এই উৎসেচকও কেবল trans-ফিউমারেটের উপর কাজ করে।

৪) মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সের ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ ম্যালেটকে জারিত করে অক্সালোঅ্যাসিটেটে পরিণত করে। এখানে NAD^+ ইলেকট্রন গ্রাহকরূপে কাজ করে NADH তৈরী করে। এই ধাপ TCA চক্রের চতুর্থ জারণ ধর্মী ধাপ।

অক্সালোঅ্যাসিটেট সৃষ্টির মধ্য দিয়ে TCA চক্রের একটি ধাপ সম্পূর্ণ হয়। কার্বন রেডিওআইসোটোপ দ্বারা অক্সালোঅ্যাসিটেটকে চিহ্নিত করে দেখা যায় যে এই চক্রে উদ্ভূত CO_2 সাইট্রেটের অক্সালোঅ্যাসিটেট প্রাপ্ত অংশ থেকে আসে এবং অ্যাসিটেট প্রাপ্ত অংশ থেকে আসে না।

TCA চক্রের সর্বোপরি বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ-

অ্যাসিটাইল-কোA + $3NAD^+$ + FAD + $2H_2O$ + GDP + Pi
$\longrightarrow 2CO_2$ + 3 NADH + $3H^+$ + $FADH_2$ + GTP + কোA

c) **শক্তি উৎপাদন ঃ**

প্রতি পাইরুভেট অণুর সম্পূর্ণ বিপাকে মোট 15টি উচ্চ শক্তির ফসফেট বন্ড [~ Ⓟ] তৈরী হয়। এর মধ্যে 12টি ~ Ⓟ বেশস চক্রে উৎপন্ন হয়। এটা নীচের ছকে দেখান হল ঃ

বিক্রিয়া	~ Ⓟ উৎপাদন পদ্ধতি	সৃষ্ট ~ Ⓟ এর সংখ্যা
1) পাইরুভেট ⟶ অ্যাসিটাইল-কোA	NADH-এর শ্বসন শৃঙ্খল জারণ	3 ATP
2) ক্রেবস চক্র		
i) আইসোসাইট্রেট ⟶ অক্সালোসাক্সিনেট	NADH-এর শ্বসন শৃঙ্খল জারণ	3 ATP
ii) α-কিটোগ্লুটারেট ⟶ সাক্সিনিল-কোA	NADH-এর শ্বসন শৃঙ্খল জারণ	3 ATP
iii) সাক্সিনিল-কোA ⟶ সাক্সিনেট	সাবস্ট্রেট পর্যায়ে জারণ	1 GTP
iv) সাক্সিনেট ⟶ ডিউমারেট	FADH-এর শ্বসন শৃঙ্খল জারণ	2 ATP
v) ম্যালেট ⟶ অক্সালো অ্যাসিটেট	NADH-এর শ্বসন শৃঙ্খল জারণ	3 ATP
	মোট	= 15

প্রতি NADH অণু মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দায় ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রে তার বিজারণ ধর্মী পদার্থের (H^+ ও e^-) স্থানান্তরকালে 3 অণু ATP তৈরী করে। কিন্তু প্রতি $FADH_2$ থেকে এরূপে 2 অণু ATP তৈরী হয়।

d) নিয়ন্ত্রণ

পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্স (PDH) প্রধানতঃ তার পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ উপাদানের বিপরীতধর্মী ফসফোরাইলেশন ও ডিফসফোরাইলেশন পরিবর্তনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ উপাদান ATP ও মাইটোকনড্রিয়ার পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কাইনেজ (PDH কাইনেজ) উৎসেচকের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সেরিন অবশেষের ফসফোরাইলেশন দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয় এবং মাইটোকনড্রিয়ার পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ ফসফাটেজ (PDH ফসফাটেজ) উৎসেচকের সাহায্যে এর ফসফোসেরিন অংশের ডিফসফোরাইলেশন দ্বারা পুনঃসক্রিয় ঘটে। ATP/ADP অনুপাত, NADH/NAD$^+$ অনুপাত, অ্যাসিটাইল-কোA ঘনত্ব অথবা সাইক্লিক AMP (cAMP) বৃদ্ধি কোষে PDH কাইনেজকে সক্রিয় করে ফসফোরাইলেশন বৃদ্ধি করে এবং PDH-এর নিষ্ক্রিয়তা ঘটায়।

ক্রেবসচক্রে α কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ, সাইট্রেট সিনথেজ এবং আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক হার-নির্ধারণকারী ধাপরূপে কাজ করে।

11.2.5 গ্লুকোনিওজেনেসিস (Gluconengenesis) বা নিওগ্লুকোজেনেসিস

A) সংজ্ঞা

প্রধানত যকৃত ও বৃক্কে, অকার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ সমূহ যথা, ল্যাকটেট, পাইরুভেট, গ্লিসেরল, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোপায়োনেট (রোমন্থক প্রাণীতে) থেকে যে প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ অথবা গ্লাইকোজেন সংশ্লেষিত হয়, তাকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে।

এটা আংশিকভাবে মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে এবং আংশিকভাবে কোষের সাইটোসলে ঘটে, কিন্তু সর্বশেষ বিক্রিয়ার ধাপটি ER পর্দায় হয়।

B) উৎস

গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য ল্যাকটেট ও পাইরুভেট হল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎস। পরবর্তী উৎস হল গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড যথা, গ্লাইসিন, অ্যালানিন ইত্যাদি। গ্লিসেরল থেকে অল্প পরিমাণে গ্লুকোজ তৈরী হয়। রোমন্থক স্তন্যপায়ীর পাকস্থলীতে সেলুলোজ ফার্মেন্টেশনের ফলে উদ্ভূত প্রোপায়োনেট গ্লুকোজ তৈরীর এক বড় উৎস। উপবাসকালে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রধানতঃ অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে হয়।

C) উৎসেচক ও স্থান

গ্লুকোনিওজেনেসিস গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ার বিপরীতভাবে ঘটে। গ্লাইকোলিসিসের কিছু ধাপ বিপরীতমুখী এবং সেখানে যে উৎসেচকগুলি গ্লাইকোলিসিসের অগ্রমুখী বিক্রিয়াগুলিতে অনুঘটন করে, এরাই পুনরায় গ্লুকোনিওজেনেসিসের বিপরীতমুখী ধাপগুলিতে অনুঘটকের ভূমিকা নেয়। কিন্তু গ্লাইকোলিসিসের তিনটি ধাপ বিপরীতমুখী নয়, সেইজন্য এই ধাপগুলি গ্লুকোনিওজেনেসিসের সময় বাইপাস হয়ে অন্যপথে ঘটে। গ্লুকোনিওজেনেসিসের অবিপরীতমুখী ধাপের উৎসেচকগুলি হল ঃ পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ যা মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে থাকে, ফসফোএনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ (PEPCK) যা মানুষে মাইটোকনড্রিয়া ও সাইটোসল উভয় স্থানে থাকে, ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফাটেজ যা কেবল সাইটোসলে থাকে এবং গ্লুকোজ 6–ফসফাটেজ যা মসৃণ ER পর্দায় থাকে।

এইজন্য গ্লুকোনিওজেনেসিস আংশিক হয় মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে, আংশিক হয় সাইটোসলে এবং শেষ ধাপটি হয় মসৃণ ER পর্দায়।

D) ল্যাকটেট ও পাইরুভেট থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস

a) ধাপ

এর ধাপগুলি নীচের ছকে দেওয়া হল (চিত্র 11H)।

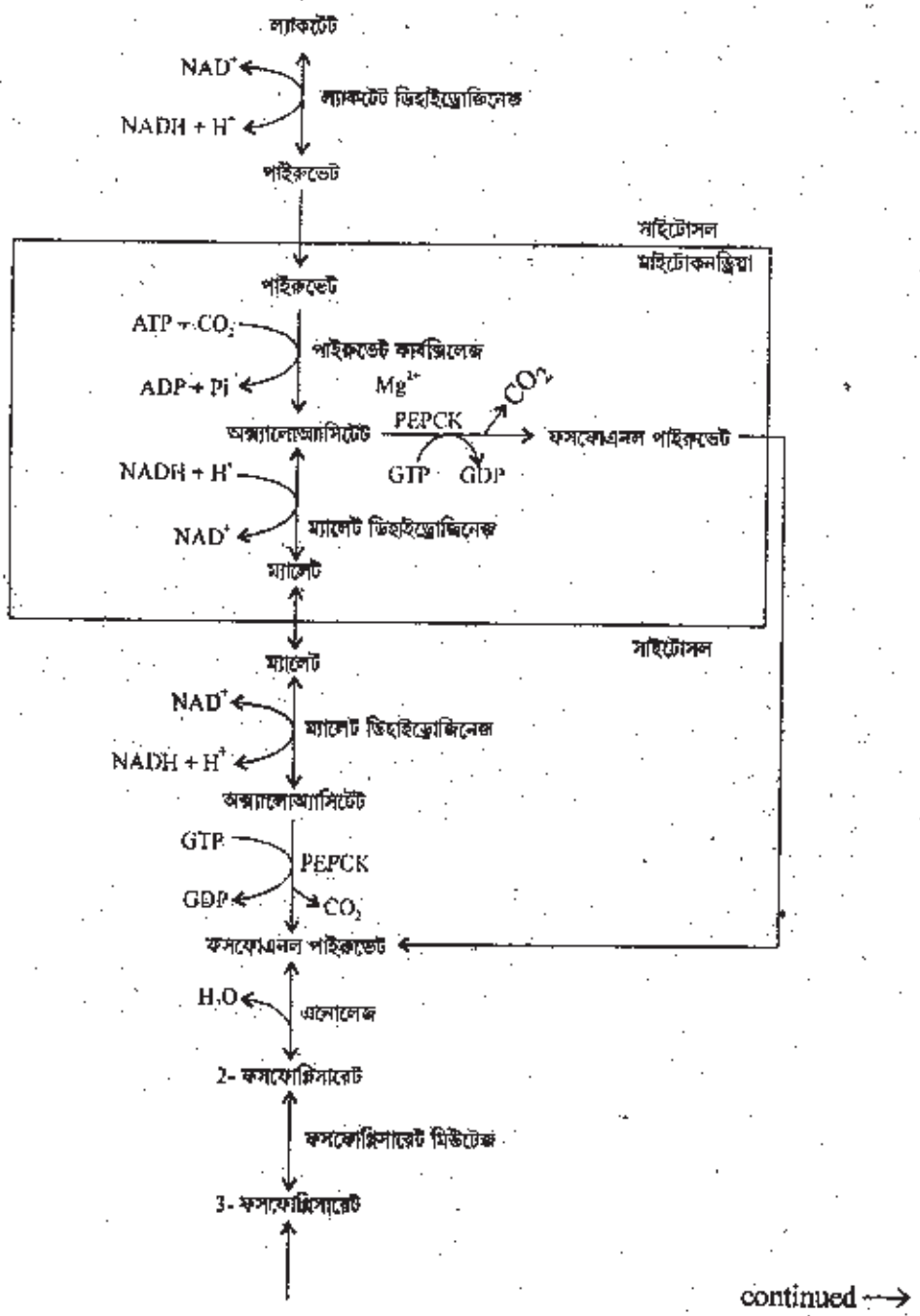

continued ⟶

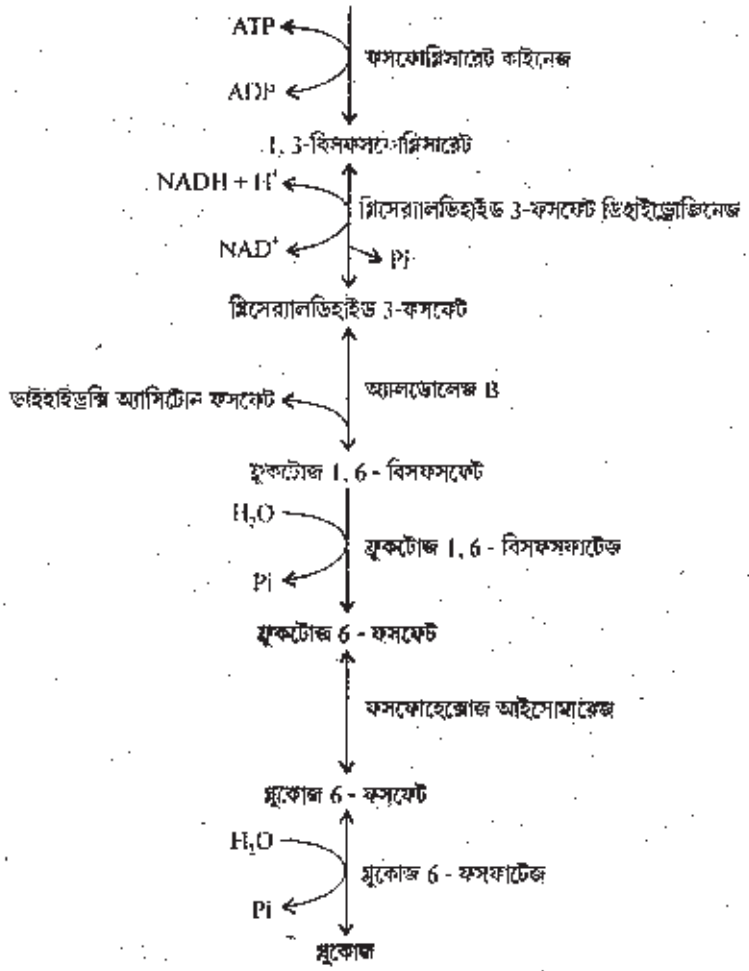

চিত্র 11H : ল্যাকটেট থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিসের ধাপসমূহ

b) বর্ণনা

1) গ্লাইকোলিসিসে উৎপন্ন ল্যাকটেট সাইটোসলের মধ্যে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ (LDH) ও NAD^+-এর সহযোগে পাইরুভেট পুনঃজারিত হয়। এখানে NAD^+ বিজারিত হয়ে NADH তৈরী করে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃপর্দায় অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট পাইরুভেট বাহক পাইরুভেট ও সাথে H^+-কে বহন করে সাইটোসল থেকে মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে নিয়ে যায়।

2) ম্যাট্রিক্সে পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ উৎসেচক পাইরুভেট ও CO_2কে ATP-এর উপস্থিতিতে ঘনীভূত করে অক্সালো অ্যাসিটেট, ADP ও Pi তৈরী করে।

3) এরপর ম্যাট্রিক্সে ফসফোএনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ (PEPCK) উৎসেচক অক্সালো অ্যাসিটেট থেকে CO_2 দূর করে ও তারপর GTP থেকে ফসফেট গ্রুপ যুক্ত করে ফসফোএনল পাইরুভেট (PEP) ও (GDP) তৈরী করে। PEP মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দার প্রোটিনের সাহায্যে সাইটোসলে আসে।

কিছু পরিমাণে অক্সালো অ্যাসিটেট NADH ও ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজের সাহায্যে ম্যালেটে বিজারিত হয়। এই ম্যালেট অন্তঃপর্দার এক ডাইকার্বক্সিলেট বাহকের সাহায্যে মাইটোকনড্রিয়া থেকে সাইটোসলে বাহিত হয়।

4) সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক ম্যালেটকে পুনঃজারিত করে অক্সালোঅ্যাসিটেট তৈরী করে। NAD^+ এখানে NADH-এ পরিণত হয়।

5) সাইটোসলের PEPCK উৎসেচক আগের মতই এই অক্সালো অ্যাসিটেটকে GTP-এর সাহায্যে PEP-তে পরিণত করে। ফলে GDP ও CO_2 তৈরী হয়।

6) এরপর গ্লাইকোলিসিসের উৎসেচকগুলি পরবর্তী পাঁচটি ধাপের বিক্রিয়া দ্বারা PEP-কে ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফেটে পরিণত করে ঃ-

i) এনোলেজ PEP-কে জলযুক্ত করে 2–ফসফোগ্লিসারেট তৈরী করে।

ii) ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ 2–ফসফোগ্লিসারেটকে 3–ফসফোগ্লিসারেটে আইসোমারাইজ করে।

iii) ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ 3–ফসফোগ্লিসারেটকে ATP-এর উপস্থিতিতে 1, 3–বিসফসফোগ্লিসারেটে পরিণত করে। এখানে ATP খরচ হয়।

iv) গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3–ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ 1, 3–বিসফসফোগ্লিসারেটকে NADH-এর সাহায্যে গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3–ফসফেটে বিজারিত করে। এখানে NAD^+ ও Pi তৈরী হয়।

v) এখন অ্যালডোলেজ B নামক উৎসেচক গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3–ফসফেট ও ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটকে ঘনীভূত করে ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফেট তৈরী করে। এই অ্যালডোলেজ B যকৃতে প্রধানতঃ থাকে।

7) ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফাটেজ উৎসেচক ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফেটের জলযুক্তি ঘটিয়ে ফ্রুকটোজ 1, 6–ফসফেট ও Pi তৈরী করে। এই উৎসেচক যকৃত ও বৃক্কের সাইটোসলে প্রচুর থাকে, সরেখ পেশীতে অল্প থাকে কিন্তু হৃৎপেশী ও অরেখ পেশীতে অনুপস্থিত।

8) ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ ফ্রুকটোজ 6–ফসফেটকে তার আইসোমার গ্লুকোজ 6–ফসফেটে পরিণত করে।

9) গ্লুকোজ 6–ফসফাটেজ (যকৃতে থাকে) গ্লুকোজ 6–ফসফেটের জলবিশ্লেষণ ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও Pi তৈরী করে। এই বিক্রিয়াটি এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের (ER) পর্দায় ঘটে।

E) গ্লিসেরল থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস

a) ধাপ ঃ এর ধাপগুলি নীচের ছকে দেওয়া হল (চিত্র 11I) ঃ-

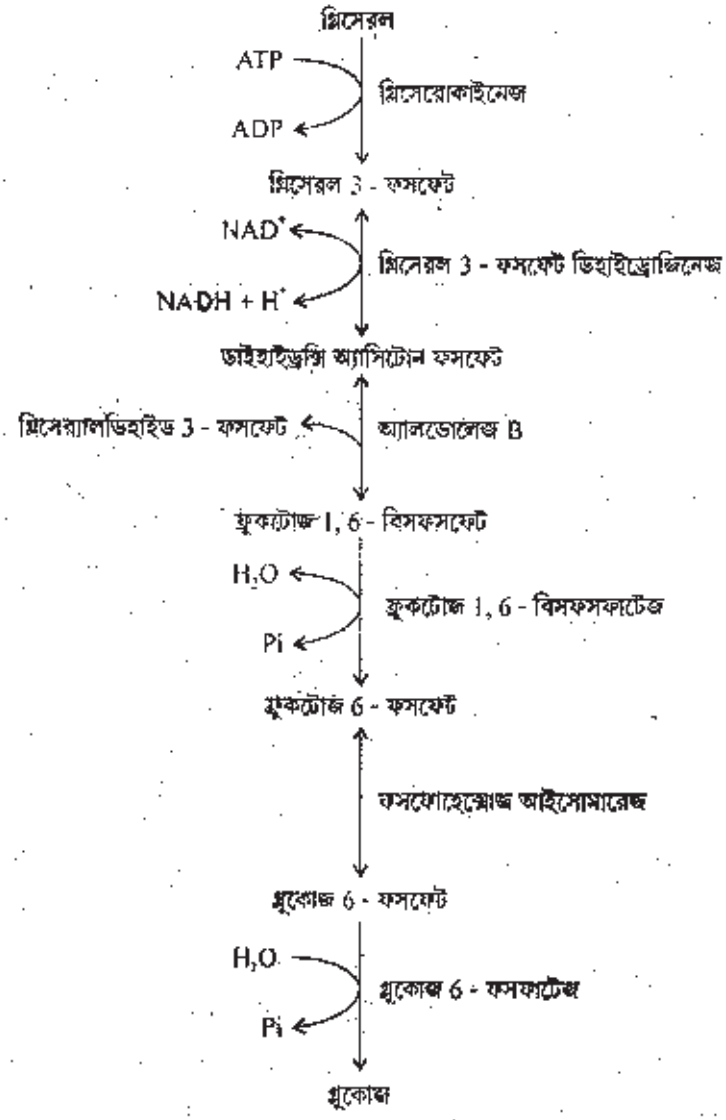

চিত্র 11.1 : গ্লিসেরল থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিসের ধাপসমূহ

b) বর্ণনা

1) গ্লিসেরোকাইনেজ উৎসেচক ATP-এর সাহায্যে গ্লিসেরলের ফসফেট সংযুক্তি ঘটিয়ে গ্লিসেরল 3–ফসফেট উৎপন্ন করে। এটা যকৃত ও বৃক্কের সাইটোসলে ঘটে।

2) সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত গ্লিসেরল 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ গ্লিসেরল 3-ফসফেটকে জারিত করে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট তৈরী করে। এখানে NAD^+ ইলেকট্রন গ্রহণ করে NADH-এ পরিণত হয়।

3) এরপর অ্যালডোলেজ B উৎসেচক ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট ও গ্লিসেরাল্ডিহাইড 3–ফসফেটকে ঘনীভূত করে ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফেট তৈরী করে।

4) ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফাটেজ উৎসেচক ফ্রুকটোজ 1, 6—বিসফসফেট-এর জল বিশ্লেষণ ঘটিয়ে ফ্রুকটোজ 6–ফসফেট ও Pi তৈরী করে। এই উৎসেচকটি যকৃত ও বৃক্কের সাইটোসলে প্রচুর থাকে, সরেখ পেশীতে অল্প পরিমাণে থাকে কিন্তু হৃৎপেশীতে ও মসৃণ পেশীতে অনুপস্থিত।

5) ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ উৎসেচক ফ্রুকটোজ 6–ফসফেটকে তার আইসোমার গ্লুকোজ 6–ফসফেটে পরিণত করে।

6) গ্লুকোজ 6–ফসফাটেজ (যকৃত থাকে) গ্লুকোজ 6–ফসফেটের জলবিশ্লেষণ ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও Pi তৈরী করে। এই বিক্রিয়াটি ER পর্দায় ঘটে।

F) অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস

a) ধাপসমূহ

এটি নীচের ছকে দেওয়া হল (চিত্র 11J) ঃ-

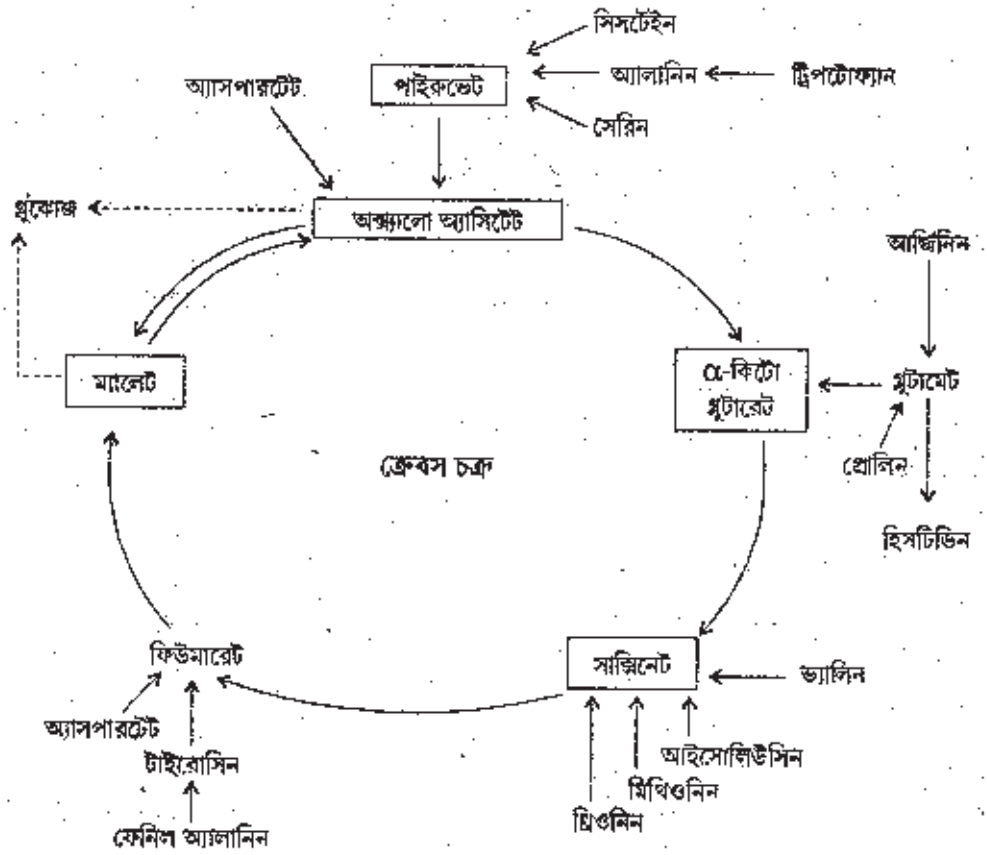

চিত্র 11J ঃ অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিসের ছক

b) **বর্ণনা**

অধিকাংশ অ্যামাইনো অ্যাসিড (ব্যতিক্রম লিউসিন ও লাইসিন) তাদের অ্যামাইনো গ্রুপ ($-NH_2$) হারিয়ে গ্লুকোনিওজেনিক অন্তর্বর্তী যৌগ গঠন করে, যেমন — গ্লুটামেট, আর্জিনিন, প্রোলিন ও হিসটিডিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে α-কিটোগ্লুটারেট, ভ্যালিন, মিথিওনিন, আইসোলিউসিন ও থ্রিওনিন থেকে সাক্সিনেট, অ্যাসপারটেট ও টাইরোসিন থেকে ফিউমারেট। এই অন্তর্বর্তীযৌগগুলি মাইটোকনড্রিয়াতে ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে ম্যালেটে পরিণত হয়। আবার, অ্যালানিন, সিসটেইন, সেরিন ও ট্রিপটোফ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে যে পাইরুভেট তৈরী হয়, তা পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ উৎসেচকের সাহায্যে CO_2-যুক্ত হয়ে অক্সালো অ্যাসিটেটে পরিণত হয়। অক্সালো অ্যাসিটেট আবার অ্যাসপারটেট থেকেও তৈরী হয়। এরপর মাইটোকনড্রিয়াতে অক্সালো অ্যাসিটেট হয় ম্যালেটে অথবা ফসফোএনল পাইরুভেটে (PEP) পরিণত হয়। এখন এইগুলি সাইটোসলে বাহিত হয় এবং পরপর বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

G) **গ্লুকোনিওজেনেসিসের তাৎপর্য**

1) এটা যকৃতে গ্লাইকোজেনের মাত্রা বজায় রাখে। উপবাসকালে সর্বদা রক্ত শর্করার পরিমাণ এমন এক মাত্রায় বজায় রাখে যাতে মস্তিষ্ক, বৃক্ক, লোহিত কণিকা ও পেশীতে শর্করার সরবরাহ হয়।

2) এটি রক্ত থেকে গ্লাইকোলিসিসজাত বিপাকীয় পদার্থ (পাইরুভেট, ল্যাকটেট) এবং লাইপোলিসিসজাত বিপাকীয় পদার্থ অপসারণ করে কার্বোহাইড্রেটরূপে পুনঃব্যবহার করে। গ্লাইকোলিসিসে উৎপন্ন ল্যাকটেট প্রধানতঃ পেশী কোষ থেকে রক্তে মুক্ত হয়, যকৃতে বাহিত হয় এবং সেখানে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই গ্লুকোজের আবার পেশীতে গ্লাইকোলিসিস ঘটে। এই চক্রকে কোরি চক্র (cori cycle) অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড চক্র বলে (চিত্র 11K)।

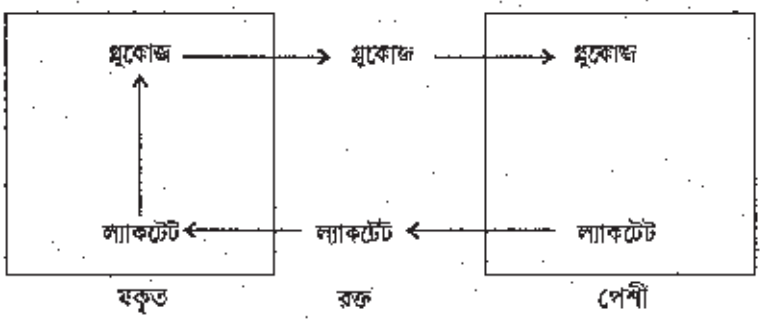

চিত্র 11K : কোরি চক্র

3) এটা লিউসিন ও লাইসিন ছাড়া অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বন কাঠামোর বিপাক ঘটায়।

4) রোমন্থক স্তন্যপায়ীতে এটা প্রোপায়োনেটের প্রধান বিপাকীয় পথ। এই প্রাণীদের রক্ত শর্করার মাত্রা প্রোপায়োনেট থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিসের মাধ্যমে বজায় থাকে।

H) নিয়ন্ত্রণ

পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ PEPCK, ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফাটেজ এবং গ্লুকোজ 6–ফসফাটেজ হল প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী উৎসেচক। গ্লুকাগন, অ্যাড্রিন্যালিন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ সংশ্লেষ করে গ্লুকোনিওজেনেসিস বৃদ্ধি করে। ইনসুলিন অপরদিকে এই উৎসেচককে বাধা দিয়ে গ্লুকোনিওজেনেসিস হ্রাস করে। উপবাসকালে গ্লুকাগন দ্বারা PEPCK উদ্দীপিত হয় ও গ্লুকোনিওজেনেসিস বৃদ্ধি পায়। ফ্রুকটোজ 1, 6–বিসফসফাটেজ তীব্রভাবে AMP দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সাইট্রেট দ্বারা সক্রিয় হয়। সুতরাং যখন যকৃত কোষ ATP ও সাইট্রেট সমৃদ্ধ থাকে, তখন গ্লুকোনিওজেনেসিস বৃদ্ধি পায়। আবার যখন যকৃত কোষে সাইট্রেট কম ও AMP বেশী থাকে, তখন এই প্রক্রিয়া হ্রাস পায়। গ্লুকোজ 6–ফসফাটেজ উপবাসকালে গ্লুকাগন ও কর্টিসল ক্ষরণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং পরিণামে গ্লুকোনিওজেনেসিস বৃদ্ধি করে। ইনসুলিন এই উৎসেচককে দমিয়ে রাখে।

উচ্চ-শর্করা আহার ইনসুলিন/গ্লুকাগন অনুপাত বৃদ্ধি করে গ্লুকোনিওজেনেসিস হ্রাস করে, কারণ ইনসুলিনের প্রভাবে উপরোক্ত চারটি নিয়ন্ত্রণকারী উৎসেচকের ক্রিয়া দমে যায়।

11.3 প্রশ্নাবলী

11.3.1 দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ-

1) গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
2) গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
3) গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
4) TCA চক্র বর্ণনা করুন।
5) ল্যাকটেট বা পাইরুভেট থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
6) গ্লিসেরল থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
7) অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

11.3.2 সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ-

1) গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ার ধাপগুলি কেবল উল্লেখ করুন।
2) গ্লাইকোজেনেসিসে শক্তির খরচের উপর টীকা লিখুন।
3) গ্লাইকোজেনেসিসের তাৎপর্য উল্লেখ করুন।

4) গ্লাইকোজেনেসিসের নিয়ন্ত্রণ উল্লেখ করুন।

5) গ্লাইকোজেনোলাইসিসের ধাপগুলি কেবল উল্লেখ করুন।

6) গ্লাইকোজেনোলাইসিসের তাৎপর্য ও নিয়ন্ত্রণ উল্লেখ করুন।

7) গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার ধাপগুলি কেবল উল্লেখ করুন।

8) গ্লাইকোলিসিসের ATP উৎপাদন ও খরচ বর্ণনা করুন।

9) গ্লাইকোলিসিসের নিয়ন্ত্রণ উল্লেখ করুন।

10) সন্ধান প্রক্রিয়ার উপর টীকা লিখুন।

11) অ্যাসিটাইল কোA উৎপাদন বর্ণনা করুন।

12) TCA চক্রের ধাপগুলি কেবল উল্লেখ করুন।

13) TCA চক্রের শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে লিখুন।

14) TCA চক্রের নিয়ন্ত্রণের উপর টিকা লিখুন।

15) গ্লুকোনিওজেনেসিসের উৎস সম্পর্কে লিখুন।

16) ল্যাকটেট থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিসের ধাপগুলি কেবল উল্লেখ করুন।

17) গ্লিসেরল থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিসের ধাপগুলি কেবল উল্লেখ করুন।

18) অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোনিওজেনেসিস ছকের আকারে দেখান।

11.3.3 অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ-

1) গ্লাইকোজেনেসিসের সংজ্ঞা লিখুন।

2) ব্র্যান্চিং উৎসেচক বলতে কী বুঝায়।

3) 1, 4–গ্লাইকোসাইডিক বণ্ড বলিতে কী বুঝ?

4) UDPG-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

5) গ্লাইকোজেনকে কেন 'প্রাণী শ্বেতসার' বলে?

6) গ্লাইকোজেনোলাইসিসের সংজ্ঞা লেখ?

7) cAMP-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

8) Embden-Meyerhof পথ কাকে বলে?

9) অবাত পরিবেশে গ্লাইকোলিসিসে প্রতি গ্লুকোজ অণুতে কত অণু ATP লাভ হয়?

10) সবাত পরিবেশে গ্লাইকোলিসিসে প্রতি গ্লুকোজ অণু থেকে মোট কত অণু ATP নীট শক্তিরূপে লাভ হয়।

11) সন্ধান প্রক্রিয়া কী?

12) PFK-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

13) TCA-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

14) পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্স কী?

15) ক্রেবস চক্রের প্রতি পাইরুভেট অণু থেকে সবাত বিপাকে মোট কত অণুর উচ্চশক্তির ফসফেট বন্ড তৈরী হয়?

16) গ্লুকোনিওজেনেসিসের সংজ্ঞা লিখুন।

17) গ্লুকোনিওজেনেসিস কোথায় ঘটে?

18) PEPCK-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

19) LDH-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

20) PEP-এর সম্পূর্ণ নাম কী?

21) চারটি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম লিখুন।

22) কোরি চক্র কাকে বলে?

11.4 উত্তরাবলী

11.4.1

1) 11.2.1 দেখুন।

2) 11.2. 2 দেখুন।

3) 11.2.3 দেখুন।

4) 11.2.4 দেখুন।

5) 11.2.5D দেখুন।

6) 11.2.5E দেখুন।

7) 11.2.5F দেখুন।

11.4.2

1) 11.2.1B দেখুন।
2) 11.2.1D দেখুন।
3) 11.2.1E দেখুন।
4) 11.2.1F দেখুন।
5) 11.2.2B দেখুন।
6) 11.2.2D ও E দেখুন।
7) 11.2.3B দেখুন।
8) 11.2.3D দেখুন।
9) 11.2.3E দেখুন।
10) 11.2.3F দেখুন।
11) 11.2.4A দেখুন।
12) 11.2.4B(a) দেখুন।
13) 11.2.4B(c) দেখুন।
14) 11.2.4B(d) দেখুন।
15) 11.2.5B দেখুন।
16) 11.2.5D দেখুন।
17) 11.2.5E দেখুন।
18) 11.2.5F দেখুন।

11.4.3

1) 11.2.1A দেখুন।
2) 11.2 I C(5) দেখুন।
3) 11.2 I C (5) দেখুন।
4) Uridine diphosphoglucose.

5) 11.2.1 E দেখুন।

6) 11.2.2 A দেখুন।

7) Cyclic Adenosine monophosphate.

8) 1930-এর দশকে জার্মান বায়োকেমিস্ট G.Embden, O. Meyerhof গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতিটির বিশদ ব্যাখ্যা দেন। এইজন্য গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতির অপর নাম Embden-Meyerhof পথ।

9) 2 অণু ATP

10) 8 অণু ATP

11) অবাত পরিবেশে অর্থাৎ আণবিক O_2 ব্যবহার না করে বিপাকীয় শক্তি তথা উচ্চ শক্তির ফসফেট বণ্ড যুক্ত ATP অণু তৈরীর পদ্ধতিকে সন্ধান বলে।

12) ফসফোফ্রুকটোকাইনেজ (Phosphofructo-kinase)।

13) ট্রাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল (Tri-carboxylic acid cycle).

14) এর দ্বারা পাইরুভেটের ডি-কার্বক্সিলেশন (decarboxylation) ঘটে এবং এর ফলে অ্যাসিটাইল-কোA (acetyl coA) উৎপন্ন হয়।

15) 15টি ফসফেট বণ্ড তৈরী হয়।

16) 11.2.5 A দেখুন।

17) আংশিক হয় মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে ও আংশিক হয় সাইটোসলে।

18) ফসফোএনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ (PEPCK)।

19) ল্যাকটেট ডি-হাইড্রোজিনেজ (LDH)।

20) ফসফোএনল পাইরুভেট (PEP)।

21) গ্লুটামেট, আর্জিনিন, প্রোলিন ও হিসটিডিন।

22) 11.2.5G (2) দেখুন।

একক 12 ❐ লিপিড বিপাক (Lipid metabolism)

গঠন

12.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

12.1 ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন

12.1.A β–অক্সিডেশন

12.1.B α এবং ω অক্সিডেশন

12.1.C কিটোন বডি উৎপাদন

12.1.D পার অক্সিজোমে β – অক্সিডেশন

12.1.E সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ

12.1.F একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ

12.1.G বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ

12.2 প্রশ্নাবলী

12.3 উত্তরাবলী

12.4 গ্রন্থনির্দেশ

12.0 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

স্তন্যপায়ীর দেহে বিপাকীয় গুরুত্বের লিপিড হল ট্রাই অ্যাসিলগ্লিসেরল (ট্রাইগ্লিসেরাইড বা প্রকৃত ফ্যাট), ফসফোলিপিড স্টেরয়েড এবং সাথে তাদের বিপাকজাত পদার্থ যথা, দীর্ঘ শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড (মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড), গ্লিসেরল ও কিটোন বডি।

লিপিড আংশিকভাবে খাদ্য থেকে প্রাপ্ত হয় ও আংশিকভাবে কার্বোহাইড্রেট থেকে সংশ্লেষিত হয়। কার্বোহাইড্রেটের অধিকাংশ পরিমাণ ট্রাই অ্যাসিলগ্লিসেরলে পরিণত হয়। ট্রাই অ্যাসিলগ্লিসেরল রূপেই লিপিড চর্বিকোষ তথা অ্যাডিপোসাইটের মধ্যে জমা থাকে। এটাই প্রয়োজনে জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এবং কলার প্রধান শক্তি-সরবরাহকারী। চর্মনীচস্থ ফ্যাট তাপনিরোধকরূপে দেহ থেকে তাপক্ষয় হতে দেয় না। এরূপ ফ্যাটের সঞ্চয় আঘাত-নিরোধক গদির ন্যায় কাজ করে। ফসফোগ্লিসেরাইড, স্ফিংগোলিপিড ও কোলেস্টেরল হল কোষ পর্দার গুরুত্বপূর্ণ গঠনগত উপাদান। ভিটামিন D, স্টেরয়েড হর্মোন ও পিত্তলবণ কোলেস্টেরল থেকে সংশ্লেষিত হয়। প্রস্টাগ্ল্যানডিন (Prostaglandin) ও অন্যান্য পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে সংশ্লেষিত হয় এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে।

12.1 ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন

ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন প্রধানত β-অক্সিডেশন (Beta oxidation) পদ্ধতিতে ঘটে। তাছাড়া কিছু α-অক্সিডেশন (Alpha oxidation) ও ওমেগা অক্সিডেশন (Omega oxidation) ঘটে।

12.1.A β-অক্সিডেশন

যকৃত, পেশী, হৃৎপিণ্ড, রেনাল কর্টেক্স ও ব্রাউন অ্যাডিপোজ কলার মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে ফ্যাটি অ্যাসিডের β-অক্সিডেশন পদ্ধতিতে সবাত জারণ ঘটে। এটাই উপবাসে, ঠাণ্ডাজনিত থার্মোজেনেসিসে এবং পেশীর অতিরিক্ত কার্যকালে শক্তির চাহিদা মেটায়।

ফ্যাটি অ্যাসিডের শৃঙ্খল অধিকাংশ যুগ্ম সংখ্যার কার্বন যুক্ত। বিজ্ঞানী F. Knoop প্রথম দেখেন যে ফ্যাটি অ্যাসিড প্রতি ধাপে দুইটি কার্বনের অপসারণ দ্বারা জারিত হয় এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের 2 নম্বর ও 3 নম্বর অবস্থানের কার্বন-মধ্যস্থ বণ্ড ভেঙে 3 নম্বর কার্বন জারিত হয়। এটি নিম্নরূপ :-

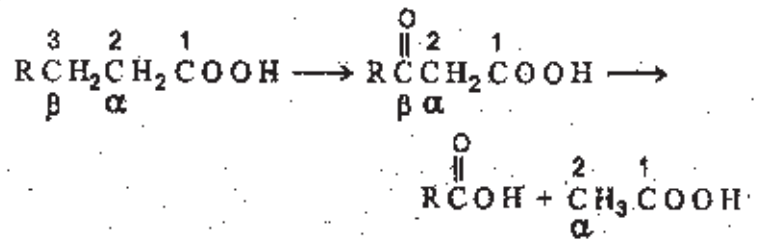

এখানে 2 নম্বর অবস্থানের কার্বনকে বলা হয় আলফা (α) কার্বন এবং 3 নম্বর অবস্থানের কার্বনকে বলে β (β) কার্বন। এইজন্য এই প্রকার জারণের নাম β– অক্সিডেশন।

এর বিক্রিয়ার গবেষণায় Munoz, Leloir, Lehninger, Lipmann ও Lynen নামক বিজ্ঞানীদেরও অবদান ছ। 1954 সালে β–অক্সিডেশনের মৌলিক ছক জানা যায়।

a) সম্পৃক্ত জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β– অক্সিডেশন

দীর্ঘ-শৃঙ্খল যুক্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড β–অক্সিডেশন দ্বারা দুই কার্বন যুক্ত একক তথা অ্যাসিটেটে পরিণত হয়, যা পরে TCA চক্র ও ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রের মাধ্যমে CO_2 ও H_2O-তে জারিত হয়। β–অক্সিডেশনের উৎসেচকগুলি মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে থাকে। সাইটোপ্লাজমের ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রথমে সক্রিয়তা ও তারপর তার মাইটোকনড্রিয়ায় পরিবহন ঘটে।

1) ফ্যাটি অ্যাসিডের সক্রিয়করণ (Activation) :

ফ্যাটি অ্যাসিড ATP ও কোএনজাইম A-এর উপস্থিতিতে থায়োকাইনেজ (অ্যাসিল-কোA সিনথেটেজ) উৎসেচকের সাহায্যে সক্রিয় অন্তর্বর্তী যৌগ তথা ফ্যাটি অ্যাসিল-কোA তৈরী করে। এখানে থায়োকাইনেজ ATP-এর সাহায্যে ফ্যাটি অ্যাসিডকে উৎসেচক-সংলগ্ন অ্যাসিল অ্যাডিনাইলেটে পরিণত করে এবং পাইরোফসফেট (PPi) নির্গত করে। তারপর কোএনজাইমA (CoA-SH) অ্যাসিল অ্যাডিনাইলেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে উৎসেচক থেকে অ্যাসিল-কোA ও AMP মুক্ত করে। এখন অজৈব পাইরো ফসফাটেজ উৎসেচক PPi কে বিশ্লিষ্ট করে দুইটি অজৈব ফসফেট (Pi) তৈরী করে। সর্বোপরি এই সক্রিয়করণে দেখা যায় যে ATP-এর দুইটি উচ্চশক্তির ফসফেট বণ্ড খরচ করে থায়োকাইনেজ উৎসেচক ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বক্সিল-কার্বন এবং কোএনজাইম A-এর থায়োল-S-এর মধ্যে থায়োএস্টার বণ্ড তৈরী করে।

ফ্যাটি অ্যাসিড + ATP + CoA ⟶ অ্যাসিল-কোA + PPi + AMP

$PPi + H_2O \longrightarrow 2Pi$

থায়োকাইনেজ উৎসেচকগুলি মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দা ও ম্যাট্রিক্সে থাকে। এগুলি ফ্যাটি অ্যাসিডের শৃঙ্খল দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট — যেমন পামিটেট (C_{16}) ও স্টিয়ারেট (C_{18}) ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্য দীর্ঘ শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড থায়োকাইনেজ ক্রিয়া করে, C_4 থেকে C_{12} ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন অক্টানোইক অ্যাসিডের (Octanoic acid) জন্য মধ্যম শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড থায়োকাইনেজ ক্রিয়া করে, আবার অ্যাসিটেট (C_2) ও প্রোপায়োনেট (C_3) ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্য ক্ষুদ্র শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড থায়োকাইনেজ ক্রিয়া করে।

2) কারনিটাইন (carnitine) বাহকের ভূমিকা

দীর্ঘশৃঙ্খল অ্যাসিল কোA নিজে মাইটোকনড্রিয়া পর্দার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। এজন্য কারনিটাইন (β– হাইড্রক্সি-γ– ট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম বিউটাইরেট) নামক এক সচল বাহকের দরকার হয়। অন্তঃপর্দার সাইটোপ্লাজমীয় তলে অবস্থিত কারনিটাইন অ্যাসিলট্র্যান্সফারেজ I (carnitine

acyltransferase I) সাইটোপ্লাজমীয় অ্যাসিল কোA-এর অ্যাসিল গ্রুপকে কারনিটাইনের কাছে হস্তান্তর করে এবং অ্যাসিল কারনিটাইন ও মুক্ত কোএনজাইমA তৈরী করে। অন্তঃপর্দাস্থিত কারনিটাইন-অ্যাসিলকারনিটাইন ট্রান্সলোকেজ উৎসেচক এখন অ্যাসিলকারনিটাইনকে পর্দা বরাবর বহন করে মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে নিয়ে আসে এবং বিনিময়ে মাইটোকনড্রিয়া থেকে কারনিটাইনের নির্গমন ঘটায়। এইবার, অন্তঃপর্দার ভিতরের তলে অবস্থিত কারনিটাইন অ্যাসিলট্রান্সফারেজ II উৎসেচকের ক্রিয়ায় অ্যাসিলকারনিটাইন থেকে অ্যাসিল গ্রুপ বেরিয়ে কোA-এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যাসিল-কোA তৈরী হয় এবং কারনিটাইন মুক্ত হয়। এই কারনিটাইন পুনরায় পূর্বে উক্ত ট্রান্সলোকেজ উৎসেচকের সাহায্যে ম্যাট্রিক্স থেকে সাইটোপ্লাজমে বেরিয়ে আসে (চিত্র12A)। কারনিটাইনের অভাব ঘটলে ফ্যাটি অ্যাসিড জারণ

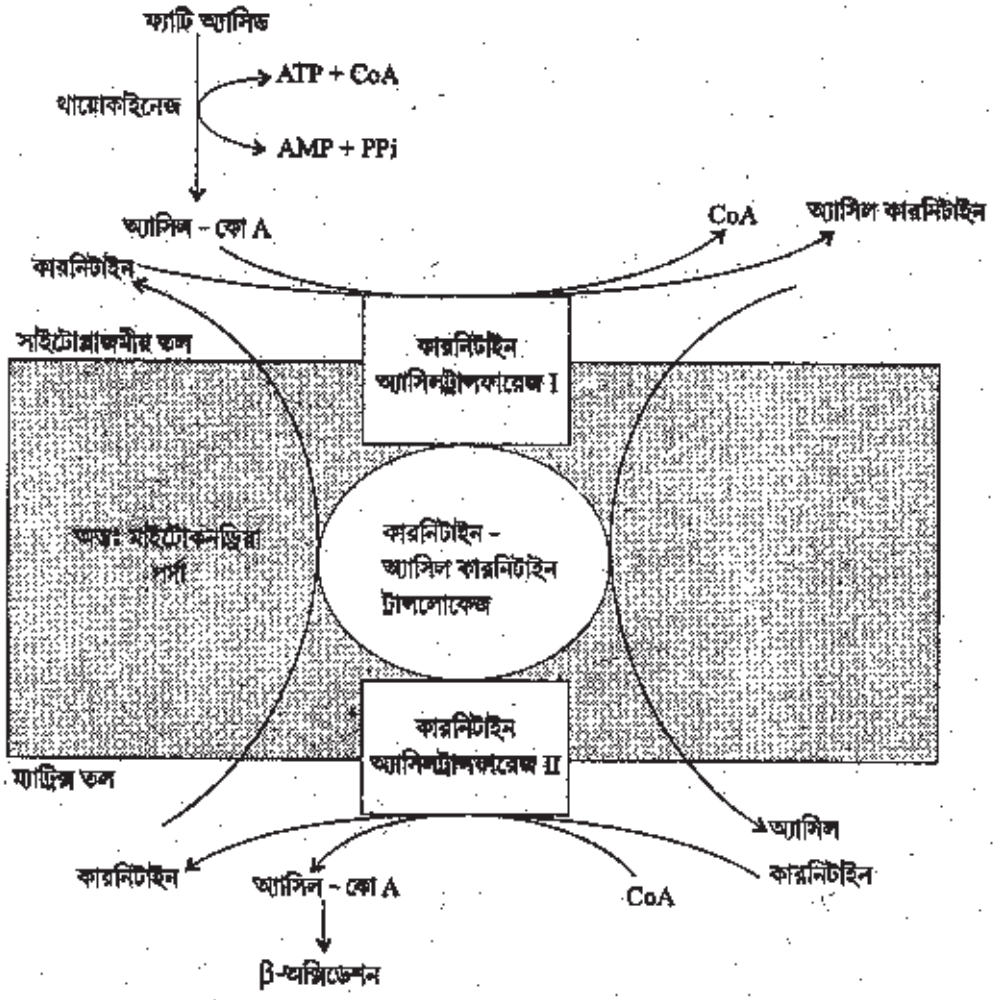

চিত্র 12A : ফ্যাটি অ্যাসিডের সক্রিয়করণ ও কারনিটাইন বাহকের ভূমিকা

বিঘ্নিত হয়, ফলে কলায় ফ্যাট জমা হয়। কারনিটাইন যকৃতে ও বৃক্কে লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে সংশ্লেষিত হয়।

3) **মাইটোকনড্রিয়ায় β-অক্সিডেশনের বিক্রিয়াসমূহের ধাপ**

i) মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে প্রবেশের পর অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে অ্যাসিল-কোA জারিত হয় এবং এর α ও β কার্বন থেকে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু দূর হয়ে α, β-ট্র্যান্স-এনয়েল-কোA ও $FADH_2$ হয়। এখানে ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের কোএনজাইম হল FAD যুক্ত একটি ফ্ল্যাভোপ্রোটিন। পরে $FADH_2$ থেকে ইলেকট্রন ইলেকট্রন-পরিবহন তন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 2 অণু ATP তৈরী করে।

অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ সাবস্ট্রেটের শৃঙ্খল দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্দিষ্টতা দেখায় এবং সেই অনুযায়ী যথাক্রমে দীর্ঘ, মধ্যম ও সংক্ষিপ্ত শৃঙ্খলযুক্ত অ্যাসিল-কোA-এর উপর ক্রিয়া করে।

ii) এখন এনয়েল-কোA হাইড্রেজ উৎসেচকের প্রভাবে এনয়েল-কোA-এর $C_2 - C_3$ বন্ধনে জলযুক্ত হয়ে 3-L-হাইড্রক্সিঅ্যাসিল-কোA তৈরী হয়। এই উৎসেচক বিভিন্ন শৃঙ্খল দৈর্ঘের অ্যাসিল গ্রুপকে জলযুক্ত করতে পারে এবং সাবস্ট্রেটের সিস-ট্র্যান্স নির্দিষ্টতা দেখায় না।

iii) এইবার NAD^+ কোএনজাইম যুক্ত 3-L-হাইড্রক্সিঅ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের প্রভাবে 3-কিটো অ্যাসিল-কোA ও NADH তৈরী হয়। পরে NADH থেকে ইলেকট্রন ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 3 অণু ATP তৈরী করে। এই উৎসেচক কেবল হাইড্রক্সি অ্যাসিল গ্রুপের L-আইসোমারের উপর কাজ করে এবং সাবস্ট্রেটের শৃঙ্খল দৈর্ঘের উপর নির্দিষ্টতা দেখায় না।

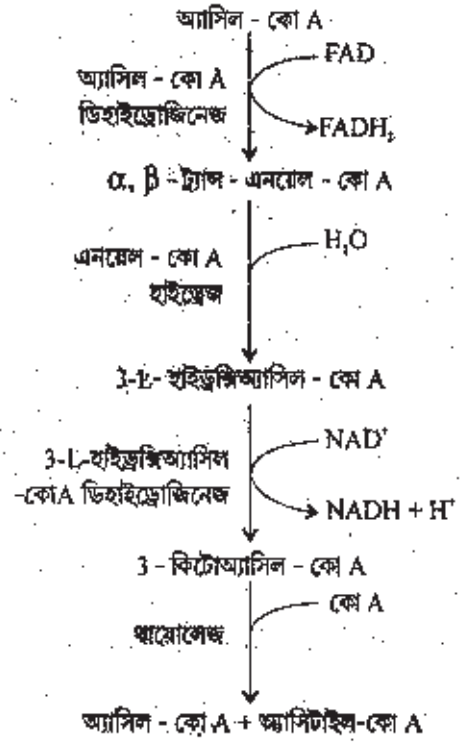

চিত্র 12B : মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে β-অক্সিডেশনের ধাপসমূহ

iv) চূড়ান্ত ধাপে থায়োলেজ উৎসেচকের প্রভাবে 3-কিটো অ্যাসিল-কো থেকে একটি অ্যাসিটাইল-কোA এবং একটি অ্যাসিল-কোA তৈরী হয় (চিত্র 12B)। এই অ্যাসিল-কোA β–অক্সিডেশনে প্রারম্ভকারী সাবস্ট্রেট থেকে মাত্র দুই কার্বন পরমাণু ছোট। অ্যাসিল-কোA পুনরায় β–অক্সিডেশন চক্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে $FADH_2$, NADH, অ্যাসিটাইল-কোA এবং একটি অ্যাসিল-কোA তৈরী করে, যা আগের মতই পুনরায় দুই কার্বন পরমাণু ছোট। এইভাবে ক্রমাগত β–অক্সিডেশন চক্রের মধ্য দিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিডের ভাঙন চলতে থাকে। অবশেষে চার কার্বনযুক্ত বিউটাইরিল-কোA বিশ্লিষ্ট হয়ে দুইটি অ্যাসিটাইল কোA তৈরী করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে দুই প্রকারের থায়োলেজ থাকে। একটি অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল-কোA-এর জন্য নির্দিষ্ট এবং কিটোন বডি বিপাকে জড়িত। দ্বিতীয়টি বিভিন্ন শৃঙ্খল দৈর্ঘ্যের 3-কিটো অ্যাসিল-কোA-এর উপর কাজ করে ও β–অক্সিডেশনে জড়িত।

4) **শক্তি উৎপাদন**

TCA চক্র ও ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র সহযোগে β–অক্সিডেশন প্রতি কার্বন পরমাণু পিছু প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করে। এই শক্তি উৎপাদন গ্লুকোজ অথবা অ্যামাইনো অ্যাসিড জারণ অপেক্ষা বেশী হয়। প্রতি β–অক্সিডেশন চক্রের দুইটি জারণ ধর্মী ধাপ আছে - একটি অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ ধাপে ও অপরটি 3-L-হাইড্রক্সিঅ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ ধাপে। প্রথম ধাপে উৎপন্ন $FADH_2$ ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে 2 অণু ATP তৈরী করে। দ্বিতীয়োক্ত ধাপে উৎপন্ন NADH ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে 3 অণু ATP তৈরী করে। সুতরাং β–অক্সিডেশনের প্রতি চক্রে 5 অণু ATP বা উচ্চ শক্তির ফসফেট বণ্ড (~ P) তৈরী হয়। প্রতি চক্রের শেষে যে অ্যাসিটাইল-কোA তৈরী হয়, তা আবার TCA চক্রের মধ্য দিয়ে 12 অণু ATP তৈরী করে। আবার, প্রারম্ভে ফ্যাটি অ্যাসিডের সক্রিয়করণকালে অর্থাৎ অ্যাসিল-কোA সৃষ্টিকালে ATP-এর দুইটি উচ্চ শক্তির ফসফেট বণ্ড খরচ হয়। যুগ্ম সংখ্যক কার্বন পরমাণু যুক্ত (n) ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণে β–অক্সিডেশন চক্র $(\frac{1}{2}n - 1)$ বার ঘটে এবং $\frac{1}{2}n$ সংখ্যক অ্যাসিটাইল-কোA অণু তৈরী করে।

সুতরাং পামিটিক অ্যাসিড (C_{16}) নামক সম্পৃক্ত জোড় সংখ্যক কার্বনযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন চক্র 7 বার হবে এবং 8টি অ্যাসিটাইল-কোA অণু হবে। প্রতি চক্রে 5 অণু হিসাবে 7টি চক্রে 35 অণু ATP তৈরী হবে। আটটি অ্যাসিটাইল-কোA অণু TCA চক্রের মধ্য দিয়ে 96 অণু ATP তৈরী করবে। ফলে উৎপাদন দাঁড়ায় 131 অণু ATP। এখন প্রারম্ভিক সক্রিয় করণে ATP-এর খরচ ধরে এক মোল পামিটিক অ্যাসিডের জারণে নীট শক্তি উৎপাদন হয় 129 মোল উচ্চ শক্তির ফসফেট বণ্ড (~ P)। তা প্রায় 942 Kcal শক্তির সমতুল্য (129×7.3)। এখানে উল্লেখ্য যে একটি উচ্চ শক্তির ফসফেট বণ্ড ভেঙে 7.3 Kcal শক্তি পাওয়া যায়।

5) **নিয়ন্ত্রণ**

β–অক্সিডেশনের হার বহুলাংশে রক্তে প্রবহমান মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের উপর (FFA) নির্ভর করে। গ্লুকাগন, অ্যাড্রিনালিন, কর্টিসল ও ইনসুলিন রক্তের FFA-এর পরিমাণ পরিবর্তন করে β-অক্সিডেশন নিয়ন্ত্রণ করে।

b) সম্পৃক্ত বিজোড় কার্বন পরমাণু যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন

অনেক স্তন্যপায়ী কলায় বিজোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বিরল। তবে রোমন্থক স্তন্যপায়ী যেমন গরু ও ভেড়ায় বিজোড় ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন প্রায় 25% শক্তির চাহিদা মেটায়। ফলে 17-কার্বনযুক্ত ঋজুশৃঙ্খল বিশিষ্ট (straight chain) ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশনে 7টি অ্যাসিটাইল-কোA এবং 1টি প্রোপায়োনিল-কোA তৈরী হবে। তিন কার্বনযুক্ত প্রোপায়োলিন-কোA এরপর তিনটি উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত ধাপের মধ্য দিয়ে সাক্সিনিল-কোA তৈরী করে (চিত্র12C)। শেষোক্ত পদার্থটি TCA চক্রের অন্তবর্তী যৌগ।

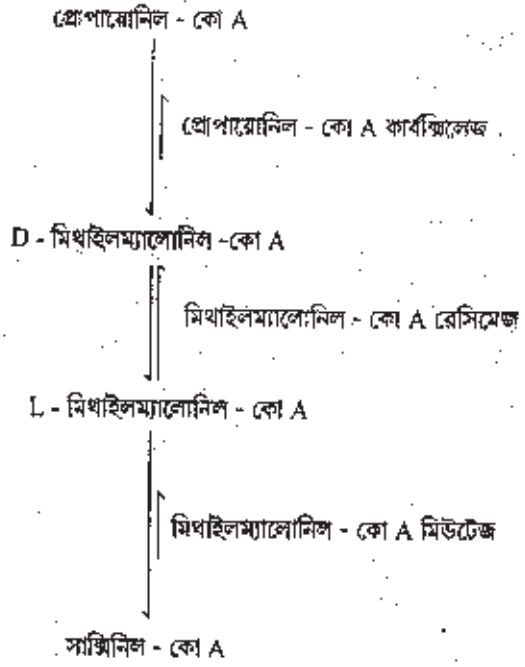

চিত্র 12C ঃ প্রোপায়োনিল - কো A থেকে সাক্সিনিল - কো A উৎপাদন

c) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন

অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সাধারণতঃ ট্রাইঅ্যাসিলগ্লিসেরল ও ফসফোলিপিডের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে এই সব পদার্থেরও β–অক্সিডেশনের ব্যবস্থা আছে, তবে অতিরিক্ত কিছু উৎসেচক লাগে। উদাহরণ স্বরূপ, ওলিক অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন সক্রিয় পদার্থ ওলিওয়েল-কোA (Oleoyl-CoA) β–অক্সিডেশনের প্রথম তিনটি চক্র দ্বারা জারিত হয়। কিন্তু এরপরে উৎপন্ন পদার্থ Δ^3-সিস-ডোডিসিনয়েল-কোA (Δ^3-cis-dodecenoyl-CoA)-এর উপর অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক কাজ করতে পারে না। এর কারণ সিস-ডাবল বণ্ডের উপস্থিতি। এইজন্য এই ধাপটি অন্য একটি উৎসেচক তথা এনয়েল-কোA আইসোমারেজ দ্বারা অনুঘটিত হয় এবং তখন ডাবল বণ্ডের আইসোমারাইজেশন হয়ে Δ^2-ট্রান্স-ডোডিসিনয়েল-কোA তৈরী হয়। এই অন্তবর্তী যৌগটি β–অক্সিডেশন উৎসেচক এনয়েল-কোA হাইড্রেজের স্বাভাবিক সাবস্ট্রেট। এরপর

β–অক্সিডেশন স্বাভাবিক পথে চলতে থাকে এবং অবশেষে 6টি অ্যাসিটাইল-কোA তৈরী হয় (চিত্র12D)। যেহেতু এখানে β–অক্সিডেশনের কোন চক্রে অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ ব্যবহৃত হয় না, সেইজন্য এখানে $FADH_2$ তৈরী হয় না এবং সেই অনুযায়ী সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অপেক্ষা ATP কম তৈরী হয়।

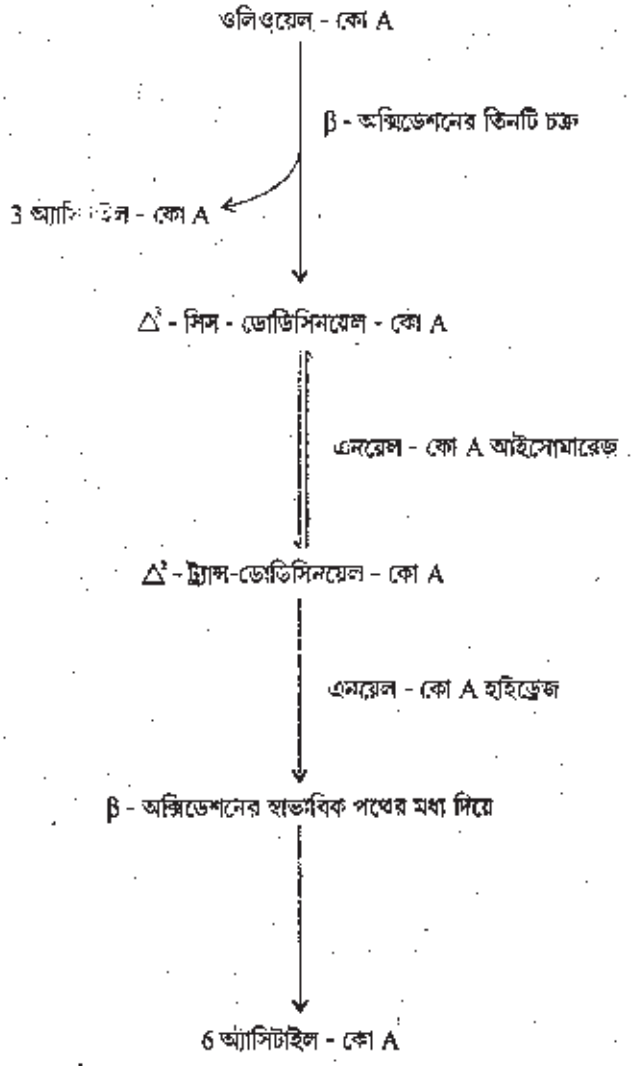

চিত্র 12D ঃ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (ওলিক অ্যাসিড) β অক্সিডেশনের ধাপ

অণুরূপে বহু অসম্পৃক্ত (Poly unsaturated) ফ্যাটি অ্যাসিডেরও β–অক্সিডেশন ঘটে, তবে এখানে এনয়েল-কোA আইসোমারেজ এবং একটি অতিরিক্ত উৎসেচক তথা 2, 4-ডাইএনয়েল-কোA রিডাকটেজ লাগে। উদাহরণ স্বরূপ, লিনোলিওয়েল-কোA (লিনোলিক অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত সক্রিয় পদার্থ) প্রথমে β–অক্সিডেশনের তিনটি চক্রের মধ্য দিয়ে যায়। এতে 3 অণু অ্যাসিটাইল-কোA এবং Δ^3-সিস অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিল-কোA তৈরী হয়। শেষোক্ত পদার্থের উপর অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক ক্রিয়া করে না। এজন্য এনয়েল-কোA

আইসোমারেজ দ্বারা আইসোমারাইজেশন হয়ে Δ^2-ট্র্যান্স অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিল-কো.A তৈরী হয়। এখন এটা β-অক্সিডেশনের একটি চক্র সম্পন্ন করে এবং ফলে 1 অনু অ্যাসিটাইল-কো.A ও Δ^4-সিস-এনয়েল-কো.A উৎপন্ন হয়। এরপর অ্যাসিল-কো.A ডিহাইড্রোজিনেজের ক্রিয়ায় Δ^2-ট্র্যান্স, Δ^4-সিস-ডাইএনয়েল-কো.A তৈরী হয়। এই সাবস্ট্রেটের উপর β-অক্সিডেশনের পরবর্তী স্বাভাবিক উৎসেচক তথা এনয়েল-কো.A হাইড্রেজ ক্রিয়া করতে পারে না। পরিবর্তে পদার্থটি অন্য একটি উৎসেচক তথা 2, 4-ডাইএনয়েল-কো.A রিডাকটেজ দ্বারা Δ^3-ট্র্যান্স-এনয়েল-কো.A তে পরিণত হয়। তারপর এনয়েল-কো.A আইসোমারেজ দ্বারা Δ^2-ট্র্যান্স আইসোমারে পরিণত হয়।

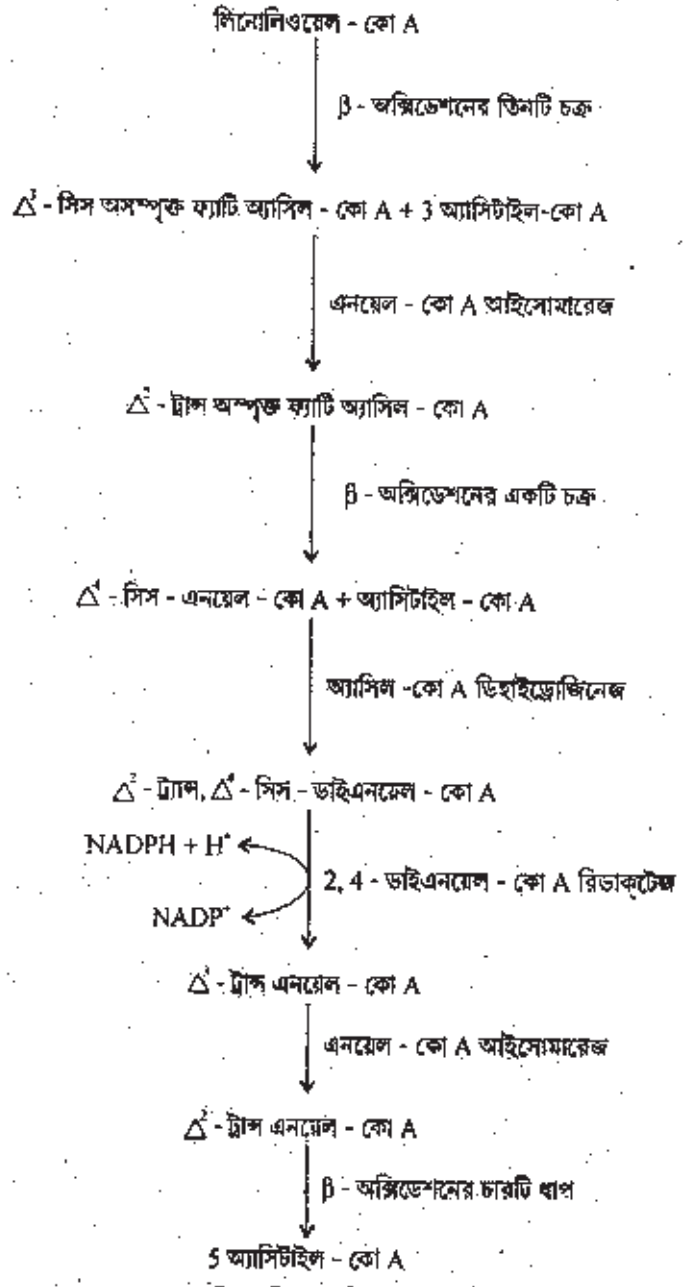

চিত্র 12E : বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (লিনোলিক অ্যাসিড) β - অক্সিডেশন

এরপর β–অক্সিডেশনের চারটি চক্র ঘটে এবং অবশেষে 5 অণু অ্যাসিটাইল-কোA উৎপন্ন হয় (চিত্র12E)। যেহেতু লিনোলিওয়েল-কোA-এর β–অক্সিডেশনে অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ ধাপ দুইবার এড়িয়ে যায়, সেজন্য এখানেও $FADH_2$ তৈরী না হওয়ায় ATP উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হয়।

12.1.B α (alpha) এবং ω (ওমেগা) অক্সিডেশন

যদিও β–অক্সিডেশন ফ্যাটি অ্যাসিড অপচিতির প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ পথ, তথাপি কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডের α–অক্সিডেশন ঘটে। ফাইটানিক অ্যাসিড (Phytanic acid) এক গুরুত্বপূর্ণ দুগ্ধজাত উপাদান। এটা রোমন্থক স্তন্যপায়ীর চর্বি ও দুগ্ধজাত পদার্থে থাকে। মানুষ প্রতিদিন গড়ে 50 – 100mg ফাইটানিক অ্যাসিড খাদ্যের সাথে গ্রহণ করে। এই ফাইটানিক অ্যাসিডের β–কার্বন অবস্থানে মিথাইল গ্রুপ ($-CH_3$) থাকে, যা β–অক্সিডেশনে বাধা দেয়। এইজন্য এর কার্বক্সিল প্রান্ত থেকে প্রথম কার্বন অর্থাৎ α–কার্বন জারণের মধ্য দিয়ে দূর হয় ও ফলে একে α–অক্সিডেশন বলে। বিক্রিয়ায় ফাইটানিক অ্যাসিডের উপর অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ ক্রিয়া করে না, পরিবর্তে অপর একটি মাইটোকনড্রিয়া ম্যাট্রিক্সের উৎসেচক তথা ফ্যাটি অ্যাসিড α–হাইড্রক্সিলেজ তার α–কার্বন অবস্থানে হাইড্রক্সিল গ্রুপ যোগ করে। হাইড্রক্সিল

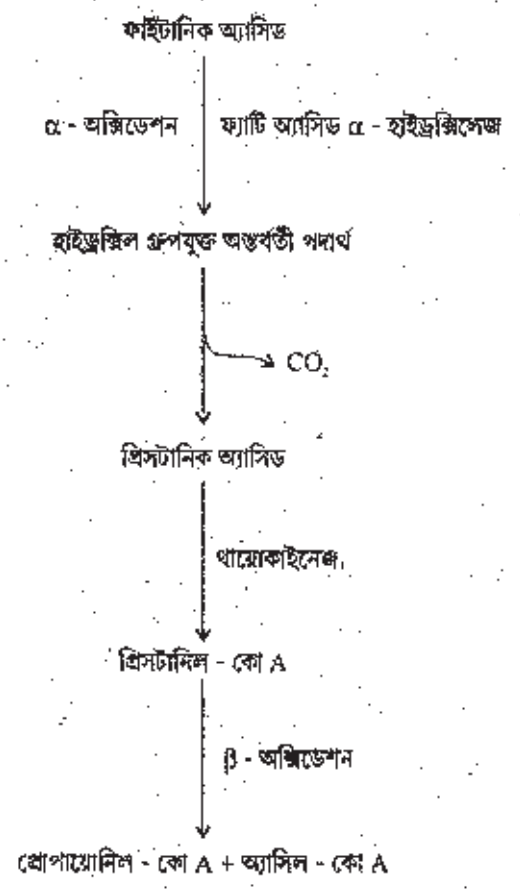

চিত্র 12F : α - অক্সিডেশন ও পরবর্তী বিক্রিয়া

গ্রুপ যুক্ত অন্তর্বর্তী যৌগের CO_2 বিয়োজন হয়ে প্রিসটানিক অ্যাসিড (Pristanic acid) ও CO_2 তৈরী হয়। এরপর থায়োকাইনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় প্রিসটানিক অ্যাসিড থেকে সক্রিয় পদার্থ প্রিসটানিল-কোA (Pristanyl-CoA) তৈরী হয়। এখন প্রিসটানিল-কোA β–অক্সিডেশনের স্বাভাবিক উৎসেচক যথা অ্যাসিল-কোA ডিহাইড্রোজিনেজ ও অন্যান্য দ্বারা জারিত হয়ে প্রোপায়োনিল-কোA ও অ্যাসিল-কোA তৈরী হয় (চিত্র12F)। রেফসামস্ রোগ (Refsum's disease) দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির α–অক্সিডেশনে জন্মগত ত্রুটি থাকে, ফলে ফাইটানিক অ্যাসিডের α–অক্সিডেশন হয় না।

ইঁদুরে যকৃত মাইক্রোজোমে ফ্যাটি অ্যাসিডের ω – (ওমেগা) অক্সিডেশন ঘটে। এখানে সাইটোক্রোম P-450–, NADPH-সহ ω – হাইড্রক্সিলেজ উৎসেচক এবং আণবিক অক্সিজেনের ক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের ω – কার্বন বা প্রান্তীয় মিথাইল গ্রুপের জারণ ঘটে। ফলে মিথাইল গ্রুপ ($-CH_3$) – CH_2OH গ্রুপে পরিণত হয়, যা তারপরে –COOH গ্রুপে জারিত হয়। ফলে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরী হয়। পরিমানগতভাবে দীর্ঘ-শৃঙ্খল যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ω – অক্সিডেশন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে C_8 থেকে C_{10} কার্বন যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ω – অক্সিডেশন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

1.1.C কিটোন বডি (Ketone Body) উৎপাদন

অ্যাসিটো অ্যাসিটেট, β–হাইড্রক্সিবিউটাইরেট এবং অ্যাসিটোনকে একত্রে বলে কিটোন বডি। যকৃতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন ঘটে, তখন যকৃতে কিটোন বডি তৈরী হয়। এই জলে দ্রবণীয় শক্তি সমৃদ্ধ যৌগগুলি অন্যান্য কলায় বাহিত হয়ে শক্তি উৎপাদন করে। উপবাসকালে অথবা অনিরাময় (untreated) ডায়াবেটিসে অতিরিক্ত কিটোন বডি উৎপন্ন হয়, যা ক্ষতিকারক।

যকৃত মাইটোকনড্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের জারণে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল-কোA-এর অনেকগুলি বিপাকীয় পরিণতি ঘটতে পারে। এর একটি হল TCA চক্রের মধ্য দিয়ে সদ্ব্যবহার। অন্য পথ হল এই কোএনজাইম কিটোন বডি সংশ্লেষে জড়িত হয়। প্রথম বিক্রিয়ায় অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল-কোA থায়োলেজ উৎসেচকের অনুঘটনে দুইটি অ্যাসিটাইল-কোA অণু ঘনীভূত হয়ে অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল-কোA উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি β–অক্সিডেশনের শেষ বিক্রিয়ার বিপরীত এবং তাপগতি বিদ্যা অনুসারে প্রতিকূল কারণ ভারসাম্য অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল-কোA-এর থায়োলাইটিক ক্লিভেজের দিকে যায়। এইজন্য এই যৌগ তখনই উৎপন্ন হয়, যখন অ্যাসিটাইল-কোA-এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা বিক্রিয়াকে অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল-কোA সংশ্লেষের দিকে ঠেলে দেয়। এরপর অ্যাসিটাইল-কোA (এর একটি তৃতীয় অণু অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-কোA-এর সাথে বিক্রিয়া করে) 3–হাইড্রক্সি-3-মিথাইল গ্লুটারিল-কোA (HMG-CoA) তৈরী করে। এখানে অনুঘটক হল HMG-CoA সিনথেজ উৎসেচক। পরবর্তী বিক্রিয়াটি HMG-CoA লায়েজ দ্বারা অনুঘটিত হয় এবং অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট ও অ্যাসিটাইল-কোA তৈরী হয়। অধিকাংশ অ্যাসিটো অ্যাসিটেট NADH দ্বারা মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দায় অবস্থিত 3-হাইড্রক্সিবিউটাইরেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় বিজারিত হয়ে 3-হাইড্রক্সিবিউটাইরেট তৈরী করে। অল্প পরিমাণ অ্যাসিটো অ্যাসিটেট সম্ভবতঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডিকার্বক্সিলেশন হয়ে অ্যাসিটোন তৈরী করে (চিত্র12G)। যে সকল ব্যক্তিরা অনিয়ন্ত্রিত টাইপ I ডায়াবেটিসে (অগ্ন্যাশয়ের আইলেট কোষ থেকে ইনসুলিন ক্ষরণের অভাবজনিত রোগ) ভুগছে, তাদের রক্তরসে উচ্চ মাত্রার কিটোন বডি থাকে এবং তাদের নিঃশ্বাসে অ্যাসিটোনের গন্ধ থাকে। যখন কোষ বা কলায় গ্লুকোজের অভাব ঘটে, তখন কিটোন বডির মাত্রা বৃদ্ধি

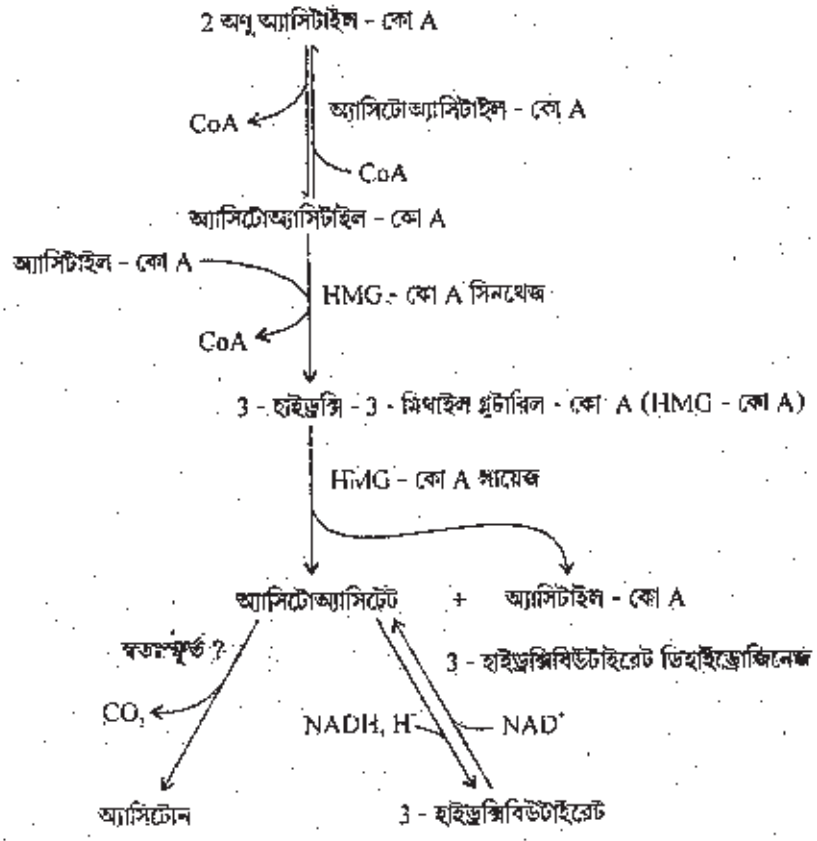

চিত্র ।2G ঃ কিটোন বডি সংশ্লেষ

পায়। ফলে শক্তি উৎপাদনের জন্য ফ্যাটি অ্যাসিডের চালান হয়, যা যকৃতে অতিরিক্ত অ্যাসিটাইল-কোA-এর উৎপাদন ঘটায়। এজন্য যকৃত এই অতিরিক্ত অ্যাসিটাইল-কোA থেকে কিটোন বডি তৈরী করে, যা যকৃতবহিঃস্থ কলায় শক্তির উৎসরূপে কাজ করে। এর ক্ষতিকারক দিক হল যে রক্তরসে কিটোনবডির অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে রক্তের pH হ্রাস পায় এবং তখন হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেনের সংযুক্তিতে অসুবিধা হয়।

কিটোন বডি সংশ্লেষ প্রাথমিকভাবে যকৃতের কাজ, কারণ HMG-কোA সিনথেজ প্রচুর পরিমাণে কেবল যকৃত কলায় পাওয়া যায়।

12.1.D পারঅক্সিজোমে β-অক্সিডেশন

পারঅক্সিজোম (Peroxisome) হল কোষীয় অঙ্গাণু, যার প্রধান কাজ দেহ থেকে অপসারণের জন্য পদার্থের প্রক্রিয়া ঘটানো। Lazarow ও de Duve (1976) দেখান যে ইঁদুরের যকৃতের পারঅক্সিজোমে β-অক্সিডেশন পদ্ধতি ঘটে। পারঅক্সিজোমের β-অক্সিডেশন মাইটোকনড্রিয়ার β-অক্সিডেশনের অনুরূপ, তবে ব্যতিক্রম হল প্রারম্ভিক ডিহাইড্রোজিনেশনের ক্ষেত্রে। এখানে এই বিক্রিয়াটি FAD-যুক্ত অ্যাসিল-কোA অক্সিডেজ দ্বারা ঘটে। অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জারিত ফ্ল্যাভিন পুনঃউৎপাদিত হয় এবং অক্সিজেন তখন H_2O_2-তে বিজারিত হয় এবং পারঅক্সিজোমের ক্যাটালেজ উৎসেচক H_2O_2-কে H_2O-তে বিজারিত করে। যেহেতু এখানে β-অক্সিডেশনের ইলেকট্রন শ্বসন শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না, ফলে এই পারঅক্সিজোমীয় পদ্ধতিতে কোন শক্তি উৎপন্ন হয় না।

1.E সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ

খাদ্য গ্রহণের পর যখন শক্তি উৎপাদন অতিরিক্ত হারে হয়, তখন জীবেরা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলিকে ট্রাই অ্যাসিলগ্লিসেরলে উপাদানরূপে আবদ্ধ করে শক্তি জমা করে রাখে। বিজ্ঞানী Lynen দেখিয়েছেন যে ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষে অ্যাসিটাইল-কোA কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। পরে 1950-এর শেষ ভাগে যখন বিজ্ঞানী Wakil ম্যালোনিল-কোA (malonyl-CoA)-এর ভূমিকা আবিষ্কার করেন, তখনই জানা যায় কিরূপে অ্যাসিটাইল-কোA ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। সমস্ত জীবেই সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষ একই রকম। পামিটিক অ্যাসিড তৈরীর সর্বোপরি বিক্রিয়াটি হল নিম্নরূপ :-

অ্যাসিটাইল-কোA + 7 ম্যালোনিল-কোA + 14 NADPH + $14H^+$ ⟶ পামিটিক অ্যাসিড + 7 CO_2 + 8 কোA + 14 $NADP^+$ + $7H_2O$

অ্যাসিটাইল-কোA থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরীতে আটটি উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া ঘটে। এটি নিম্নরূপ :-

1) প্রথম বিক্রিয়াটি অ্যাসিটাইল-কোA কার্বক্সিলেজ দ্বারা অনুঘটিত হয় এবং ATP দরকার হয়। এই বিক্রিয়াটি ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষ চালনা করতে শক্তি যোগান দেয়। E. coli ব্যাকটেরিয়ায় অ্যাসিটাইল-কোA কার্বক্সিলেজ এক বহু উৎসেচক যুক্ত কমপ্লেক্স এবং তিনটি প্রোটিন উপাদান নিয়ে গঠিত : বায়োটিন কার্বক্সিল বাহক প্রোটিন (BCCP), বায়োটিন কার্বক্সিলেজ ও কার্বক্সিল ট্রান্সফারেজ। বিক্রিয়ায় প্রথমে বায়োটিন কার্বক্সিলেজের অনুঘটনে BCCP-এর কার্বক্সিলেশন ঘটে। এখানে CO_2 কোভ্যালেন্ট বণ্ড দ্বারা বায়োটিনের নাইট্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়। তারপর CO_2 BCCP থেকে অ্যাসিটাইল-কোA-এর কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং ফলে ম্যালোনিল-কোA তৈরী হয়। এখানে কার্বক্সিলট্রান্সফারেজ ক্রিয়া করে।

প্রাণীকুলার সাইটোসলে এক ভিন্ন প্রকৃতির অ্যাসিটাইল-কোA কার্বক্সিলেজ পাওয়া যায়। ইঁদুরের যকৃত মধ্যস্থ উৎসেচকটি একটি ডাইমার অর্থাৎ দুইটি একই প্রকারের উপএকক নিয়ে গঠিত এবং প্রতি উপএককে একটি বায়োটিন থাকে। এখানে উৎসেচকটি একক কিন্তু বহুকার্যকারী পলিপেপটাইড

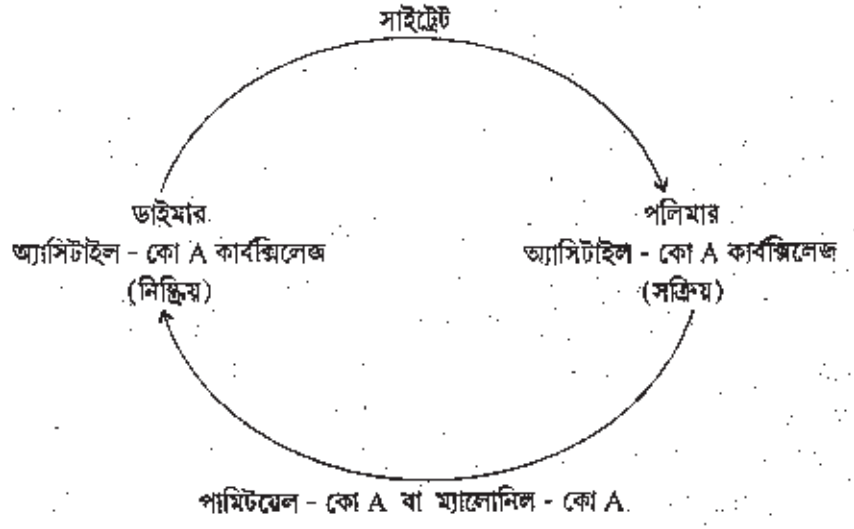

চিত্র 12H : অ্যাসিটাইল - কো A কার্বক্সিলেজের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দশা

রূপে কাজ করে। সাইট্রেটের উপস্থিতিতে উৎসেচকটি সক্রিয় দশা তথা পলিমার তৈরী করে। আবার সক্রিয় উৎসেচক ম্যালোনিল-কোA অথবা পামিটয়েল-কোA-এর উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় ডাইমারে পরিণত হয় (চিত্র12H)।

2) ম্যালোনিল-কোA সংশ্লেষের পর ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের বাকী ধাপগুলি ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ দ্বারা ঘটে। এই উৎসেচক বহু উৎসেচকের কমপ্লেক্স রূপে থাকে। প্রারম্ভে অ্যাসিটাইল-কোA এবং ম্যালোনিল-কোA ঐ প্রোটিন কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত হয়। এখানে অ্যাসিটাইল-কোA ট্রান্স অ্যাসাইলেজ ও ম্যালোনিল-কোA ট্রান্স অ্যাসাইলেজ অনুঘটন করে (ধাপ 1 ও ধাপ 2)। এখানে অ্যাসিটাইল ও ম্যালোনিল গ্রুপের গ্রাহক হল অ্যাসিল বাহক প্রোটিন (ACP)। ACP ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষে সমস্ত অন্তর্বর্তী যৌগের বাহক রূপে কাজ করে। এখানে যে প্রসথেটিক গ্রুপ অন্তর্বর্তী যৌগের সাথে যুক্ত হয়, তা হল কোএনজাইম ফসফোপ্যান্টিথেইন (Phospho- pantetheine)।

এই কোএনজাইম ACP-এর সাথে এস্টার লিঙ্কেজ দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সুতরাং অ্যাসিটাইল-কোA ও ACP-এর বিক্রিয়ায় অ্যাসিটাইলACP (ধাপ 1) তৈরী হয়। আবার, ম্যালোনিল-কোA ও ACP-এর বিক্রিয়ায় ম্যালোনিল-ACP (ধাপ 2) তৈরী হয়।

3) এখন দুইটি ACP-জাত যৌগ ঘনীভূত হয়ে 3-কিটো অ্যাসিল ACP তৈরী করে এবং ACP ও CO_2 নির্গত হয় (ধাপ 3)। এখানে 3-কিটো অ্যাসিল-ACP সিনথেজ অনুঘটন করে এবং অ্যাসিটাইল গ্রুপ উৎসেচকের SH গ্রুপে স্থানান্তরিত হয় ও তারপর অ্যাসিটাইল অংশ ম্যালোনিল-ACP-এর সাথে বিক্রিয়া করে।

4) 3–কিটোঅ্যাসিল–ACP–রিডাকটেজ উৎসেচক ও NADPH-এর সাহায্যে পূর্বে উৎপন্ন যৌগের কার্বনিল গ্রুপ হাইড্রক্সিলে বিজারিত হয় ও ফলে 3–হাইড্রক্সি অ্যাসিল-ACP ও $NADP^+$ তৈরী হয় (ধাপ 4)

5) এখন জল সংযোগ বিক্রিয়ায় 3–হাইড্রক্সি অ্যাসিল ACP–ডিহাইড্রেজ উৎসেচক দ্বারা যৌগ থেকে হাইড্রক্সিল গ্রুপ দূর হয় এবং একটি ট্রান্স ডাবল্ বণ্ড তৈরী হয়। ফলে 2, 3–ট্রান্স-এনয়েল ACP উৎপন্ন হয় (ধাপ 5)।

6) চক্রের চূড়ান্ত বিক্রিয়ায় NADPH এবং 2, 3–ট্রান্স-এনয়েল-ACP–রিডাকটেজ-এর সাহায্যে যৌগের ডাবল্ বন্ডের বিজারণ ঘটে ও ফলে চার কার্বন যুক্ত অ্যাসিল–ACP তৈরী হয় (ধাপ 6) (চিত্র12 I)।

7) এতক্ষণ ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ দ্বারা অনুঘটিত বিক্রিয়াগুলির একটি পূর্ণচক্র সম্পন্ন হল। এখন 6 নং ধাপে সৃষ্ট যৌগের অ্যাসিল গ্রুপ ঘনীভবন উৎসেচক তথা 3–কিটো অ্যাসিল–ACP সিনথেজের সক্রিয় স্থানের SH গ্রুপে স্থানান্তরিত হয়, যেমন প্রথম চক্রে অ্যাসিটাইল গ্রুপের স্থানান্তকরণ হয়েছিল। এরপর অ্যাসিল গ্রুপ ম্যালোনিল-ACP–এর অপর একটি অণুর সাথে বিক্রিয়া করে এবং 3-কিটো অ্যাসিল ACP-সিনথেজ এখানে অনুঘটন করে। ফলে ছয় কার্বন যুক্ত অন্তর্বর্তী পদার্থ তৈরী হয়, যার তৃতীয় কার্বন অবস্থানে কিটোন গ্রুপ আছে। এরপর বিজারণধর্মী বিক্রিয়াগুলি (4 থেকে 6 নং ধাপ) পুনরায় ঘটে এবং একটি ছয় কার্বন যুক্ত অন্তর্বর্তী পদার্থ তথা হেক্সানয়েল--ACP (Hexanoyl-ACP) তৈরী হয়। এই যৌগের হেক্সানয়েল গ্রুপ আবার 3-

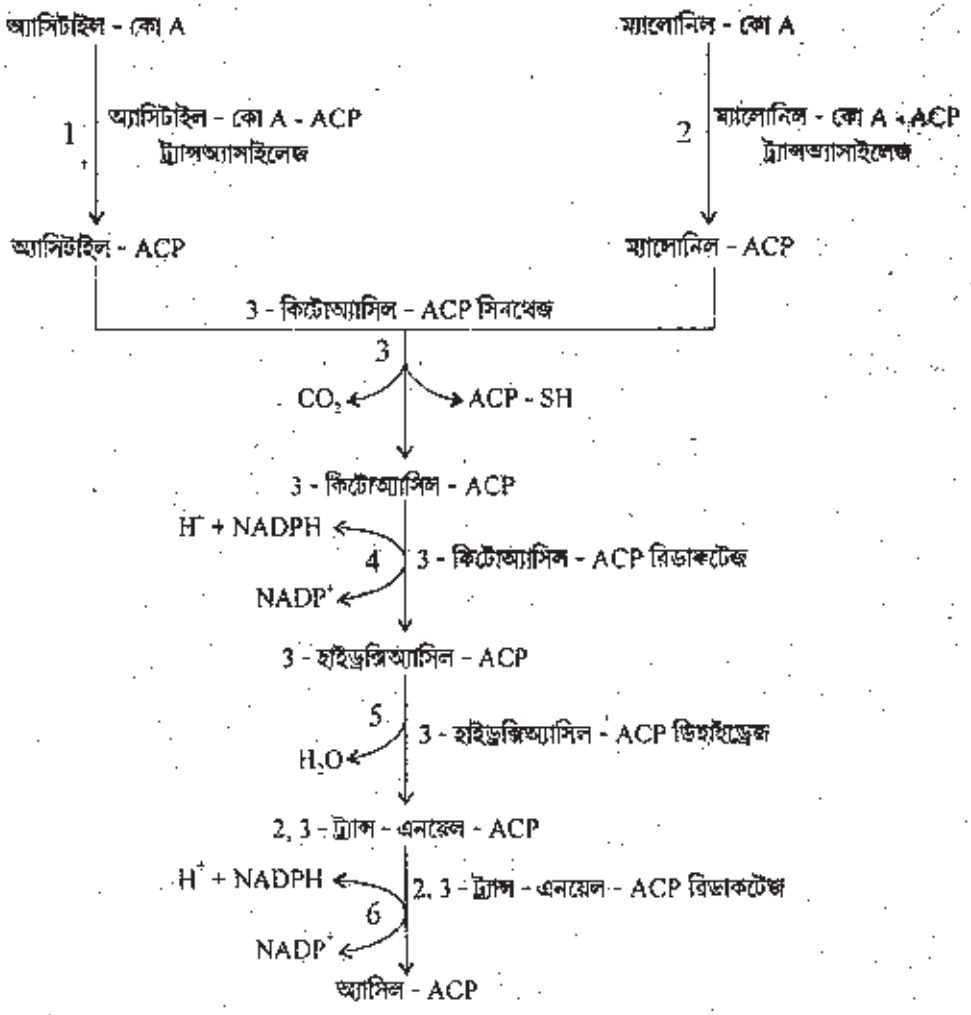

চিত্র 12.1 : ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের প্রারম্ভিক বিক্রিয়াসমূহ

কিটো অ্যাসিল- ACP সিনথেজ উৎসেচকের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং ম্যালোনিল-ACP-এর অপর এক অণুর সাথে ঘনীভূত হয় এবং আবার তিনটি বিজারণ ধর্মী বিক্রিয়াসমূহের (4 থেকে 6 নং ধাপ) মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। এইভাবে বারংবার এই চক্র চলতে থাকে এবং অবশেষে পামিটয়েল -ACP (Palmitoyl-ACP) উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় প্রাণীকোষের মধ্যে থায়োএস্টারেজ উৎসেচকের সাহায্যে পামিটেট (সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড) ACP-এর ফসফোপ্যান্টিথেইন থেকে জলবিশ্লেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু E.coli কোষে পামিটয়েল-ACP সরাসরি ফসফোলিপিড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

12.1.F একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈবসংশ্লেষ

সমস্ত জীবদেহে প্রচুর অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। এর সংশ্লেষ ভিন্ন পথে ঘটে। সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে একটি সিস-ডাবল বণ্ড প্রবেশ করিয়ে একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরী করা হয় এবং এটি দুইটি ভিন্ন পথে ঘটে। একটি অবাত পথ, যেমন *E. coli* তে দেখা যায়। অপরটি সবাত পথ যেমন ইউক্যারিওটে দেখা যায়।

অবাত পথে ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে (দ্বিবন্ধের) ডাবল্ বণ্ডের অন্তর্ভুক্তি অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে। একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষ সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের মত চলতে থাকে, যতক্ষণ না -3–হাইড্রক্সিডেকানয়েল -ACP নামক অন্তবর্তী যৌগ তৈরী হয়। এই পয়েন্টে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষে জড়িত উৎসেচকগুলির মধ্যে এক আপাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এখানে 3-হাইড্রক্সিডেকানয়েল-ACP ডিহাইড্রেজ (3-hydroxydecanoyl-ACP dehydrase) জড়িত হয়। এই উৎসেচক $\alpha - \beta$ ট্র্যান্স ডাবল্ বণ্ড প্রবেশ করাতে পারে এবং তখন সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষ আগের মত চলতে থাকে। এই উৎসেচক আবার সিস $\beta-\gamma$ (বা 2, 3) ডাবল বণ্ড অন্তর্ভুক্তি করতে পারে, ফলে $\beta-\gamma$ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিল-ACP উৎপন্ন হয় এবং এটা ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের স্বাভাবিক উৎসেচক দ্বারা দীর্ঘ হয়ে পামিটোলি অয়েল ACP (Palmitoleoyl-ACP) তৈরী হয়। এর Δ^9 অবস্থানে ডাবল্ বণ্ড থাকে। পরে এই যৌগ থেকে E.coli-এর প্রধান অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড তথা সিস-ভ্যাক্সিনিক অ্যাসিড (cis-vaccenic acid) তৈরী হয়। এটি 18-কার্বনযুক্ত ও Δ^{11}-অবস্থানে ডাবল বণ্ড থাকে। পামিটোলি অয়েল-ACP থেকে ভ্যাক্সিনিল-ACP (vaccenyl-ACP) উৎপাদন 3–কিটোঅ্যাসিল -ACP সিনথেজ II ও সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের স্বাভাবিক উৎসেচকের ক্রিয়ায় ঘটে (চিত্র12J)।

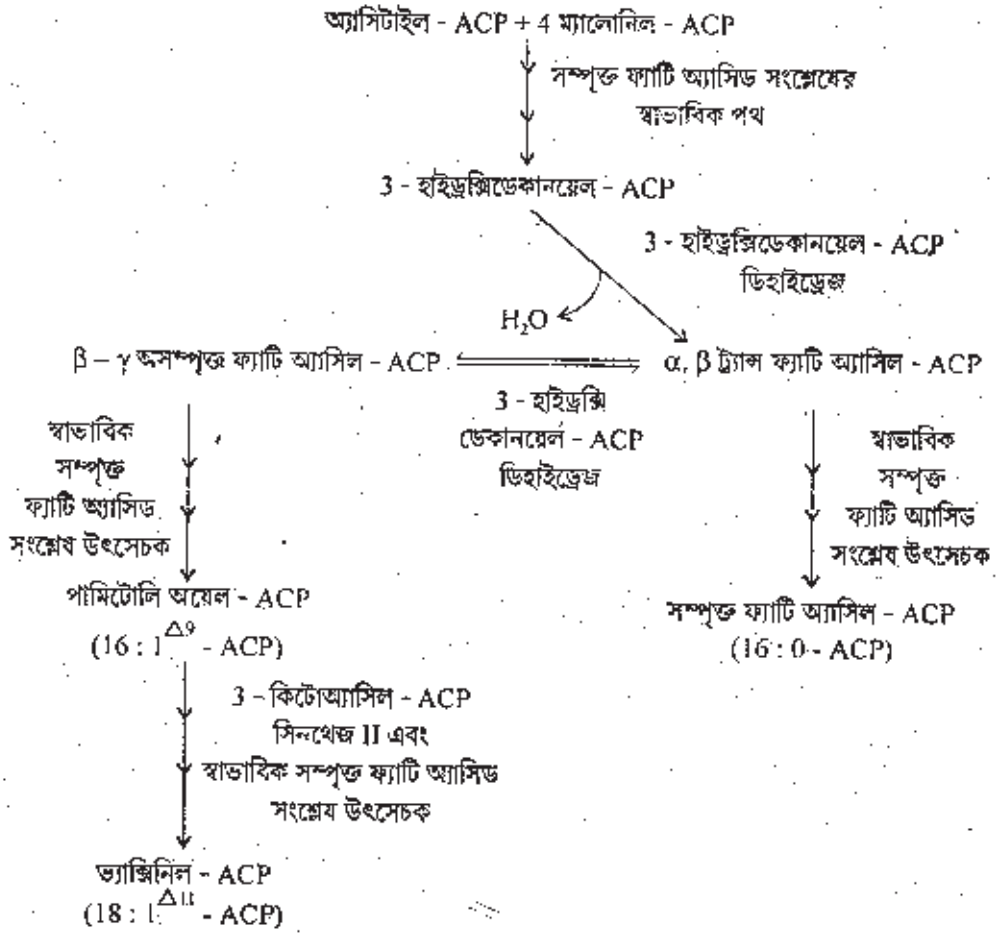

চিত্র 12J ঃ E. coli ব্যাকটেরিয়ায় একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের অবাত পথ

অপরদিকে ইউক্যারিওট কোষে সবাত পথে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের পর ডাবল বন্ধের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। আঠারো কার্বনযুক্ত স্টিয়ারয়েল-কোA (Stearoyl-CoA) অসম্পৃক্তকরণের প্রধান সাবস্ট্রেট। ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ দ্বারা স্টিয়ারিক অ্যাসিড অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় কিন্তু পামিটিক অ্যাসিড হল প্রধান উৎপন্ন পদার্থ। এটি অ্যাসির-কোA সিনথেজ দ্বারা সক্রিয় স্টিয়ারয়েল-কোA তে পরিণত হয়। ইউক্যারিওট কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে অবস্থিত একটি উৎসেচক কমপ্লেক্স স্টিয়ারয়েল-কোA কে ওলিঅয়েল-কোA (Oleyl-CoA) তে অসম্পৃক্ত করে এবং এই বিক্রিয়ায় NADH ও O_2 লাগে। অসম্পৃক্তকরণে দুইটি উৎসেচকের সহযোগিতামূলক ক্রিয়া ঘটে : সাইটোক্রোম b_5-রিডাকটেজ ও স্টিয়ারয়েল-কোA ডিস্যাচুরেজ। তাছাড়া এখানে ইলেকট্রন বাহক প্রোটিন তথা সাইটোক্রোম b_5 লাগে (চিত্র12K)।

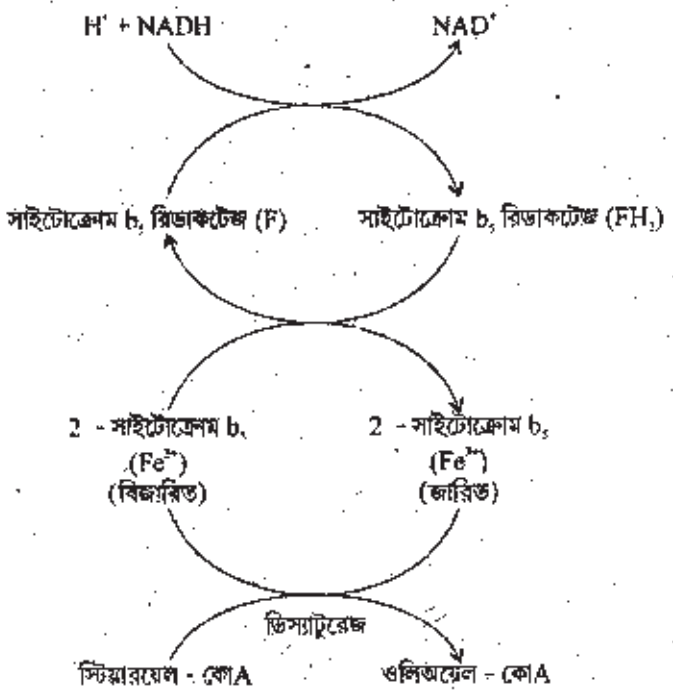

চিত্র 12K : ইউক্যারিওটে ওলিঅয়েল - কোA উৎপাদনের সবাত পথ

12.1.G বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈবসংশ্লেষ

E. coli ব্যাকটেরিয়ায় বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড নেই কিন্তু ইউক্যারিওট প্রাণীরা বিভিন্ন প্রকারের এই ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরী করে। স্তন্যপায়ীরা কেবল ফ্যাটি অ্যাসিড অণুর Δ^9 কার্বন অবস্থান এবং অ্যাসিল শৃঙ্খলের কার্বক্সিল প্রান্তের মাঝে ডাবল বণ্ড প্রবেশ করাতে পারে। স্তন্যপায়ীরা দুইটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড যথা লিনোলিক অ্যাসিড ($18:2^{\Delta 9, 12}$) এবং লিনোলেনিক অ্যাসিড ($18:3^{\Delta 9,12,15}$) সংশ্লেষ করতে পারে না এবং এজন্য খাদ্যের সাথে সরবরাহ প্রয়োজন। এই কারণে এই দুইটি ফ্যাটি অ্যাসিডকে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড (Essential fatty acid) বলে। দেহে লিনোলিক অ্যাসিড থেকে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড (arachidonic acid) ($20:4^{\Delta 5, 8, 11, 14}$) তৈরী হয়। আবার লিনোলেনিক অ্যাসিড থেকে ছয় ডাবল বণ্ড যুক্ত ডোকোসাহেক্সিনয়েক অ্যাসিড ($22:6^{\Delta 4, 7, 11, 14, 17, 20}$)

(Docosahexaenoic acid) উৎপন্ন হয়। এটি প্রচুর পরিমাণে চোখের রেটিনা পর্দার ফসফোলিপিডে থাকে। অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড ও ডোকোসাহেক্সিনয়েক অ্যাসিড উভয়ই যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। এখানে যকৃতের এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে অবস্থিত উৎসেচকগুলি জড়িত হয়। একটি ছকের আকারে লিনোলিক অ্যাসিড থেকে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড সংশ্লেষ দেখান হল (চিত্র12L)।

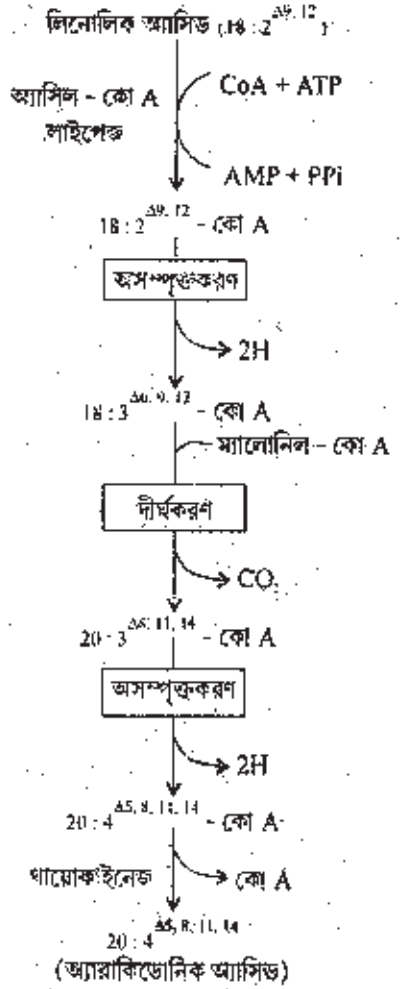

চিত্র 12L : অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড উৎপাদন পদ্ধতি

12.2 প্রশ্নাবলী

12.2.1 দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-

1) সম্পৃক্ত জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন বর্ণনা করুন।

2) সম্পৃক্ত বিজোড় কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন বর্ণনা করুন।

3) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের β–অক্সিডেশন বর্ণনা করুন।

4) আলফা ও ওমেগা অক্সিডেশন বর্ণনা করুন।

5) কিটোন বডি উৎপাদন বর্ণনা করুন।

6) সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ বর্ণনা করুন।

7) একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ বর্ণনা করুন।

8) বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের জৈব সংশ্লেষ বর্ণনা করুন।

12.2.2 সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-

1) β-অক্সিডেশনে ফ্যাটি অ্যাসিডের সক্রিয়করণ লিখুন।

2) β-অক্সিডেশনে কারনিটাইনের ভূমিকা লিখুন।

3) মাইটোকনড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে β-অক্সিডেশনের ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

4) প্রোপায়োনিল-কোA থেকে সাক্সিনিল-কোA উৎপাদন ধাপগুলি লিখুন।

5) একটি একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (ওলিক অ্যাসিড) β-অক্সিডেশনের ধাপ উল্লেখ করুন।

6) একটি বহু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (লিনোলিক অ্যাসিড) β-অক্সিডেশনের ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

7) কিটোন বডি সংশ্লেষের ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

8) ফ্যাটি অ্যাসিড সংশ্লেষের প্রারম্ভিক বিক্রিয়াগুলি উল্লেখ করুন।

9) ব্যাকটেরিয়ায় একক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সংশ্লেষের অবাত পথের ধাপগুলি লিখুন।

10) লিনোলিক অ্যাসিড থেকে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড উৎপাদন পদ্ধতির ধাপ উল্লেখ করুন।

12.2.3 অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-

1) β-অক্সিডেশন বলতে কী বোঝায়?

2) α-অক্সিডেশন বলতে কী বোঝায়?

3) ওমেগা অক্সিডেশন বলতে কী বোঝায়?

4) ফ্যাটি-অ্যাসিল-কোA কী?

5) কারনিটাইন কী?

6) β-অক্সিডেশনে শক্তি উৎপাদন কত হয়?

7) কিটোন বডি কী?

8) একটি সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের নাম লিখুন।

9) দুইটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের নাম লিখুন।

12.3 উত্তরমালা

12.3.1 1) 12.1A (a) দেখুন।

2) 12.1A (b) দেখুন।

3) 12.1 A (c) দেখুন।

4) 12.1 B দেখুন।

5) 12.1 C দেখুন।

6) 12.1 E দেখুন।

7) 12.1 F দেখুন।

8) 12.1 G দেখুন।

12.3.2 1) 12.1 A (a) 1 দেখুন।

2) 12.1 A (a) 2 দেখুন।

3) 12.1 A (a) 3 দেখুন।

4) চিত্র 12 (C) দেখুন।

5) চিত্র 12 (D) দেখুন।

6) চিত্র 12 (E) দেখুন।

7) চিত্র 12 (G) দেখুন।

8) চিত্র 12 (I) দেখুন।

9) 12.1 F দেখুন।

10) চিত্র 12 (L) দেখুন।

12.3.3 1) ফ্যাটি অ্যাসিডের 3 নম্বর স্থানের কার্বনের জারণকে β–অক্সিডেশন বলে।

2) ফ্যাটি অ্যাসিডের 2 নম্বর স্থানের কার্বনের জারণকে α–অক্সিডেশন বলে।

3) ইঁদুরে যকৃত মাইক্রোজোমে ফ্যাটি অ্যাসিডের সাইটোক্রোম P–450–NADPH সহ ω (ওমেগা) হাইড্রক্সিল উৎসেচক এবং আণবিক অক্সিজেনের ক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের ω –কার্বন বা প্রান্তীয় মিথাইল গ্রুপের জারণ ঘটে। একে ω –অক্সিডেশন বলে।

4) ফ্যাটি অ্যাসিড ATP ও কো-এনজাইম A-এর উপস্থিতিতে থায়োকাইনেজ (অ্যাসিল-কোA সিনথেটেজ) উৎসেচকের সাহায্যে সক্রিয় অন্তর্বর্তী যৌগ তথা ফ্যাটি অ্যাসিল CoA তৈরী করে।

5) কারনিটাইন একটি বাহক। এটি β–হাইড্রক্সি γ– ট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম বিউটাইরেট।

6) 942 Kcal শক্তি উৎপন্ন হয়।

7) অ্যাসিটো অ্যাসিটেট, β–হাইড্রক্সি বিউটাইরেট এবং অ্যাসিটোনকে একত্রে বলে কিটোন বডি।

8) পামিটেট।

9) লিনোলিক অ্যাসিড এবং লিনোলেনিক অ্যাসিড।

একক 13 □ প্রোটীন বিপাক ও ইউরিয়া চক্র (Protein metabolism and Urea cycle)

13.0 প্রস্তাবনা

13.1 উদ্দেশ্য

13.2 দেহস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভান্ডার (amino acid pool)

13.3 দেহের নাইট্রোজেন সমতা (Nitrogen Balance)

13.4 অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক

- 13.4.1 অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতি
- 13.4.2 অ্যামাইনো অ্যাসিডের অপচিতি
  - 13.4.2.1 NH_2 গ্রুপের অপসারণ
  - 13.4.2.2 COOH গ্রুপের অপসারণ (Decarboxylation)
- 13.4.3 ট্রান্স অ্যামাইনেশন (Transamination)
- 13.4.4 ডিঅ্যামাইনেশন (Deaminations)
- 13.4.5 ইউরিয়া চক্র((Urea cycle)

13.5 অ্যামোনোটেলিক, ইউরিকোটেলিক ও ইউরিয়োটেলিক প্রাণীকুল

13.6 সারাংশ

13.7 অনুশীলনী

13.8 উত্তরমালা

13.0 প্রস্তাবনা

প্রোটীন নামক জীবিয় অণুটি (Biomolecule) জীবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৈচিত্র্যময় এই প্রোটীনে সাধারণত কুড়ি প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড দেখা যায়। অ্যামাইনো অ্যাসিড অণুগুলি পরস্পর পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা যুক্ত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার বা প্রোটীন গঠন করে। আমাদের খাদ্যস্থ প্রোটীন অন্ত্রের বিভিন্ন উৎসেচক দ্বারা জলবিশ্লেষিত হয়ে মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড অন্ত্রের গাত্র দ্বারা শোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে এবং দেহ মধ্যস্থ বিপাকে (intermediary metabolism) অংশগ্রহণ করে। উপচিতিমূলক বিপাককালে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড সরাসরি বা অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার দেহোপযোগী প্রোটীন সংশ্লেষ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রাণিদেহ সংশ্লেষ করতে পারেনা। এই অপরিহার্য বা essential অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি আমাদের খাদ্যে অবশ্যই থাকা দরকার। (সারণী - 1)।

সারণী - 1 অপরিহার্য ও অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড (মানুষের)

পুষ্টিগতভাবে অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড	পুষ্টিগতভাবে অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড
* আর্জিনিন (Arg)	অ্যালানিন (Ala)
* হিস্টিডিন (His)	অ্যাসপারাজিন (Asn)
আইসোলিউসিন (Ile)	অ্যাসপারটেট (Asp)
লিউসিন (Leu)	সিসটাইন (Cys)
লাইসিন (Lys)	গ্লুটামেট (Glu)
মিথিওনিন (Met)	গ্লুটামিন (Gln)
ফিনাইল অ্যালানিন (Phe)	গ্লাইসিন (Gly)
থ্রিওনিন (Thr)	প্রোলিন (Pro)
ট্রিপটোফ্যান (Trp)	সেরিন (Ser)
ভ্যালিন (Val)	টাইরোসিন (Tyr)
* এগুলি দেহে খুব কম পরিমানে সংশ্লেষিত হয় এবং শিশুর বৃদ্ধিকালে খাদ্যে থাকা প্রয়োজন। এদের **Semi essential** অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে।	

অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে অনপরিহার্য বা nonessential অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। এগুলি গৃহীত খাদ্যে অনুপস্থিত থাকলেও দেহ অন্য অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে এগুলি সংশ্লেষে সমর্থ হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিডের অপচিতি মূলক বিপাকক্রিয়া প্রধানত NH_2 গ্রুপের অপসারণ বা COOH গ্রুপের অপসারণ দ্বারা সংঘটিত হয়। ট্রান্স অ্যামাইনেশন, ডিঅ্যামাইনেশন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় NH_2 গ্রুপের অপসারণ ঘটে। এই NH_2 গ্রুপ কোনো কিটো অ্যাসিডকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে, বা অতিরিক্ত NH_2 দ্বারা ইউরিয়া নামক

রেচন পদার্থ সংশ্লেষ করে। ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত কার্বন কাঠামো ক্রেবস চক্রের মাধ্যমে জারিত হয়ে CO_2 উৎপন্ন করে বা গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত হয় অথবা কিটোন বডি উৎপন্ন করে। চিত্র (13.1) এ প্রোটিন বিপাকের প্রধান প্রধান পথ ও তাদের দ্বারা উৎপাদিত পদার্থগুলি দেখানো হল।

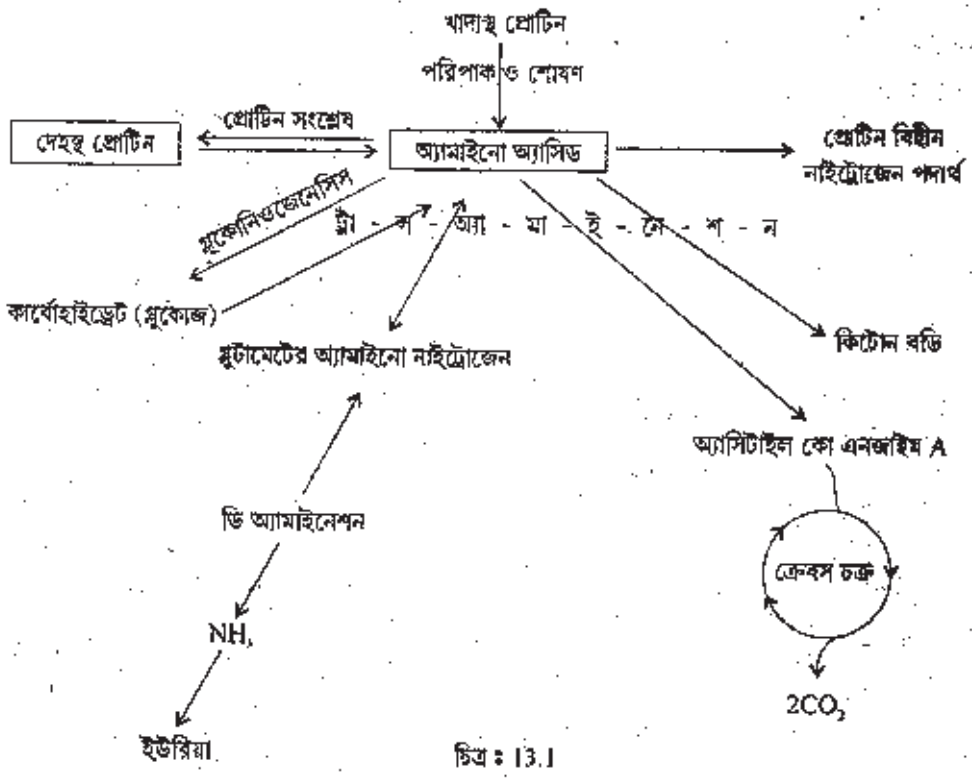

চিত্র : 13.1

13.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- প্রোটিনের দেহমধ্যস্থ বিপাক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দেহস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিডের আধার সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- দেহের নাইট্রোজেনের সমতা সম্বন্ধে ধারণা পাবেন।
- অপরিহার্য ও অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড কি তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতিমূলক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করবেন।
- ট্রান্স অ্যামাইনেশন ও ডিঅ্যামাইনেশন পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবেন।
- দেহে ইউরিয়া সংশ্লেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

13.2 দেহস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভান্ডার (Amino Acid Pool)

আমরা আমাদের শরীরের প্লাজমা ও কলারসে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি ভান্ডার বা আধারের কল্পনা করতে পারি যাকে 'অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল' বলে। বিভিন্ন দেহকলা তাদের প্রোটীনের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এখান থেকে সংগ্রহ করে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেহকলা বিনষ্ট হবার সময় বা প্রোটিনের ভাঙ্গনের ফলে উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড এই আধারে বর্জন করে।

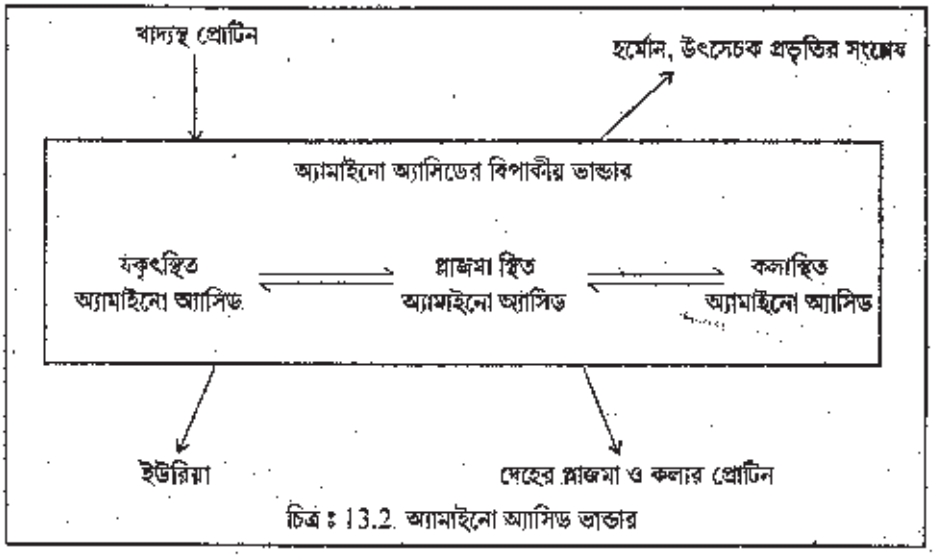

চিত্র : 13.2. অ্যামাইনো অ্যাসিড ভান্ডার

এই কাল্পনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড ভান্ডারের আয়তন কার্যত ধ্রুবক থাকে। এই ভান্ডারে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমান বৃদ্ধি পেলে দেহের বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ায় এই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে NH_2 গ্রুপটি বিযুক্ত হয়ে ইউরিয়া উৎপন্ন করে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের NH_2 গ্রুপ বিযুক্ত কিটো অ্যাসিড অংশ কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড বিপাকে অংশগ্রহণ করে বা কোনো নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যগ্রহণের অব্যবহিত পরেই যকৃৎ খুব দ্রুত পোর্টাল শিরা থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্রহণ করে এবং গৃহীত অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতি বা অপচিতি মূলক বিপাক সম্পন্ন করে ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড ভান্ডারের কোনো রূপ আপাত পরিবর্তন হয়না।

13.3 দেহের নাইট্রোজেন সমতা

1930 এর দশকে জার্মান বিজ্ঞানী (Rudolf Schönheimer) দেহের নাইট্রোজেন সমতা সংক্রান্ত একটি সুন্দর পরীক্ষা করেন। তিনি একটি কুকুরকে ^{15}N সমন্বিত অ্যামাইনো অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করেন। পরবর্তী কয়েকদিন কুকুরটির মূত্র থেকে প্রাপ্ত ইউরিয়া বিশ্লেষণ করে দেখেন সেখানে ^{15}N অনুপস্থিত। কিন্তু এই অবস্থায় কুকুরটির যকৃৎ, মাংসপেশী ও অন্যান্য যন্ত্র পরীক্ষা করে সেখানে ^{15}N নাইট্রোজেনের সন্ধান পান। এই পরীক্ষা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে খাদ্য প্রোটিনস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড দেহের প্রোটীনের অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সরিয়ে দেহপ্রোটীনে যুক্ত হয়েছে। অপরদিকে দেহস্থ প্রোটীনের অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে বিপাকের

ফলে মূত্রে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় দেহে মোট অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমান সমান থাকলেও এগুলি খাদ্যপ্রোটিনস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে শরীরে নাইট্রোজেনের একটি গতিশীল সাম্য বা 'dynamic equilibrium' অবস্থা রক্ষিত হয়।

দেহের মোট গৃহীত নাইট্রোজেন ও মল, মূত্র প্রভৃতি দ্বারা নিষ্কাশিত নাইট্রোজেনের বিয়োগফলকেই দেহের নাইট্রোজেন সমতা (Nitrogen balance) বলে। শিশুদের বৃদ্ধি দশায় এবং গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে রেচিত নাইট্রোজেন অপেক্ষা গৃহীত নাইট্রোজেনের পরিমান বেশী হয়। একে ধনাত্মক নাইট্রোজেন সমতা (Positive Nitrogen balance) বলে। স্বাভাবিক বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে দুটির মান সমান হওয়ায় একে নাইট্রোজেন সাম্য (Nitrogen equilibrium) দশা বলে। অপরদিকে বিভিন্ন রোগে দেহ প্রোটীন ক্ষয়কালে, অনশনকালে, শল্যচিকিৎসার অব্যবহিত পরে, ক্যানসার রোগের শেষ দশায় বা কোয়াশিওরকর (Kwashiorkor) ও ম্যারাসমাস (Marasmus) ইত্যাদি রোগে যেখানে প্রোটীন সমৃদ্ধ খাদ্যের আত্তীকরণ অসম্পূর্ণ প্রকৃতির হয় সেখানে রেচিত নাইট্রোজেনের পরিমান গৃহীত নাইট্রোজেনের পরিমান অপেক্ষা বেশী হয়। একে ঋণাত্মক নাইট্রোজেন সমতা (Negative Nitrogen balance) বলে। একজন স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন দেহের মোট প্রোটিনের 1 - 2% বিনষ্ট হয় (সাধারণত মাংসপেশীর প্রোটীন)। এরফলে উদ্ভূত অ্যামাইনো অ্যাসিডের 75 - 80% নতুন প্রোটীন সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট 20 - 25% অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেন ইউরিয়া হিসাবে রেচিত হয় এবং কার্বন কাঠামো ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়কররূপে ব্যবহৃত হয়।

13.4 অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক

অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক সামগ্রিকভাবে লিপিড ও কার্বোহাইড্রেট বিপাকের অনুরূপ। কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাককেও পাঁচটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা পরিপাক, পরিবহন, সঞ্চয়, ক্ষয়ীভবন ও জীবিয় সংশ্লেষ (Digestion, transport, storage, degradation and biosynthesis)। প্রোটিন খাদ্যের পরিপাকের ফলে উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে শোষিত হয়ে রক্তে মিশ্রিত হয়। প্রোটিন, প্রোটিওজ, পেপ্‌টোন্ বা পলিপেপটাইডস কখনই শোষিত হয়না। তবে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। সদ্যোজাত শিশুর মায়ের স্তন্য নিঃসৃত কলোস্ট্রাম (Colostrum) ইমিউনোগ্লোবিউলিন বা অ্যান্টিবডি নামক পেপটাইড সমৃদ্ধ হয়। এই পেপ্‌টাইড্‌স গুলি সরাসরি শিশুর অন্ত্রে শোষিত হয়ে রক্তে মিশ্রিত হয়। রক্তরস ও কলারসে অ্যামাইনো অ্যাসিড সাধারণ, প্লাজমা প্রোটীন, লাইপোপ্রোটীন, নিউক্লিওপ্রোটীন, পেপটাইড্‌স্ বা মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড রূপে পরিবাহিত হয়। পরবর্ত্তী বিপাকীয় পর্যায়ে এই নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগগুলি বিশ্লিষ্ট হয় বা সংশ্লেষিত হয়।

13.4.1 অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতি

উদ্ভিদ ও অণুজীবসমূহ কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রত্যেকটিই সংশ্লেষ করতে পারে। তবে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা এগুলির মধ্যে প্রায় দশটি সংশ্লেষে অসমর্থ থাকে এবং বাকী দশটি নিজ দেহে সংশ্লেষ করে।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের জীবিয় সংশ্লেষ বৈচিত্র্যময়। এদের সংশ্লেষ প্রক্রিয়া জীবভেদে ভিন্ন প্রকারের হয়। তবে একটি ব্যাপারে এদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এদের প্রত্যেকের কার্বন কাঠামোটি আমাদের সাধারণ

বিপাকীয় বিক্রিয়াসমূহ যথা গ্লাইকোলাইসিস, . T. C. A চক্র ও পেনটোজ ফসফেট বিক্রিয়া পথের অন্তর্বর্তী বিক্রিয়ক পদার্থ থেকে সংগৃহীত হয়। কোন অন্তর্বর্তী বিক্রিয়ক থেকে এরা উৎপন্ন হয় তা বিবেচনা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ বিক্রিয়া পথকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় - (চিত্র - 13.3)

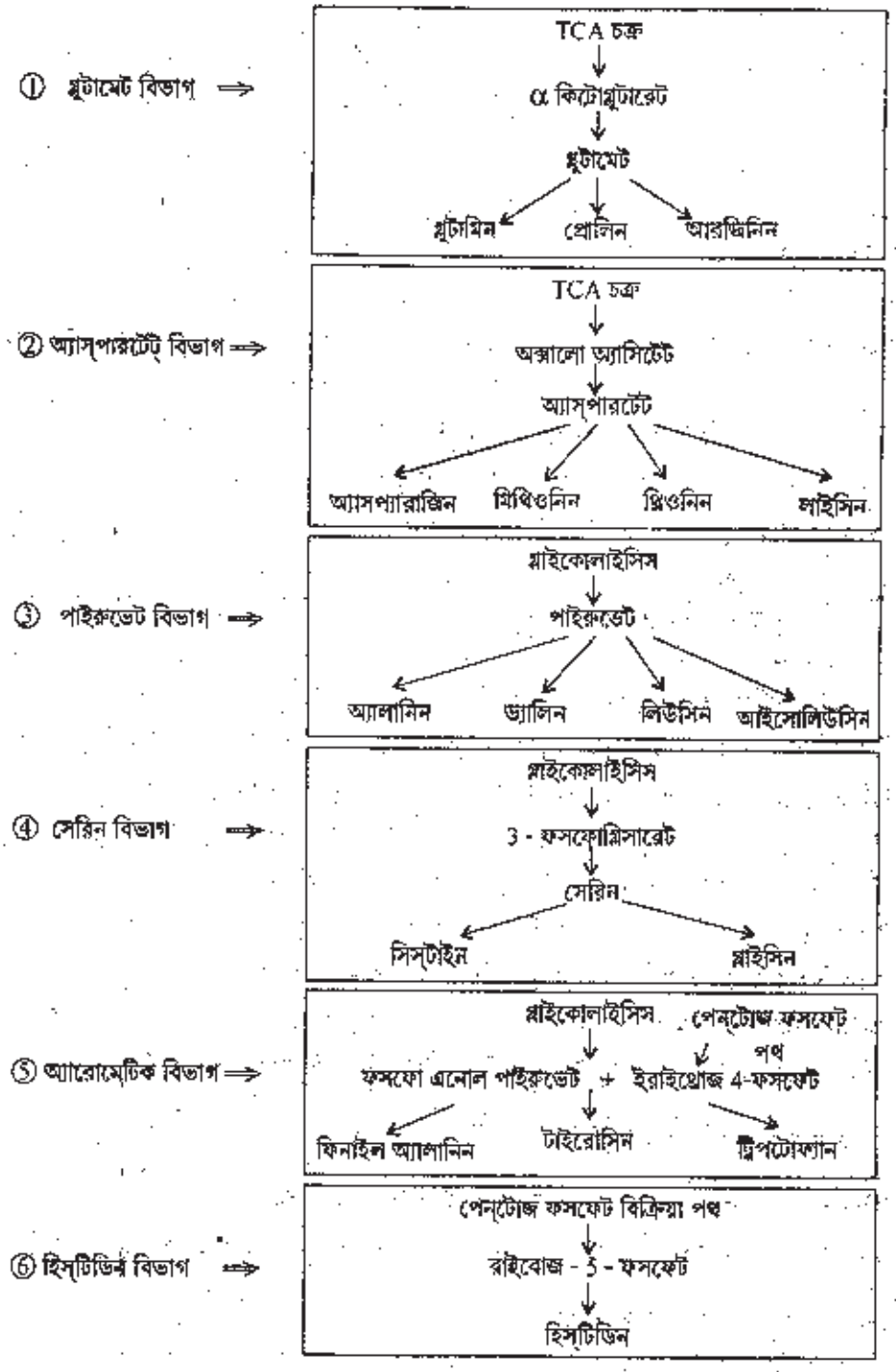

চিত্র - 13.3

উক্ত সংশ্লেষ বিক্রিয়ায় গ্লুটামেট থেকে গ্লুটামিন এবং অ্যাসপারটেট থেকে অ্যাসপ্যারাজিন সংশ্লেষকারী উৎসেচকগুলি হল যথাক্রমে গ্লুটামিন সিন্থেজ এবং অ্যাসপারাজিন সিন্থেজ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্লুটামিন সিন্থেজ একটি অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক (allosteric enzyme) এবং যা সম্পূর্ণ নাইট্রোজেন বিপাককে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে গ্লুটামিন হল অ্যামোনিয়ার সংগ্রাহক ও বিভিন্ন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় NH_2 গ্রুপ দাতা।

অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতিমূলক ব্যবহার —

1) ব্যবহারের ফলে যেসব দেহস্থ প্রোটীন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেগুলির সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড উপচিতিমূলক বিপাককালে সংগৃহীত হয়।

2) শিশুর বৃদ্ধি দশায় নিত্যনতুন অতিরিক্ত প্রোটীনের প্রয়োজন হয়।

3) শারীরিক অনুশীলনকারী ব্যক্তির সুঠাম মাংসপেশী গঠনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতিমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

4) প্যানক্রিয়াস, প্যারাথাইরয়েড, হাইপোথ্যালামাস প্রভৃতি গ্রন্থিতে হর্মোন উৎপাদন কালে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

5) প্রায় অধিকাংশ উৎসেচক প্রোটীন দ্বারা গঠিত। উৎসেচক সংশ্লেষে অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।

6) গ্লাইসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড হিমোগ্লোবিন বা মায়োগ্লোবিন রঞ্জকের হিম (Heme) অংশের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

7) টাইরোসিন আমাদের শরীরের মেলানিন রঞ্জক (দেহত্বকের একপ্রকার রঞ্জক) সংশ্লেষে বিক্রিয়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

8) শরীরের কিছু প্রয়োজনীয় সক্রিয় অ্যামাইনস (active amines) যথা এপিনেফ্রিন, হিস্টামিন, সেরোটনিন প্রভৃতি বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে সংশ্লেষিত (এপিনেফ্রিন, হিস্টামিন) ও সেরোটনিন যথাক্রমে টাইরোসিন, হিস্টিডিন ও ট্রিপটোফ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়।

9) দুগ্ধদানকারী মহিলার দুগ্ধ সংশ্লেষে প্রোটীন প্রয়োজন হয়।

10) গ্লুটামিক অ্যাসিড, সিসটাইন ও গ্লাইসিন সমন্বয়ে গঠিত গ্লুটাথায়ন (Glutathione) নামক ট্রাইপেপটাইডটি SH গ্রুপের জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

11) ফোলেট কো-এনজাইমের গঠনগত উপাদান হিসাবে গ্লুটামিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়।

13.4.2 অ্যামাইনো অ্যাসিডের অপচিতি (Catabolism of Amino acids)

13.4.2.1 NH_2 গ্রুপের অপসারণ

আমাদের দেহ কখনই প্রয়োজনাতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড সঞ্চয় করতে পারে না। উপরন্তু দেহে প্রতিনিয়ত প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে। ফলে দেহস্থ অ্যামাইনো অ্যাসিডের অপচিতি বা ভাঙ্গন একটি নিয়ত প্রক্রিয়া। অপচিতিমূলক বিপাক কালে প্রথমেই NH_2 গ্রুপটি অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে বিযুক্ত হয় এবং যা প্রধানত ইউরিয়া সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের NH_2 গ্রুপ বিহীন কার্বন কাঠামো পাইরুভেট, অ্যাসিটাইল কো এনজাইম A, অ্যাসিটো

অ্যাসিটাইল কো এনজাইমA, α-কিটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল কো এনজাইম A, ফিউমারেট ও অক্সালো অ্যাসিটেট উৎপন্ন করে (চিত্র 13.4)। এগুলি সকলে কিটো অ্যাসিড প্রকৃতির। এগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

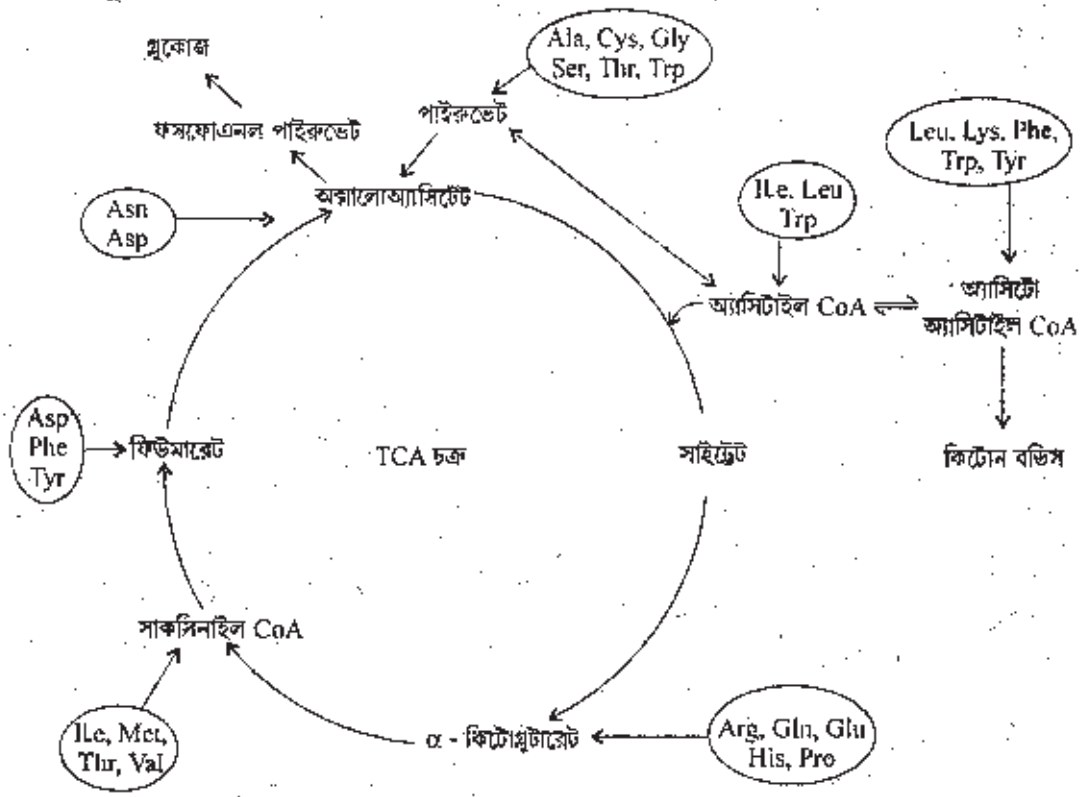

চিত্র 13.4 ঃ বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের NH_2 গ্রুপ বিহীন কার্বন কাঠামোর পরিণাম

1) গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড (Glucogenic amino acids)

যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত কিটো অ্যাসিড গুলি (পাইরুভেট, α কিটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল C.A, ফিউমারেট ও অক্সালো অ্যাসিটেট) গ্লুকোজ সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় তাদের গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে।

2) কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড (Ketogenic amino acids)

যে সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত অ্যাসিটাইল CoA ও অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল CoA কিটোন বডিস সংশ্লেষে ব্যবহৃত হয় তাদের কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন উক্ত অ্যাসিটাইল CoA ও অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল CoA থেকে লিপিডও সংশ্লেষিত হয়।

উল্লিখিত কুড়িটি সাধারণভাবে প্রাপ্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে লিউসিন (Leu) ও লাইসিন (Lys) কেবল কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড রূপে ব্যবহৃত হয়। Ile, Phe, Trp এবং Tyr অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি গ্লুকোজেনিক ও কিটোজেনিক উভয়রূপেই পরিগণিত হয়। এগুলি ছাড়া

বাকী যে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে (মোট 14টি) সেগুলি কেবল গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড রূপে ব্যবহৃত হয়।

13.4.2.2 COOH গ্রুপের অপসারণ (Decarboxylation)

কতিপয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের COOH গ্রুপ ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়ায় অপসারিত হলে অ্যামাইনস উৎপন্ন হয়। ডিকার্বোক্সিলেজ নামক উৎসেচক এই বিক্রিয়ায় অনুঘটকে কাজ করে

$$RCHNH_2COOH \xrightarrow{\text{decarboxylase}} RCH_2NH_2$$

(Amino acid) (Amine)

বেশ কয়েকটি দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইন্‌স্ উক্ত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ (i) হিস্টামিন (হিস্টিডিন থেকে) (ii) সেরোটনিন বা 5-হাইড্রোক্সিট্রিপটামিন (ট্রিপটোফ্যান থেকে), (iii) টাইরামিন (টাইরোসিন থেকে) (iv) অ্যাড্রিন্যালিন, নর অ্যাড্রিনালিন, ডোপামিন প্রভৃতি 3, 4-ডাই হাইড্রক্সিফিনাইল অ্যালানিন (DOPA) থেকে উৎপন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই DOPA পুনরায় ফিনাইল অ্যালানিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে উৎপন্ন হয়।

13.4.3 ট্রান্স অ্যামাইনেশন (Trans amination)

- অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাক ক্রিয়ায় ট্রান্স অ্যামাইনেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। প্রায় সকল অ্যামাইনো অ্যাসিডএই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কোষীয় নাইট্রোজেন যুক্ত যৌগগুলির আন্তঃরূপান্তরকরণে এই প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

- যে বিপাক ক্রিয়ায় একটি দাতা অ্যামাইনো অ্যাসিডের α কার্বন থেকে NH_2 গ্রুপ অপর একটি গ্রহীতা কিটো অ্যাসিডে স্থানান্তরিত হয় এবং ফলস্বরূপ উক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডটি কিটো অ্যাসিডে এবং গ্রহীতা কিটো অ্যাসিডটি অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় তাকে ট্রান্স অ্যামাইনেশন বলে। এই বিক্রিয়া প্রধানত যকৃতে ঘটে।

ট্রান্স অ্যামাইনেশনের সাধারণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ-

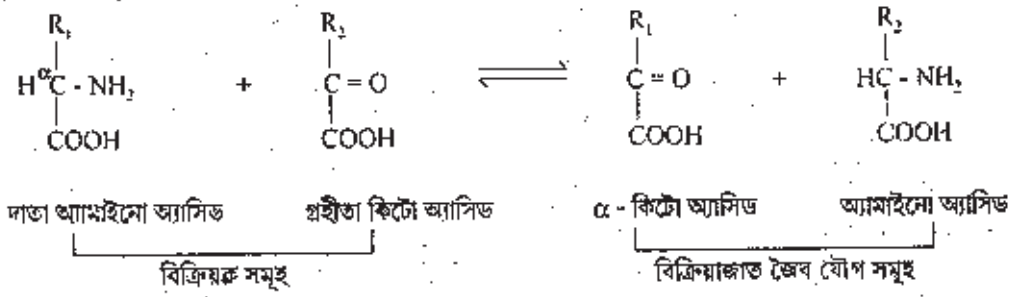

- ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় উৎসেচক ও তার ক্রিয়া পদ্ধতি -

ট্রান্স অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত উৎসেচকগুলিকে একত্রে ট্রান্স অ্যামাইনেজ (Transaminases) বা অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ (aminotransferase) বলে। এই সকল উৎসেচকে পাইরিডক্সাল ফস্‌ফেট বা PLP (Pyridoxal phosphate) ও পাইরিডক্সামিন ফস্‌ফেট বা PMP (Pyridoxamine phosphate) কোএনজাইম বা সহউৎসেচক রূপে কাজ করে। এই সহউৎসেচকগুলি ভিটামিন B_6 (পাইরিডক্সিন / পাইরিডক্সাল/পাইরিডক্সামিন) থেকে সংশ্লেষিত হয়।

ট্রান্স অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ায় PLP ও PMP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দাতা অ্যামাইনো অ্যাসিডটি (AA_2) উৎসেচকের লাইসিন অণুর সঙ্গে লেগে থাকা PLP কে অপসারিত করে এবং অ্যালডিমিন (aldimine) নামক 'অ্যামাইনো অ্যাসিড PLP' Schiff base গঠন করে। এটি পুনরায় Quinonoid নামক অন্তর্বর্তী অস্থায়ী যৌগের মাধ্যমে কেটামিন (Ketimine) নামক 'কিটো অ্যাসিড PMP' Schiff base গঠন করে। এটি পরে জলবিশ্লেষিত হলে গৃহীত অ্যামাইনো অ্যাসিডটি কিটো অ্যাসিডে (KA_1) পরিণত হয় এবং PMP মুক্ত হয়। এই সম্পূর্ণ বিক্রিয়াপথগুলি বিপরীতমুখী হলে গ্রহীতা কিটো অ্যাসিড (KA_2) থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড (AA_2) উৎপন্ন হয়। নিম্নে সম্মুখবর্তী বিক্রিয়াপথটি দেখানো হল :-

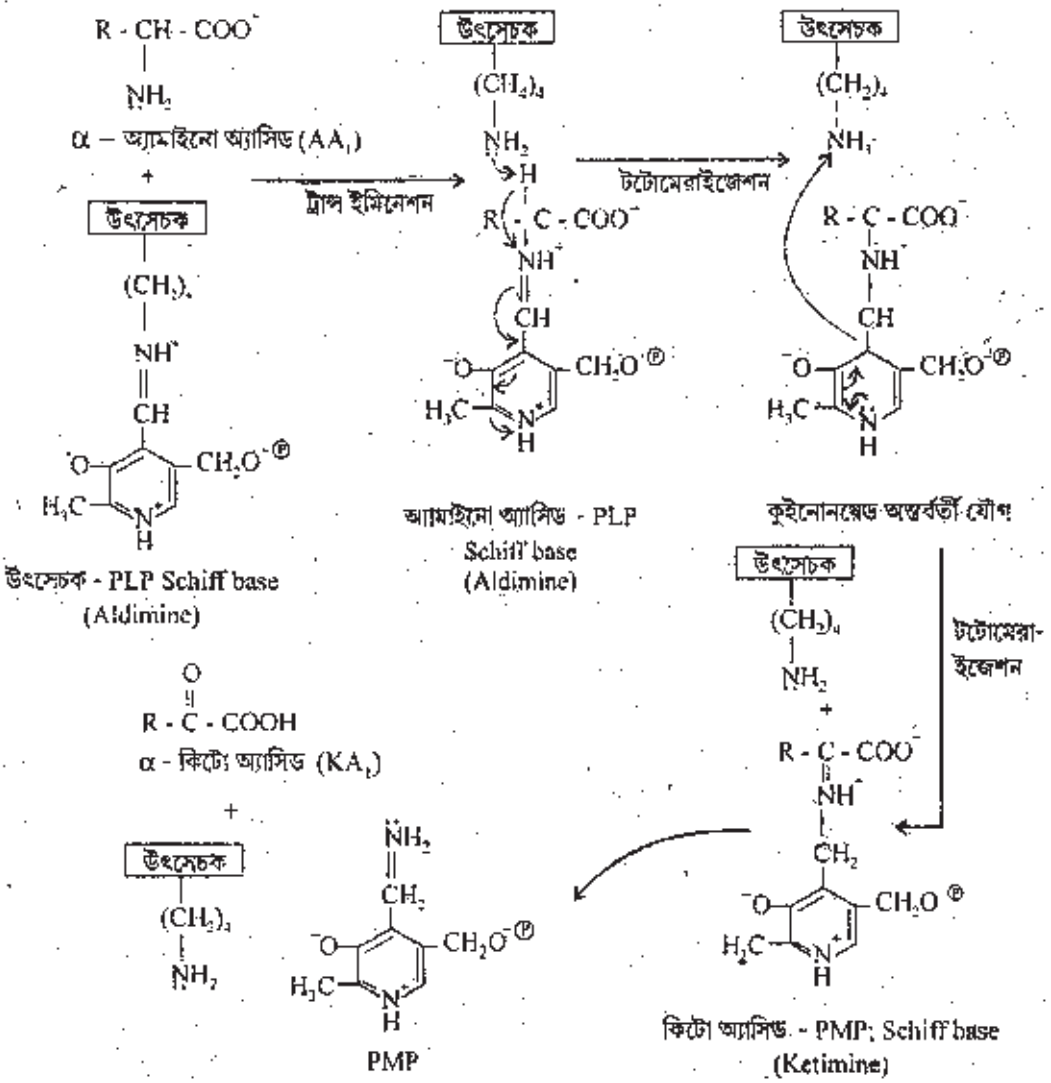

সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি হল $\longrightarrow$

$$AA_1 + PLP \rightleftharpoons KA_1 + PMP$$
$$KA_2 + PMP \rightleftharpoons AA_2 + PLP$$
$$\overline{AA_1 + KA_2 \rightleftharpoons KA_1 + AA_2}$$

SGOT ও SGPT

গ্লুটামেট অক্সালো অ্যাসিটেট ট্রান্স অ্যামাইনেজ বা GOT (Glutamate Oxaloacetate transaminase) এবং গ্লুটামেট পাইরুভেটট্রান্স অ্যামাইনেজ বা GPT (Glutamate-Pyruvate transaminase) হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্স অ্যামাইনেজ জাতীয় উৎসেচক। এদের বিক্রিয়া পথ নিম্নে দেখানো হল ঃ-

গ্লুটামেট + অক্সালো অ্যাসিটেট $\xrightleftharpoons{GOT}$ α- কিটোগ্লুটারেট + অ্যাসপারটেট

গ্লুটামেট + পাইরুভেট $\xrightleftharpoons{GPT}$ α- কিটোগ্লুটারেট + অ্যালানাইন

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই উৎসেচকদুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রক্তরসে (Serum) এগুলির (Serum Glutamate-Oxaloacetate transaminase বা SGOT এবং Serum Glutamate-Pyruvate transaminase or SGPT) পরিমান খুবই কম। অপরদিকে হৃৎপিন্ড ও যকৃতে এগুলি উচ্চমাত্রায় থাকে। হৃৎপিন্ডের Myocardial infarction বা heart attack বা যকৃতের প্রদাহজনিত ক্ষয়ের ফলে SGOT ও SGPT রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্তে এদের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে চিকিৎসক দেহের অন্যান্য রোগ লক্ষণ ও এই উৎসেচকগুলির মাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে হৃৎপিন্ডের বা যকৃতের রোগের মাত্রা নির্ধারণ করেন।

দেহস্থ বিপাকে ট্রান্স অ্যামাইনেশনের গুরুত্ব ঃ

1) দেহে নাইট্রোজেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ট্রান্স অ্যামাইনেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেন ব্যবহারের তিনটি স্তর হল —

প্রথম স্তর ঃ অ্যামোনিয়া সংশ্লেষ ঃ জীবে এটি দুভাবে ঘটে যথা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন (Nitrogen fixation) ও নাইট্রেট অ্যাসিমিলেশন (Nitrate assimilation)

দ্বিতীয় স্তর ঃ অ্যামোনিয়ার ব্যবহার (Utilization of ammonia) জীব জগতে এটি অ্যামোনিয়া ফিক্সেশন (Ammonia fixation) এর মাধ্যমে হয়।

তৃতীয় স্তর ঃ নাইট্রোজনের স্থানান্তরণ (Nitrogen transfer) ঃ জীবদেহে ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি ঘটে যার ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়াও বহুবিধ নাইট্রোজেন যুক্ত জীবীয় অণু উৎপন্ন হয়।

সুতরাং নাইট্রোজেন ব্যবহারের তৃতীয় স্তর প্রধানত ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

2) অ্যামোনিয়া ফিক্সেশন পদ্ধতিতে উৎপন্ন গ্লুটামেট ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড বিপাকজাত পাইরুভেট ও অক্সালো অ্যাসিটেট যৌগগুলির সঙ্গে বিক্রিয়া করে অন্যান্য অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অন্যান্য নাইট্রোজেনযুক্ত জীবীয় অণু সৃষ্টি হয়।

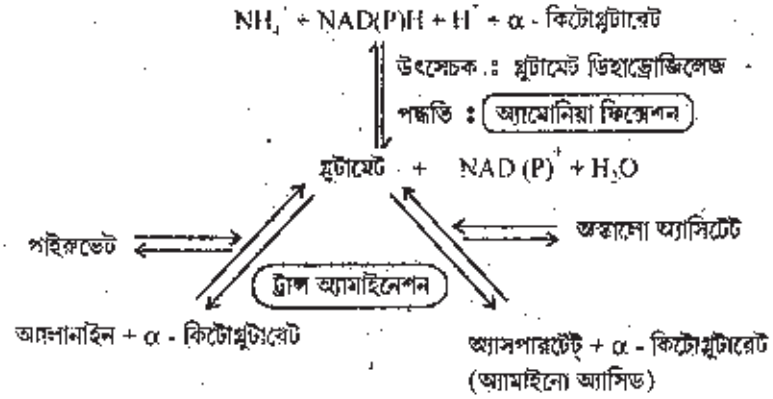

চিত্র 13.5 : অ্যামোনিয়া ফিক্সেশন ও ট্রান্স অ্যামাইনেশনের পারস্পরিক সম্পর্ক

3) অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়া দ্বারা সহজ বিক্রিয়া পথে সংঘটিত হয়। অ্যালানাইন ও অ্যাসপারটেট হল এইভাবে উৎপন্ন দুটি non essential অ্যামাইনো অ্যাসিড।

4) ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ার হারের তারতম্য ঘটিয়ে দেহে অনপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাম্যাবস্থা বজায় রাখা যায়।

13.4.4 ডিঅ্যামাইনেশন (Deamination)

যে বিপাকীয় পদ্ধতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটি (NH_2) NH_4^+ হিসাবে অপসারিত হয় তাকে ডিঅ্যামাইনেশন বলে। দেহস্থ বিভিন্ন কলায় উৎপন্ন NH_4^+ যকৃৎ কোষে গ্লুটামিনের অ্যামাইড নাইট্রোজেন হিসাবে বা অ্যালানাইন এর অ্যামাইনো গ্রুপ হিসাবে পরিবাহিত হয়।

ডিঅ্যামাইনেশন এর প্রকারভেদ : সাধারণত দুই প্রকারে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিঅ্যামাইনেশন সম্পন্ন হয় যথা

1) অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন ও
2) নন্ অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন।

1) **অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন** (Oxidative deamination)

এই পদ্ধতিতে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রাথমিক ভাবে ফ্ল্যাভোপ্রোটীন যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ বা অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক দ্বারা ডি হাইড্রোজিনেশন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং পরে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে NH_2 গ্রুপ সরাসরি অ্যামোনিয়া হিসাবে অপসারিত হয়।

ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের বিক্রিয়া

মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে যে ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকটি পাওয়া যায় তাকে গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামে অভিহিত করা হয়। এটি একটি জটিল অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক। এখানে ছটি সমপ্রকৃতির অধঃএকক আছে। NAD^+ বা $NADP^+$ এই উৎসেচকে জারক (oxidant) বা

বিজারিত পদার্থের গ্রাহক (acceptor of the reducing equivalent) হিসাবে কাজ করে। গ্লুটামেট সংশ্লেষে $NADP^+$ প্রকৃতির কোএনজাইম এবং গ্লুটামেটের ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় (degradation) NAD^+ কোএনজাইম হিসাবে কাজ করে। GTP ও ATP এই উৎসেচকের অ্যালোস্টেরিক ইনহিবিটর (allosteric inhibitor) এবং GDP ও ADP অ্যালোস্টেরিক অ্যাক্টিভেটর (allosteric activator) হিসাবে কাজ করে। সুতরাং কোষে শক্তির পরিমান কমে যাওয়ার অর্থ ADP ও GDP-র পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া এবং ফলস্বরূপ গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সক্রিয়করণ হওয়া এবং পরিশেষে ডিঅ্যামাইনেশন পদ্ধতিতে কার্বন কাঠামো যুক্ত জৈব যৌগের উৎপন্ন হওয়া। কারণ এই যৌগই বিপাকীয় জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে TCA চক্রে প্রবেশ করে। কিছু হর্মোনও এই উৎসেচকের কাজকে প্রভাবিত করে।

নিম্নে গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেজ দ্বারা ডিঅ্যামাইনেশন পথটি দেখানো হল —

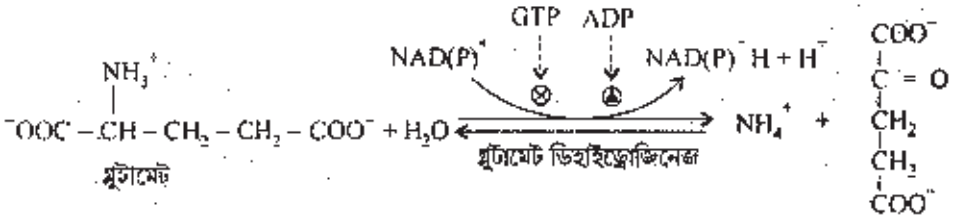

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উক্ত বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত গ্লুটামেট বিক্রিয়ক আবার ট্রান্স অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ার বিক্রিয়াজাত যৌগ। কাজেই অনেক বিজ্ঞানী এই দুটি বিক্রিয়া পথকে একত্রে ট্রান্সডিঅ্যামাইনেশন (Transdeamination) বলে থাকেন। কয়েকটি অল্পসংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড অবশ্য ট্রান্সডিঅ্যামাইনেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ না করে সরাসরি ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।

অক্সিডেজ উৎসেচকের ক্রিয়া

যকৃৎ ও বৃক্কে অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন কারী এক গুচ্ছ উৎসেচক পাওয়া যায় যাদের একত্রে অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ বলে। L–অ্যামাইনো অ্যাসিডঅক্সিডেজ মূলত L অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপর কাজ করে এবং ফ্ল্যাভিন মোনো নিউক্লিওটাইড বা FMN কে কোএনজাইম হিসাবে ব্যবহার করে। অপরদিকে D–অ্যামাইনো অ্যাসিডঅক্সিডেজ মূলত D অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপর ক্রিয়াশীল এবং এক্ষেত্রে ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড বা FAD কোএনজাইমের ভূমিকা পালন করে। যেহেতু প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে D–অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রায় অনুপস্থিত তাই যকৃৎ ও বৃক্কে উপস্থিত D–অ্যামাইনো অ্যাসিডঅক্সিডেজের প্রকৃত ক্রিয়া পদ্ধতি অনেকটাই অজ্ঞাত। তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে D–অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং তা অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ দ্বারা ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে।

অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেজ প্রথমে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে ডিহাইড্রোজিনেশন প্রক্রিয়ায় ইমিনো অ্যাসিডে পরিণত করে এবং FMN বিজারিত হয়ে $FMNH_2$ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন ইমিনো

অ্যামিড পরবর্তী পর্যায়ে স্বতস্ফূর্তভাবে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে α–কিটো অ্যাসিড ও NH_3 উৎপন্ন করে। এই সময় $FMNH_2$ পুনরায় O_2 দ্বারা জারিত হলে FMN ও বিষাক্ত H_2O_2 উৎপন্ন করে। তবে ক্যাটালেজ উৎসেচকের প্রভাবে এই বিষাক্ত H_2O_2 জলে পরিণত হয়। নিম্নে বিক্রিয়াপথটি বর্ণিত হল -

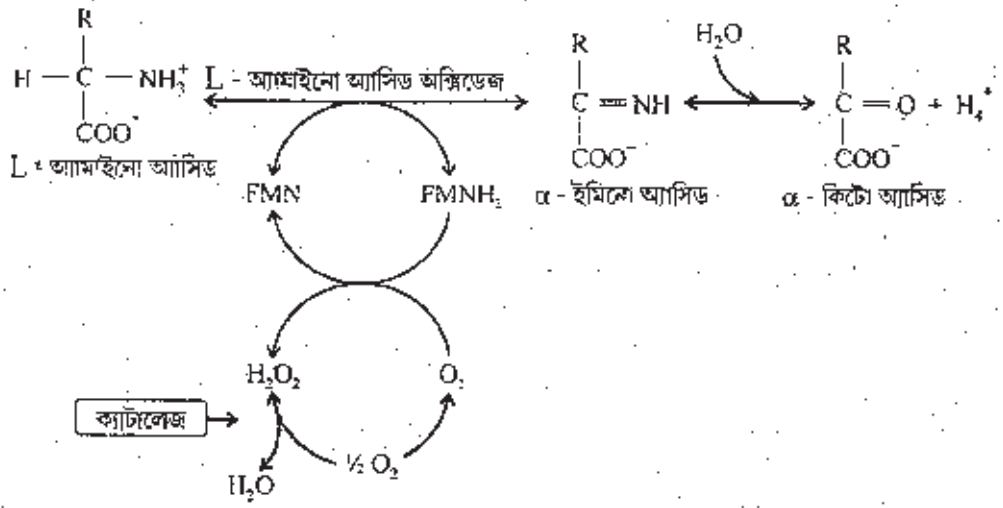

2) নন্ অক্সিডেটিভ ডি অ্যামাইনেশন (Nonoxidative deamination)

এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রক্সি অ্যামাইনো অ্যাসিড (Serine, Threonine), সিস্টাইন (Cysteine) ও অ্যাসপারটিক অ্যাসিড থেকে ডিহাইড্রাটেজ, ডিসাল্‌ফ হাইড্রাটেজ বা অ্যাসপারটেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় সরাসরি NH_3 অপসারিত হয়।

L–সেরিন বা L–থ্রিওনাইন জাতীয় হাইড্রক্সি অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিহাইড্রেশন ডি অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং যথাক্রমে সেরিন ডিহাইড্রাটেজ ও থ্রিওনাইন ডিহাইড্রাটেজ উৎসেচকের দ্বারা প্রথমে α–ইমিনো অ্যাসিডে ও অবশেষে α–কিটো অ্যাসিড ও NH_3 উৎপন্ন করে। যকৃৎ কোষে এই উৎসেচকগুলি পাওয়া যায়। নিম্নে বিক্রিয়া পথ দেখানো হল

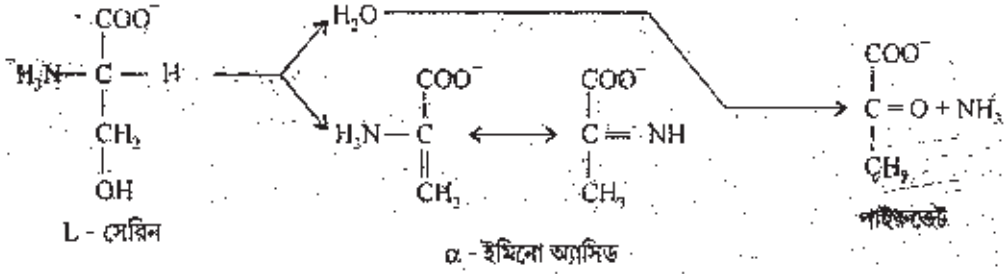

সিস্টাইন নামক সালফার যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড সিসটাইন ডিসাল্‌ফহাইড্রাটেজ নামক উৎসেচকের দ্বারা ডিসালফহাইড্রেশন ডিঅ্যামাইনেশন বিক্রিয়ায় H_2S, NH_3 ও পাইরুভেট উৎপন্ন করে। এই উৎসেচক যকৃৎ, বৃক্ক ও প্যানক্রিয়াসে পাওয়া যায়।

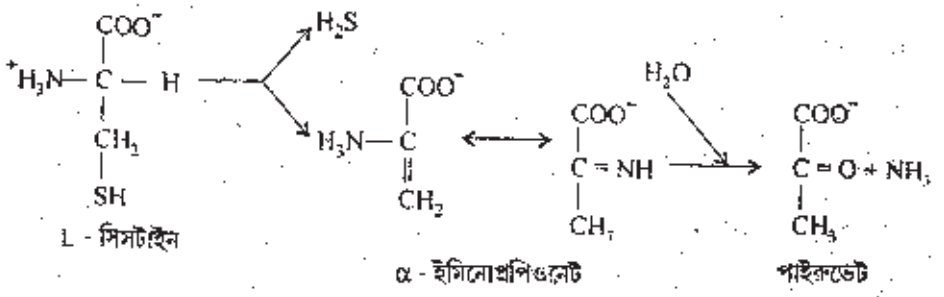

অ্যাসপারটেজ একপ্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড লাইয়েজ যা L–অ্যাসপারটেটকে নন্‌অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় ফিউমারেটে পরিণত করে এবং NH_3 উৎপন্ন হয়।

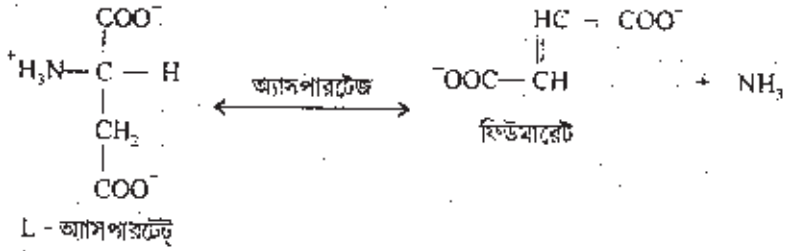

13.4.5 ইউরিয়া চক্র (Urea Cycle)

কতিপয় প্রাণীর যকৃৎ কোষে যে চক্রাকার বিক্রিয়া পথে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন NH_4^+ এবং বিপাকীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন CO_2 বিক্রিয়া করে ইউরিয়া নামক নাইট্রোজেন ঘটিত অক্ষতিকর রেচন পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে ইউরিয়া চক্র বা অরনিথিন চক্র (Ornithine Cycle) বলে।

- আবিষ্কার ঃ 1932 খ্রীষ্টাব্দে (Hans Krebs) ও (Kurt Henseleit) নামক বিজ্ঞানীদ্বয় সর্বপ্রথম ইউরিয়া চক্রের বিক্রিয়াপথ আবিষ্কার করেন। ইউরিয়া চক্র হল প্রথম আবিষ্কৃত বিপাকীয় চক্র। বিজ্ঞানী Krebs ইউরিয়া চক্র আবিষ্কারের 5 বছর পর 1937 সালে সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র আবিষ্কার করেন।

- ইউরিয়া চক্রের স্থান (Site) ঃ ইউরিয়া চক্র 5টি সুনির্দিষ্ট উৎসেচক সমন্বিত বিক্রিয়া ধাপে (five enzymatic reaction steps) সংঘটিত হয়। এর তিনটি যকৃৎকোষের সাইট্রোপ্লাজমে (cytosol) এবং বাকী দুটি যকৃৎকোষের মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে (matrix) ঘটে।

উৎপন্ন ইউরিয়া রক্তদ্বারা বাহিত হয়ে বৃক্কে প্রবেশ করে এবং সেখানে নেফ্রন দ্বারা মূত্রে (Urine) নীত হয়।

- ইউরিয়াস্থিত নাইট্রোজেন ও কার্বনের উৎস (Source)

ইউরিয়ার রাসায়নিক সংকেত হল $H_2N - \overset{\overset{O}{\|}}{C} - NH_2$ এক অণু ইউরিয়ায় দুটি নাইট্রোজেন (N) পরমাণু ও একটি কার্বন (C) পরমাণু থাকে। উক্ত দুটি নাইট্রোজেনের একটি পরমাণু, অ্যামোনিয়া (NH_3) থেকে এবং অপর পরমাণুটি অ্যাসপারটেট নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত। ইউরিয়ার কার্বন পরমাণুটি কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন CO_2 থেকে গৃহীত হয়।

- **ইউরিয়ার নাইট্রোজেন ঃ NH_4^+ বা গ্লুটামেট রূপে ঃ**

খাদ্য থেকে প্রাপ্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড বা মাংসপেশীর থেকে উৎপন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডইউরিয়া সংশ্লেষের বিক্রিয়ায় দুটি পথে প্রবেশ করে। যথা 1) ট্রান্সডিঅ্যামাইনেশন পথ ও 2) ট্রান্স অ্যামাইনেশন পথ

ট্রান্সডিঅ্যামাইনেশন পথ (Transdeamination route)

এই পথটি প্রথমে সাইটোপ্লাজমের ট্রান্স অ্যামাইনেশন এবং তারপরেই মাইটোকনড্রিয়ার ডিঅ্যামাইনেশন বিক্রিয়ার সমন্বয়ে সংঘটিত হয়। ট্রান্স অ্যামাইনেশন প্রক্রিয়াকালে α কিটোগ্লুটারেট দাতা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে NH_2 গ্রুপ গ্রহণ করে সাইটোপ্লাজমেই গ্লুটামেটে পরিণত হয়। এই গ্লুটামেট মাইটোকনড্রিয়ার পর্দার গ্লুটামেট বাহক দ্বারা মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে উপনীত হয় এবং সেখানে অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন বিক্রিয়ায় α কিটো গ্লুটারেট ও NH_4^+ উৎপন্ন করে। এই NH_4^+ ইউরিয়া চক্রে প্রবেশ করে। নিম্নে বিক্রিয়াপথটি দেখানো হল ঃ (চিত্র 13.6)

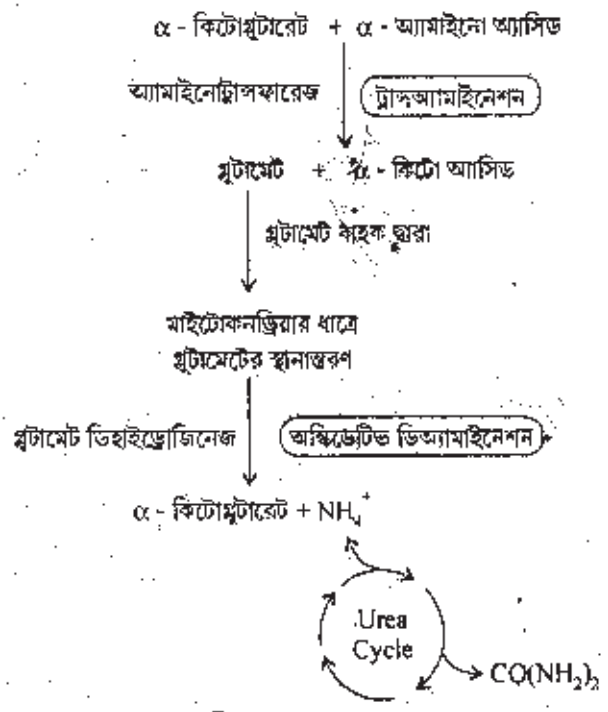

চিত্র : 13.6

ট্রান্স অ্যামাইনেশন পথ (Transamination route)

শুধুমাত্র ট্রান্স অ্যামাইনেশন বিক্রিয়া পথ দ্বারাও অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেন ইউরিয়া চক্রে প্রবেশ করে। এই পথ, দুটি ট্রান্স অ্যামাইনেশন বিক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত। এর প্রথমটি ট্রান্সডিঅ্যামাইনেশন বিক্রিয়াগুলির ন্স অ্যামাইনেশনের অনুরূপ। তবে দ্বিতীয় পথটি পৃথক প্রকৃতির। এখানে অক্সালো অ্যাসিটেট গ্রহীতা হিসাবে াজ করে ও গ্লুটামেট অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে NH_2 গ্রুপ গ্রহণ করে ও অ্যাসপারটেট উৎপন্ন করে। অ্যাসপারটেট

অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ (AST) এই বিক্রিয়ায় উৎসেচকের কাজ করে। উৎপন্ন অ্যাসপারটেট ইউরিয়ার দ্বিতীয় NH_2 গ্রুপটি বহন করে এবং সাইট্রুলিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরজিনো সাক্সিনেট গঠন করে ইউরিয়া চক্রে প্রবেশ করে। এই ট্রান্স অ্যামাইনেশন পথটি সাইটোপ্লাজমে অনুষ্ঠিত হয়। (চিত্র - 13.7)

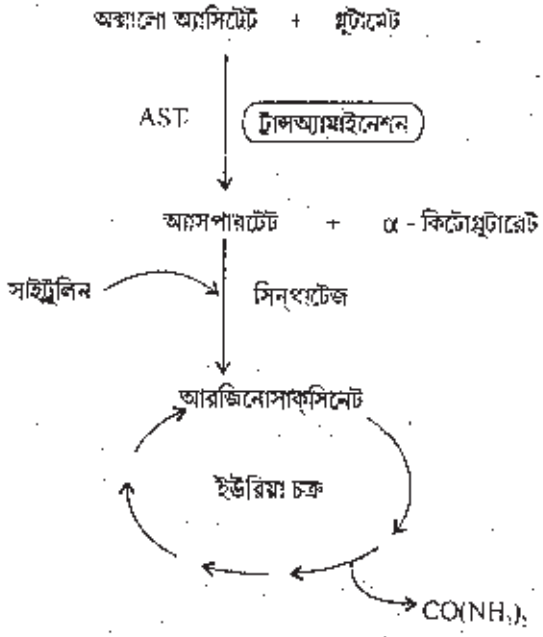

চিত্র - 13.7

- **ইউরিয়া চক্রের বিক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ** (Reaction of Urea Cycle)

ইউরিয়া চক্রের বিক্রিয়া পথ 5টি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়। সংক্ষেপে এগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় -

1. $NH_4^+ + HCO_3^- + 2ATP^{4-} + H_2O \longrightarrow Carbamoyl\ phosphate^{2-} + 2ADP^{3-} + P_i^{2-} + 2H^+$
2. $Carbamoyl\ phosphate^{2-} + Ornithine^+ \longrightarrow Citruline + P_i^{2-} + H^+$
3. $Citruline + Aspartate^- + ATP^{4-} \longrightarrow AMP^{2-} + PP_i^{3-} + Arginosuccinate^- + H^+$
4. $Arginosuccinate^- + H_2O \longrightarrow Arginine^+ + Fumarate^{2-}$
5. $Arginine^+ + H_2O \longrightarrow Ornithine^+ + Urea$

প্রথম ধাপ (Step 1) : এই ধাপটি ঘনীভবন বিক্রিয়া (Condensation reaction) নামে খ্যাত। এটি একপ্রকার অ্যামোনিয়া স্থিতিকরণ পদ্ধতি। এখানে অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন থেকে প্রাপ্ত NH_4^+, HCO_3^- (বাইকার্বনেট আয়ন) ও ATP থেকে প্রাপ্ত ফসফেট মূলকের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বামইল ফসফেট (Carbamoyl Phosphate) উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে ঘটে। এই বিক্রিয়ায় 2 অনু ATP শক্তির যোগান দেয় যা বিক্রিয়া শেষে ADP ও Pi তে বিশ্লিষ্ট হয়। এই বিক্রিয়াটিতে **কার্বামইল ফসফেট সিনথেজ I** জৈব অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। এটি একটি অ্যালোস্টেরিক উৎসেচক এবং সমগ্র ইউরিয়া চক্রের হার নিয়ন্ত্রণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় ধাপ (Step 2) : একে সাইট্রুলিন সংশ্লেষ নামেও অভিহিত করা যায়। এখানে কার্বামইল ফসফেট থেকে কার্বামইল গ্রুপটি অর্নিথিনে স্থানান্তরিত হয়ে সাইট্রুলিন উৎপন্ন করে। অর্নিথিন ট্রান্সকার্বামইলেজ এখানে উৎসেচক রূপে কাজ করে। এই বিক্রিয়াটিও মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে সংঘটিত হয়। উৎপন্ন সাইট্রুলিন মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃপর্দার বাহক প্রোটিন দ্বারা সাইটোপ্লাজমে নীত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্নিথিন ও সাইট্রুলিন উভয়েই α অ্যামাইনো অ্যাসিড। তবে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত প্রোটিনে এদের দেখা যায় না।

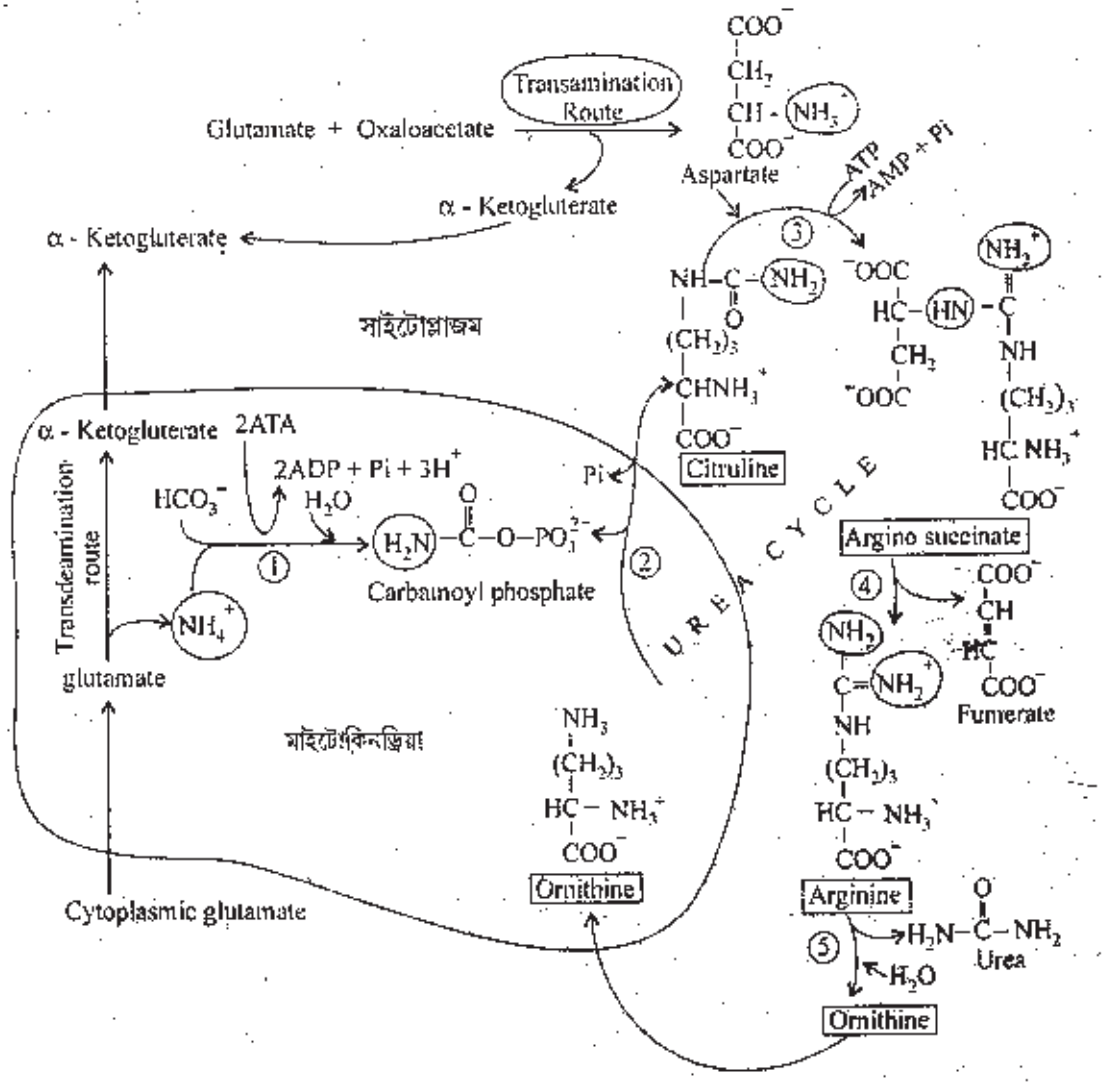

চিত্র : 13.8 চিত্রে মাইটোকনড্রিয়া ও সাইটোপ্লাজমে ইউরিয়া চক্রের বিক্রিয়া পথ দেখানো হল। এখানে উৎসেচকগুলি হল (1) Carbamoyl phosphate synthase I, (2) Ornithine transcarbamoylase, (3) Arginosuccinate Synthetase, (4) Arginosuccinase (or Lyase), (5) Arginase.

তৃতীয় ধাপ (Step 3) : এটি আর্জিনোসাক্সিনেট সংশ্লেষ নামে খ্যাত। এই বিক্রিয়া সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। বিক্রিয়াকালে সাইট্রলিন, অ্যাসপারটেট নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের সহিত যুক্ত হয়ে আর্জিনোসাক্সিনেট গঠন করে। আর্জিনোসাক্সিনেট সিনথাটেজ এই বিক্রিয়ায় উৎসেচকের কাজ করে। এবং এই বিক্রিয়ায় ATP প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। এই বিক্রিয়াতেই ইউরিয়ার দ্বিতীয় নাইট্রোজেনের প্রবেশ ঘটে।

চতুর্থ ধাপ (Step 4) : এটি ট্রান্সএলিমিনেশন (trans elemination) বিক্রিয়া নামে পরিচিত। এটিও সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয়। এখানে আর্জিনোসাক্সিনেট বিভাজিত হয়ে আর্জিনিন ও ফিউমারেট উৎপন্ন হয়। আর্জিনোসাক্সিনেজ এখানে উৎসেচক হিসাবে কাজ করে। এই বিক্রিয়ায় দ্বিতীয় নাইট্রোজেন আর্জিনিনে সংবদ্ধ থাকে এবং অ্যাসপারটেট নাইট্রোজেন বিমুক্ত হয়ে ফিউমারেট উৎপন্ন করে।

পঞ্চম ধাপ (Step 5) : এটি সর্বশেষ বিক্রিয়া পথ। আরজিনেজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে আর্জিনিন আদ্রবিশ্লেষিত হয়ে অর্নিথিন ও ইউরিয়া উৎপন্ন করে। উৎপন্ন অর্নিথিন মাইটোকোনড্রিয়ার অন্তঃপর্দাস্থিত বাহক প্রোটীন দ্বারা মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী ইউরিয়া চক্রে পুনরায় অংশগ্রহণ করে। অর্নিথিনের বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও পুনরাবির্ভাব হওয়ার কারণে ইউরিয়া চক্রকে অর্নিথিন চক্র নামেও অভিহিত করা হয়। আর্জিনেজ উৎসেচকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর যকৃতে পাওয়া গেলেও পক্ষী ও সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীদেহে অনুপস্থিত।

- **ইউরিয়া চক্র, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র (বা TCA চক্র) ও ইলেকট্রন পরিবহণ পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক :**

ইউরিয়া চক্রের বিভিন্ন অন্তর্বর্তী যৌগসমূহ ও উপজাত যৌগ সমূহ, ট্রাই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্রের (TCA cycle) অন্তর্বর্তী যৌগরূপে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে দুটি চক্রের পারস্পরিক যোগাযোগ থাকায় দুটি চক্রকে একত্রে অনেকে **ক্রেবস বাইসাইকল** (Krebs bicycle) বা ক্রেবস এর দ্বিচক্র নামে অভিহিত করেন। নিম্নে চিত্রে ক্রেবস দ্বিচক্র টি বর্ণিত হল যেখানে ইউরিয়া চক্র ও TCA চক্র পরস্পর ফিউমারেট এবং অক্সালো অ্যাসিটেট থেকে অ্যাসপারটেটের ট্রান্সঅ্যামাইনেশন প্রক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত

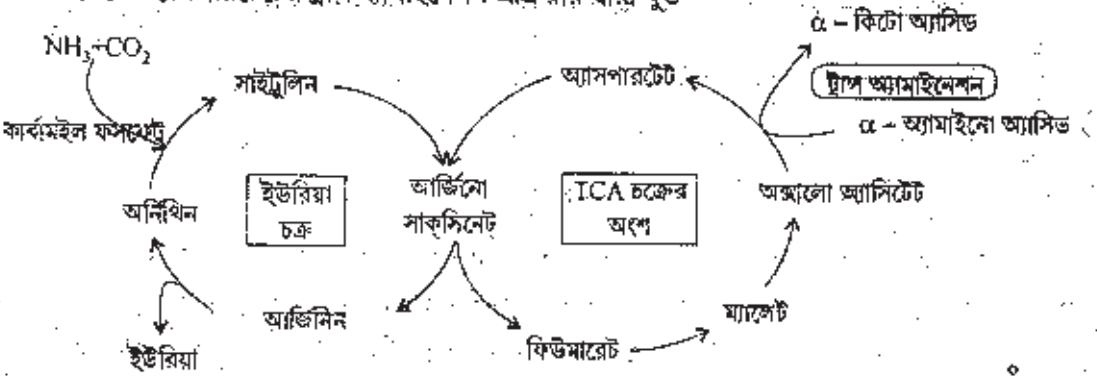

চিত্র : 13.8 ক্রেবস বাইসাইকল

শুধুমাত্র TCA চক্রই নয়, ইউরিয়া চক্র দেহের অন্যান্য বিপাকীয় পথসমূহের সঙ্গে ওতপ্রতঃভাবে যুক্ত ইউরিয়া চক্রের প্রথমধাপের বিক্রিয়কসমূহ অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিঅ্যামাইনেশন (NH_3) এবং সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের দ্বারা খাদ্যবস্তুর জারণ (Co_2, H_2O) এবং ইলেকট্রন পরিবহণের (ATP) দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ইউরিয়া চক্রের তৃতীয় ধাপের বিক্রিয়ক অ্যাসপারটেটটি TCA চক্রের অন্তর্বর্তী যৌগ অক্সালো অ্যাসিটেটের ট্রান্স অ্যামাইনেশন দ্বারা প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে চক্রের চতুর্থ ধাপের বিক্রিয়াজাত পদার্থ ফিউমারেট TCA চক্রে প্রবেশ করে ও পুনরায় অক্সালো অ্যাসিটেট উৎপন্ন করে। ফিউমারেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটেট তৈরীর সময় NADH উৎপন্ন হয় যা ইলেকট্রন পরিবহন পদ্ধতির (Electron Transport System) মাধ্যমে জারিত হলে ATP সংশ্লেষ করে। উৎপন্ন ATP ইউরিয়া চক্রের শক্তির চাহিদা পূরণ করে। নিচের চিত্রে ইউরিয়া চক্রের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় পথসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো —

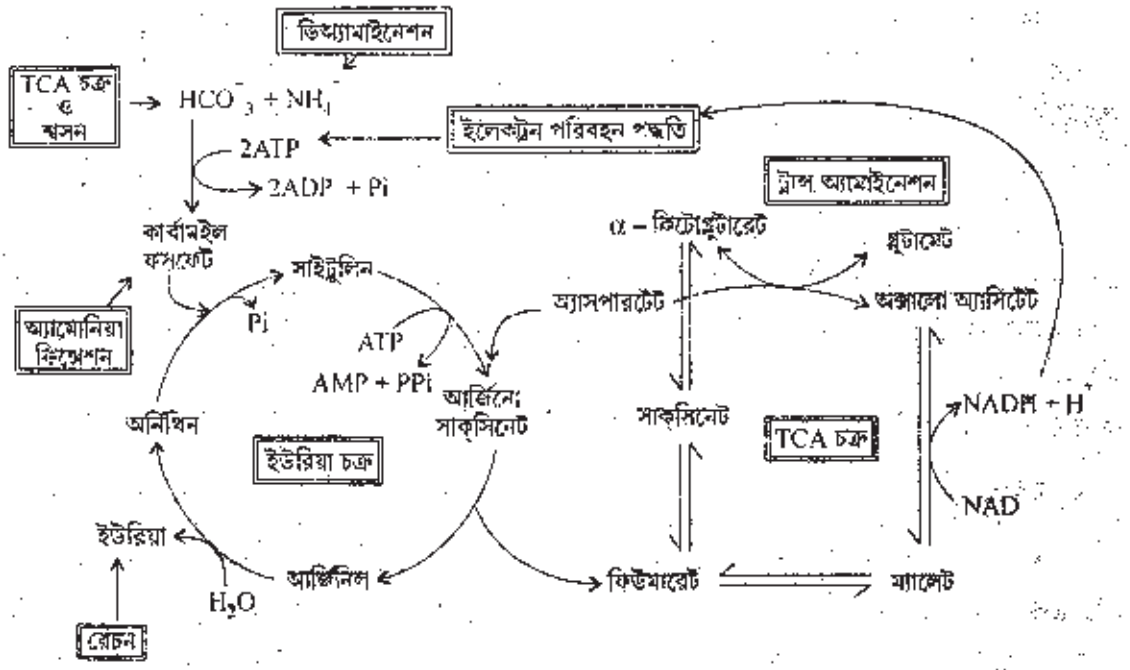

চিত্র 13.9 ইউরিয়া ও অন্যান্য বিপাকীয় পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক

- **ইউরিয়া চক্রে শক্তি খরচের হিসাব (Energetics of Urea Cycle) :**

ইউরিয়া চক্রের সামগ্রিক রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়-

$NH^+_4 + HCO_3^- + 3ATP^{4-} + 2H_2O$ + অ্যাসপারটেট $\longrightarrow$
ইউরিয়া + ফিউমারেট$^{2-}$ + $2ADP^{2-}$ + PPi^{3-} + $2Pi^{2-}$ + $4H^+$

ইউরিয়া চক্রের বৈশিষ্ট্য হলো এটি অপচিতিমূলক বিপাক হলেও এখানে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার (exergonic) পরিবর্তে শক্তি গৃহীত (endergonic) হয়। বিক্রিয়ার প্রথম ধাপে 2 অণু ATP এবং তৃতীয় ধাপে 1টি ATP অণুর প্রয়োজন হয়। এছাড়াও যখনই পাইরোফসফেট উৎপন্ন হয় তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাইরোফসফাটেজ নামক উৎসেচক দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অজৈব ফসফেট উৎপন্ন করে। এটি শক্তি উৎপন্নকারী exergonic বিক্রিয়া। এটি ইউরিয়া চক্রের সমগ্র বিক্রিয়াকে চালিত করে। পাইরোফসফেটের আর্দ্রবিশ্লেষণ কে ধরে ইউরিয়া সংশ্লেষ বিক্রিয়ায় মোট 4টি উচ্চশক্তিযুক্ত রাসায়নিক বন্ধনীর (four energy rich bonds) আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে। (সারণী - 2)

সারণী - 2

বিক্রিয়া	উচ্চ-শক্তি যুক্ত বন্ধনীর সংখ্যা
$2ATP \longrightarrow 2ADP + 2Pi$	2
$ATP \longrightarrow AMP + PPi$	1
$PPi \longrightarrow 2Pi$	1
	মোট 4টি

13.5 অ্যামোনোটেলিক, ইউরিকোটেলিক ও ইউরিয়োটেলিক প্রাণীকূল (Ammonotelic, Uricotelic and Ureotelic animals)

অ্যামাইনো অ্যাসিডের অপচিতির ফলে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া বিভিন্ন প্রাণীতে ত্রিবিধ প্রকারে রেচিত হয়। এবং এই প্রকারভেদ অনুযায়ী সমগ্র প্রাণীকূলকে 3টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

1) **অ্যামোনোটেলিক প্রাণী বা অ্যামোনিয়া রেচক প্রাণী :** যে সমস্ত প্রাণী রেচন পদার্থ হিসাবে সরাসরি অ্যামোনিয়া বিমুক্ত করে তাদের অ্যামোনোটেলিক প্রাণী বলে।

অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ও ইউরিয়ার মধ্যে অ্যামোনিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর (toxic) এবং জলে সবচেয়ে বেশী দ্রবণীয়। তবে জলে বসবাসকারী প্রাণী ও অস্থিযুক্ত মাছ জলে থাকার কারণে এদের জলের যোগান অনেক বেশী। সেই কারণে অ্যামোনিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর হলেও তারা জলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াকেই রেচন পদার্থ হিসাবে বেছে নিয়েছে। পরিবেশে রেচিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জলে দ্রবীভূত হয়ে এর ঘনত্ব অত্যন্ত লঘু হওয়ায় প্রাণীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না।

2) **ইউরিকোটেলিক বা ইউরিক অ্যাসিড রেচক প্রাণী :** পক্ষী, স্থলবাসী সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ যাদের জলের যোগান তুলনামূলকভাবে কম তারা জলে প্রায় অদ্রাব্য ইউরিক অ্যাসিড রেচন পদার্থ হিসাবে নিষ্কাশন করে এবং এদের ইউরিকোটেলিক প্রাণী বলে।

ইউরিক অ্যাসিডের দ্রাব্যতা প্রায় 6 mg প্রতি লিটার জল। ফলে এটি প্রায় কঠিন পদার্থ হিসাবে রেচিত হয়। এটি অ্যামোনিয়া অপেক্ষা কম ক্ষতিকর (less toxic than ammonia)। জলে প্রায় অদ্রাব্য হওয়া এর একটি অন্যতম কারণ।

3) **ইউরিয়োটেলিক বা ইউরিয়া রেচক প্রাণী :** অধিকাংশ স্থলবাসী প্রাণী বিশেষত স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ হল ইউরিয়া এবং এদের ইউরিয়োটেলিক প্রাণী বলে।

ইউরিয়ার দ্রাব্যতা অ্যামোনিয়া অপেক্ষা কম ও ইউরিক অ্যাসিড অপেক্ষা বেশী। এটি ক্ষতিকরও নয় (**nontoxic**)।

উপরিলিখিত তিনটি বিভাগের মধ্যে কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট জাতিজনিভিত্তিক সম্পর্ক (Phylogenetic relationship) এখন স্পষ্ট নয়। এটি প্রধানতঃ প্রাণীর জলগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, রেচন পদার্থের দ্রাব্যতা ও কতটা ক্ষতিকর (toxicity) তার উপর নির্ভর করে। যেমন কুমির সরীসৃপ হওয়া সত্ত্বেও জলবাসী হওয়ার কারণে অ্যামোনিয়া রেচন করে। ব্যাঙাচি অ্যামোনোটেলিক হলেও ব্যাঙ পরিণত দশা ইউরিয়োটেলিক হিসাবে কাজ করে। সরীসৃপ শ্রেণীর চিলোনিয়া (Chelonia) বর্গের অন্তর্গত প্রাণীদের (tortoises & turtles) যারা স্থলবাসী তারা অ্যাসিড, যারা অর্দ্ধস্থলবাসী (semiterrestrial) তারা ইউরিয়া এবং যারা জলবাসী (aquatic) তারা অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়ার মিশ্রণ রেচন পদার্থ হিসাবে নিষ্কাশিত করে। তবে রেচন পদার্থের উপর ভিত্তি করে মেরুদন্ডী প্রাণীদের নিম্নলিখিত ভাগ লক্ষ্য করা যায়। (সারণী - 3)

সারণী – 3

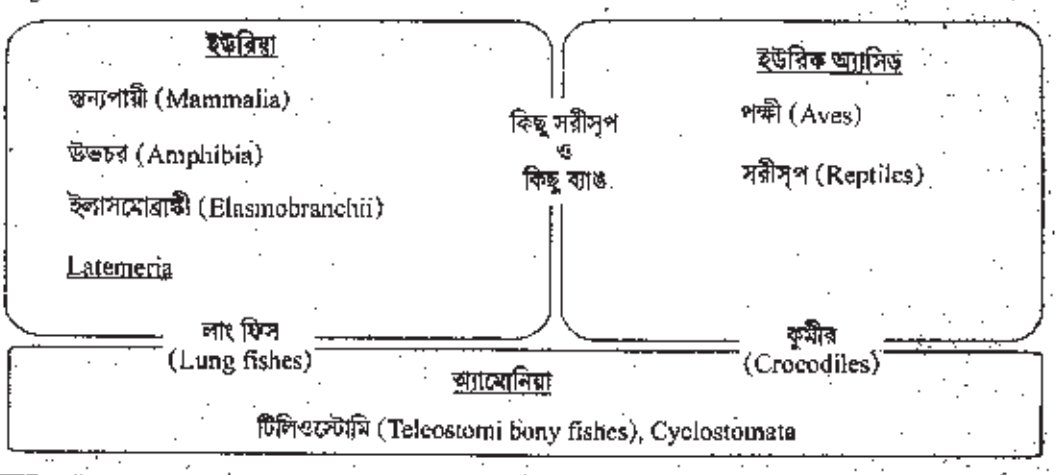

13.6 সারাংশ

জীবিত কোষের চারটি জীবিয় অণুর (Biomolecules) অন্যতম হল প্রোটীন। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কুড়িটি অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনী দ্বারা অসংখ্য প্রোটীন উৎপন্ন করে। প্রোটীন সংশ্লেষের সাংকেতিক বার্তা নিউক্লিয়াসস্থিত DNA তে থাকে। গৃহীত খাদ্যের প্রোটীন অন্ত্রের বিভিন্ন প্রোটিও লাইটিক উৎসেচক দ্বারা জলবিশ্লেষিত হয়ে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড শোষণ পদ্ধতিতে কোষস্থ সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। অপরদিকে দেহস্থ প্রোটীন ও বিপাকীয় কার্যের ফলে বিশ্লেষিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি একত্রে একটি কাল্পনিক 'অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভান্ডার' বা 'amino acid pool' রচনা করে। দেহমধ্যস্থ বিপাকে এই অ্যামাইনো অ্যাসিডবিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ করে। অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিপাক উপচিতিমূলক বা অপচিতিমূলক হয়। উপচিতিমূলক বিপাক দ্বারা দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত প্রোটীন নতুন সংশ্লেষিত প্রোটীন দ্বারা সংস্থাপিত হয়। শৈশবের বৃদ্ধি দশায় এই বিপাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, অ্যামাইনো অ্যাসিডের অপচিতি মূলক বিপাক ও দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান সংশ্লেষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড জটিল বিপাকীয় কার্যের ফলে ইউরিয়ায় পরিণত হয়। এটি নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থ। যকৃতের হেপাটোসাইটে ইউরিয়া চক্র বা অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে এই ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কে উপনীত হয় এবং নেফ্রন দ্বারা শোষিত হয়ে মূত্র উৎপন্ন করণের মাধ্যমে দেহথেকে রেচিত হয়। এইভাবে উপযুক্ত বিপাককার্যের ফলে দেহের প্রোটীনের বা প্রকৃতপক্ষে নাইট্রোজনের (কারণ প্রোটীন দেহস্থ নাইট্রোজেনের উৎস)সমতা রক্ষিত হয়। বিভিন্ন অপুষ্টিজনিত কারণে এই সাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। কাজেই দেহে প্রোটীনের উপযুক্ত সরবরাহ ও যথাযথ বিপাক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

13.7 প্রশ্নাবলি

1) দেহের অপরিহার্য এবং অনপরিহার্য তিনটি করে অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম লিখুন।

2) অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল কাকে বলে?

3) অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপচিতিমূলক ব্যবহারগুলি লিখুন।

4) ট্রান্স অ্যামাইনেশন কাকে বলে?

5) ইউরিয়া চক্র, সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র ও ইলেকট্রন পরিবহন পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

13.8 উত্তরমালা

1) এককের প্রস্তাবনা অংশ দেখুন।

2) মানব শরীরের প্লাজমা ও কলারসে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি ভাণ্ডার বা আধারের কল্পনা করতে পারি, যাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল বলে।

3) এককের 13.4.1 অংশটি দেখুন।

4) এককে 13.4.3 অংশটি দেখুন।

5) এককে 13.4.5 অংশটি দেখুন।

একক 14 □ জৈব জারণ (Biological Oxidation); ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল বা শ্বসন শৃঙ্খল (Electron Transport Chain/Respiratory Chain); অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (Oxidative Phosphorylation)

গঠন

14.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

14.2 সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

14.3 জৈব জারণের সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা

14.3.1 ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল/শ্বসন শৃঙ্খল

14.3.2 অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন

14.4 সারাংশ

14.5 প্রশ্নাবলী

14.6 উত্তরমালা

14.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা

দেহের সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ, যেমন দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ এবং পুষ্টি সাধন - ইত্যাদির জন্য শক্তির প্রয়োজন। দেহের বিভিন্ন কলা কোষে খাদ্য তথা বিভিন্ন বিপাকীয় দ্রব্যাদির জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে জারণের দ্বারা এই শক্তি নির্গত হয়। দেহের কলাকোষে সবাত শ্বসনের মাধ্যমে অক্সিজেনের সুসংবদ্ধ ব্যবহার ও জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্মোচনই জৈবিক জারণের চূড়ান্তরূপ।

উদ্দেশ্য

- এই পাঠটি পাঠ করলে জীবদেহের কলাকোষের কোন অংশে কিভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় তা জানা যায়।
- উৎপন্ন শক্তি কিভাবে কোথায় জমা থাকে তা জানা যায়।
- শক্তিই জীবের চালিকাশক্তি এবং তা জীবদেহ খাদ্য থেকেই আহরণ করে।
- এর থেকে জানা যায় অক্সিজেন (O_2) কিভাবে খাদ্যের বিপাকে সাহায্য করে।
- কো-এনজাইম বা ইলেকট্রন বাহকের জারণ-বিজারণ কার্যকলাপ পদ্ধতি এই পাঠটি থেকে জানা যায়।

14.2 সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ল্যাভঁয় সিয়র (Lavoisier) প্রথম আবিষ্কার করেন যে, অজৈব বস্তুর দহন ও কলাকোষের বিপাক মূলতঃ একই পদ্ধতি। উভয় পদ্ধতিই জারণ — যেখানে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

14.3 জৈব জারণের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

জৈবজারণ হল সেই ধরণের কলাকোষিয় জারণ, যেখানে, হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অণু থেকে প্রতিস্থাপিত হয়। এখানে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপনের অর্থ হল একটি ইলেকট্রনের প্রতিস্থাপন।

প্রসঙ্গতঃ জৈব বিজারণে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা অন্য অর্থে একটি ইলেকট্রন যুক্ত হয়। এই জৈব জারণ-বিজারণ একই সঙ্গে পরপর ঘটেই চলে, যেখানে একটি বস্তু হাইড্রোজেন পরমাণু ত্যাগ করে এবং অপর একটি বস্তু সেই হাইড্রোজেন পরমাণুটি গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন দাতাকে বলা হয় জারিত হয়েছে। অপরদিকে হাইড্রোজেন গ্রহীতাকে বলা হয় বিজারিত হয়েছে। জারণে ইলেকট্রন অপসারণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা বিজারণের মাধ্যমেই পূরণ হয়।

উল্লেখ্য, অবাত শ্বসনকারী প্রাণীদের ক্ষেত্রে শক্তির উন্মোচন অক্সিজেনের উপস্থিতি ছাড়াই ঘটে।

জৈবজারণের সুস্পষ্ট ধারণা তৈরীর জন্য প্রথমে আমরা জৈব জারণের প্রধান কারিগর কতকগুলি উৎসেচক (enzyme), যারা আবার নির্দিষ্ট কতকগুলি কো-এনজাইম (coenzyme) বা ইলেকট্রন পরিবহনকারীর সঙ্গে

যুক্ত হয়ে কাজ করে তাদের কথা আলোচনা করব। তারপর ইলেকট্রন পরিবহন পদ্ধতি (E.T.S) ও অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (Oxidative Phosphorylation) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

1. অক্সিডেজেস (oxidases)

এই উৎসেচকগুলি সাবস্ট্রেট (Substrate) থেকে হাইড্রোজেনকে সরাসরি অপসারিত করে আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত করে।

উদাহরণ ঃ সাইটোক্রোম a_3 (cytochrome oxidase), টাইরোসিনেজ (tyrosinase), ইউরিকেজ (uricase) etc.

2) ডিহাইড্রোজিনেজ (Dehydrogenase) ঃ-

এরা আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা ঃ- (a) এরোবিক ডিহাইড্রোজিনেজ (Aerobic dehydrogenase) (b) এনারোবিক ডিহাইড্রোজিনেজ (Anaerobic dehydrogenase)

a) **এরোবিক ডিহাইড্রোজিনেজ ঃ** এই এনজাইমগুলি সাবস্ট্রেট থেকে হাইড্রোজেন অপসারিত করে, হয় O_2 ব্যবহার করে অথবা এমন কোন কৃত্রিম বস্তু ব্যবহার করে যা কিনা হাইড্রোজেন গ্রহীতা হিসাবে পরিচিত। এই ধরণের ডিহাইড্রোজিনেজ গুলি আসলে ফ্ল্যাভোপ্রোটিন (Flavo Protein)।

উদাহরণ ঃ- জ্যান্থিন অক্সিডেস (Xanthine oxidase), D-অ্যামিনো অ্যাসিড অক্সিডেস (D-aminoacid oxidase), কেটালেজ (Catalase), পার-অক্সিডেজ (Peroxidase) ইত্যাদি।

b) **এনারোবিক ডিহাইড্রোজিনেজ ঃ** এই এনজাইমগুলি অক্সিজেন (O_2) ব্যতীত অন্যান্য হাইড্রোজেন গ্রহীতাদের ব্যবহার করে। এগুলি আবার নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ-

I) **পিরিডিন নিউক্লিওটাইডেজ** (Pyridine nucleotidase) ঃ- নিকোটিনামাইড অ্যাডেনাইন-ডাই নিউক্লিওটাইড (NAD^+) এবং নিকোটিনামাইড অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট ($NADP^+$) এই বিভাগে পড়ে। নিকোটিনামাইড অংশটিই এদের প্রকৃত অংশ যা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে।

$$NAD^+ + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons NADH + H^+$$

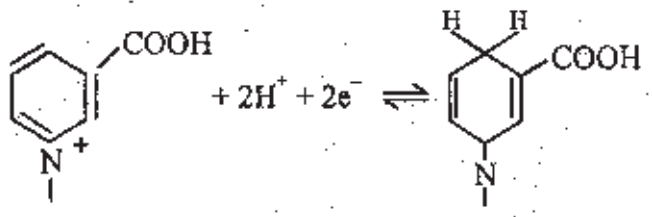

II) ফ্ল্যাভোনিউক্লিও টাইড (Flavonucleotide) ঃ-

এরা হল ফ্ল্যাভিন মোনো নিউক্লিওটাইড (FMN) এবং ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনিন-ডাই নিউক্লিওটাইড (FAD)। এদের রাইবোফ্ল্যাভিন (riboflavin) অংশটি কার্যকরী এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

$$FAD + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons FADH_2^+$$

III) সাইটোক্রোম (Cytochrome) ঃ-

এগুলি হল লৌহঘটিত হিমোপ্রোটিন যেগুলিতে লৌহঘটিত অংশটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সময় Fe^{++} বা Fe^{+++} অবস্থায় থাকে। বিভিন্ন সাইটোক্রোমগুলি হল - সাইটোক্রোম b, c_1, c, a.

3. অক্সিজিনেজ (Oxygenase)

এগুলি সাবস্ট্রেট অণুগুলির মধ্যে অক্সিজেনকে সরাসরি যুক্ত করে। এরা আবার দুভাগে বিভক্ত।

a) ডাই-অক্সিজিনেজ (dioxygenase) ঃ- এরা অক্সিজেনের দুটি পরমাণুকেই সাবস্ট্রেটের সঙ্গে যুক্ত করে। $A + O_2 \longrightarrow AO_2$

উদাহরণ ঃ- ট্রিপটোফ্যান ডাই অক্সিজিনেজ (Tryptophan dioxygenase), হোমোজেনটিসিক অ্যাসিড ডাই অক্সিজিনেজ (Homogentisic acid dioxygenase)

b) মনো অক্সিজিনেজ (mono oxygenase)

এরা কেবল একটিমাত্র অক্সিজেন পরমাণু সাবস্ট্রেটের সঙ্গে যুক্ত করে।

এই অংশে জৈবজারণে অংশগ্রহণকারী কয়েকটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগের নাম করা হল —

1. অ্যাসিডফসফাটেজ (acid phosphatase)
2. ইনোলফসফাটেজ (Enolphosphatase)
3. গুয়ানিডিনো ফসফাটেজ (Guanidino phosphatase)
4. জৈব ফসফাটেজ (Bio Phosphatase)
5. কো-এনজাইম (Coenzyme)
6. মেথিওনিন (Methionine)

জীবদেহে জৈবজারণের উদাহরণ অনেক। যেমন - TCA চক্র (TCA cycle) বা ক্রেবস্ চক্র

(Krebs cycle) - এ গ্লুকোজের মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে তা O_2-এর উপস্থিতিতে জারিত হয়ে বেরিয়ে আসে। একে গ্লুকোজ শ্বসন বলে। কারণ, পাইরুভেট, ডি-কার্বক্সিলেশন (decarboxylation) ও অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (oxydative phosphorylation) করে ATP উৎপন্ন করে।

14.3.1 ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল / শ্বসন শৃঙ্খল (Electron transport Chain/Respiratory Chain)

ইলেকট্রন পরিবহন ব্যবস্থাটি (ETS) প্রত্যেক সজীব কোষের মাইটোকনড্রিয়াস্থিত ক্রিস্টিতে (cristae) অবস্থান করে। ক্রিস্টির মধ্যে একাধিক ইলেকট্রন বহনকারী বাহক থাকে যারা ইলেকট্রনগুলিকে পরপর একে অন্যকে প্রদান করে বহন করে চলে। এই বাহকগুলির অধিকাংশই সাইটোক্রোম অণু বলে একে সাইট্রোক্রোম সিস্টেমও বলে।

যে ইলেকট্রনগুলি ETS এ প্রবেশ করে তারা প্রথমে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর অংশ হিসাবে থাকে ($e^- + H^+$) এরপর এরা গ্লাইকোলাইসিস (glycolysis) ও ক্রেবস চক্রে (Kreb's cycle) উৎপন্ন NAD^+ এবং FAD দ্বারা অপসারিত হয়। এরপর এই ইলেকট্রনগুলি একের পর এক বাহক দ্বারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং পথে 3 অণু ATP (Adinosine triphosphate) এবং শক্তি উৎপন্ন হয়।

$NADH_2$ জারিত হয়ে হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন মুক্তি পায় এবং তা FAD কে বিজারিত করে $FADH_2$ তৈরী করে।

$FADH_2$ থেকে হাইড্রোজেন (ইলেকট্রনটি) এরপর কো-এনজাইম-ইউবিকুইনোন (Ubiquinone) বা CoQ'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে $CoQH_2$ তৈরী হয়।

এরপরের ধাপ থেকে হাইড্রোজেন অণুর শুধুমাত্র ইলেকট্রন (e^-) অংশটি ETS এ প্রবাহিত হয়। প্রোটন অংশটি অর্থাৎ H^+ কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হয়।

ইলেকট্রনগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন সাইটোক্রোম এনজাইম, তথা cytb , $cytc_1$, cytc, cyta, $cyta_3$ - র মধ্যে দিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি সাইটোক্রোমের হিম প্রস্থেটিক গ্রুপটি (লৌহঘটিত) ইলেকট্রন প্রবাহে সাহায্য করে।

$$Fe^{+++} + e^- \rightleftharpoons Fe^{++}$$

ফেরিক ফেরাস

সবশেষে ইলেকট্রনটি সরাসরি O_2 র সঙ্গে যুক্ত হয়, যা আবার সাইটোক্রোম a_3 (সাইটোক্রোম অক্সিডেজ) দ্বারা বিজারিত হয়ে মুক্তি পেয়ে থাকে। ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সিজেন অণুটি সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং কোষীয় সাইটোপ্লাজমে আগেই মুক্তি পাওয়া হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরী করে।

$$\frac{1}{2}O_2 + 2e^- \longrightarrow O_2^-$$

$$O_2^- + 2H^+ \longrightarrow H_2O$$

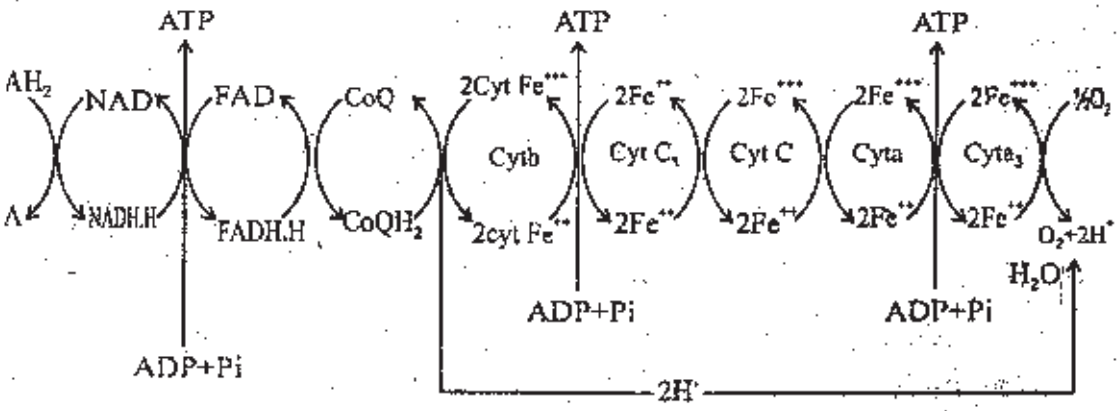

মাইটোকনড্রিয়ায় ইলেকট্রন প্রবাহের রেখাচিত্র

14.3.2 অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (Oxidative Phosphorylation)

খাদ্য ছাড়া জীবজগৎ বেঁচে থাকতে পারেনা। এরা শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় বস্তুনিহিত শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে বৃদ্ধি পায়। এই খাদ্যবস্তুগুলি কলাকোষে জারিত হয়ে শক্তির উন্মোচন ঘটায়। জৈবজারণে উন্মোচিত এই শক্তি ATP উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ফসফেট বন্ধনীর ($-H_2PO_3$) মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অ্যাডিনোসিন ডাই ফসফেটের (ADP) ফসফোরিলেশন ঘটে ATP তৈরী হয়। কোষস্থ এই শক্তির উৎপাদন (ATP) উৎপাদনের মাধ্যমে মাইটোকনড্রিয়ার অন্তঃস্থ পর্দায় শ্বসন শৃঙ্খলের (Respiratory chain) ETS-এ ঘটে থাকে। তাই মাইটোকনড্রিয়ার আর এক নাম কোষের শক্তিঘর। ATP উৎপাদন অবশ্য সালোকসংশ্লেষের (Photo synthesis) সময় অজৈব ফসফেট ADP (ip) র ফটো ফসফোরিলেশনেও তৈরী হয়। শ্বসনে আবার ATP বিজারিত হয়ে ADP এবং প্রয়োজনীয় শক্তি নির্গত হয়।

$$A - P \sim \textcircled{P} \sim \textcircled{P} \longrightarrow A - P \sim \textcircled{P} + ip + \text{শক্তি}$$

উচ্চশক্তির ATP ADP

ফসফোরিলেশন দুধরনের হয়ে থাকে।

I) সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন বা ট্রান্স ফসফোরিলেশন (transphosphorylation) :- এখানে সাবস্ট্রেটের উপরই শ্বসন শৃঙ্খল ব্যতিরেকেই উচ্চক্ষমতার ফসফেট তৈরী হয়। এ ধরনের ফসফোরিলেশনের বৈশিষ্ট্য হল :-

1. ATP তৈরীতে O_2 এর কোন ভূমিকা নেই।
2. শ্বসন শৃঙ্খল অংশগ্রহণ করে না।
3. ডাই-নাইট্রো ফেনলের (dinitro phenol) ভূমিকা থাকে।

উদাহরণ :-

(i) গ্লিসারল ডিহাইড – 3 – PO_4 + Pi + ADP $\xrightarrow{NAD^+}$ ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড + ATP

[গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতি]

(ii) সাকসিনিল CoA + Pi + GTP ⟶ সাকসিনিক অ্যাসিড + CoA + GTP

GTP + ADP ⟶ GDP + ATP [ক্রেবস্ চক্র]

II) রেস্পিরেটরি চেন ফসফোরিলেশন বা অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন :-

এখানে রেসপিরেটরি চেনে ইলেকট্রন (e^-) পরিবহনের সময় এবং হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) প্রতিস্থাপনের দ্বারা জারণের ফলে উচ্চক্ষমতার ফসফেট বন্ধনী যুক্ত 3 অণু ATP তৈরী হয়।

অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন পদ্ধতি (Mechanism of oxydative Phosphorylation) :- 1939-এ অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ইলেকট্রন পরিবহনের সঙ্গে ATP উৎপাদন ঠিক কিভাবে সংযুক্ত (coupled), তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। এ ব্যাপারে তিনটি তত্ত্ব (hypothesis) গৃহীত হয়েছে।

A. কেমিক্যাল কাপলিং হাইপোথেসিস (Chemical Coupling hypothesis) :-

1954 নাগাদ এই তত্ত্বটি প্রকাশ হয়। এখানে X এবং E নামের দুটি কাপলিং ফ্যাক্টর (এনজাইম) ধরে নেওয়া হয় যার প্রতিটি ATP উৎপাদন ধাপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অবশ্য প্রস্তাবনায় তিনটি ATP উৎপাদন ধাপের জন্য আলাদা আলাদা কাপলিং ফ্যাক্টর যথাক্রমে X_1 ও E_1, X_2 ও E_2, এবং X_3 ও E_3 কে ধরা হয়েছে। কাপলিং ফ্যাক্টর X প্রথমে একটি রেসপিরেটরি এনজাইম যেমন সাইটোক্রোম b র সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মধ্যবর্তী রাসায়নিক বন্ধু ($Fe^{+++} \sim X$) তৈরী করে। এরপর রেসপিরেটরি এনজাইমটি উচ্চক্ষমতার অজৈব ফসফেটের (PO_4^-) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে একটি ফসফোরিলেটেড মধ্যবর্তী রাসায়নিক ($X \sim P$) তৈরী করে। এরপর কাপলিং এনজাইম X টি কাপলিং এনজাইম E দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে $E \sim P$ তৈরী হয়। এটিই ADP'র সঙ্গে P কে অনুঘটিত করে ATP তৈরী করে। কাপলিং ফ্যাক্টরের ভূমিকায় এ ধরনের ATP উৎপাদনকে রেডক্স বিক্রিয়াও (Redox Potential) বলে।

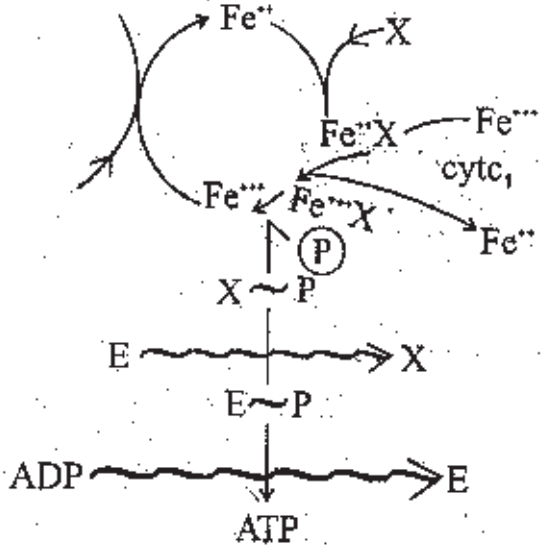

কেমিক্যাল কাপলিং হাইপোথেসিসের রেখাচিত্র (chemical Coupling hypothesis)

মন্তব্য :- বিজ্ঞানীরা কাপলিং ফ্যাক্টর ও উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মধ্যবর্তী রাসায়নিক বস্তুগুলির অস্তিত্ব বহু গবেষণা করেও খুঁজে পাননি। তাই এই তত্ত্বটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়া কোন গুরুত্ব নেই।

B) কেমিঅসমোটিক হাইপোথিসিস (Cheniosmotic hypothesis)

বিজ্ঞানী মিচেল (Mitchell, 1961) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল ইলেকট্রন পরিবহনের (transfer) সময় একটি ইলেকট্রোরাসায়নিক প্রোটন ঘনত্ব (concentration gradient) মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দার বাইরে তৈরী হয়, যা ATP তৈরীতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। তত্ত্বটির নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান গ্রহণযোগ্য রূপটি নিম্নে আলোচিত হল।

1. মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরের পর্দায় অন্ততঃ তিনধরনের প্রবাহ বিরাজিত থাকে - (i) ইলেকট্রন প্রবাহ (Jo) (ii) প্রোটন প্রতিস্থাপন (translocation) (J_H) এবং (iii) ATP উৎপাদন (Jp)।

2. ETS মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরের পর্দায় ঘটে এবং ফসফোরিলেশন মাইটোকনড্রিয়ার F_1 অংশের মস্তক (head piece) অঞ্চলে হয়।

3. ETS এর কয়েকটি ধাপে H^+ আয়ন (প্রোটন) নিম্নলিখিত উপায়ে মূলতঃ তৈরী হয়।

ম্যালেট (Malate) + $NAD^+ \longrightarrow$ অক্সালো অ্যাসিটেট (Oxaloacetate) + NADH + H^+

$CoQ\,H_2$ + 2cytb (Fe^{+++}) $\longrightarrow$ CoQ + 2cytb (Fe^{++}) + $2H^+$

4. উৎপন্ন H^+ ETS'র পরবর্তী ধাপে কাজে লেগে জল তৈরী হয়।

NADH + H^+ + FP $\longrightarrow$ NAD^+ + FPH_2

ccyta$_3$ (Fe^{++}) + $2H^+$ + $\frac{1}{2}O_2$ $\longrightarrow$ 2cyta$_3$ (Fe^{+++}) + H_2O

5. ধরে নেওয়া হয়েছে যে, হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) গ্রহণ, মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরের পর্দায় ঘটে (M-সাইড) এবং H^+ ত্যাগ ঘটনাটি ঘটে মাইটোকনড্রিয়ার বাইরের দিকে (C সাইড)।

6. বাইরের দিকে H^+ এর ঘনত্ব বৃদ্ধি একটি ধনাত্মক প্রোটন ঘনত্বের (Proton concentration gradient) বা membrane potential তৈরী করে। এটি প্রোটনকে জোর করে বাইরের থেকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে ঘনত্বের (gradient) শক্তি থেকেই ATP তৈরী হয়।

7. অন্যদিকে মাইটোকনড্রিয়ার পর্দায় ETS একটি 'প্রোটন পাম্প' (Proton Pump) তৈরী করে যা H^+ (প্রোটন) কে মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের থেকে বাইরে নিয়ে যায়। এই ঘটনাই হল প্রোটন ট্রান্সলোকেশন (J_H)।

8. মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরের পর্দাটি H^+ আয়নকে ঢুকতে দেয়না। এরা মাইটোকনড্রিয়ার পর্দায় অবস্থিত elementary particles বা F_0 - F_1 কণার F_0 অংশের প্রোটন রাস্তা (Channel) দিয়েই

চলাচল করতে পারে। F_1 অংশের ATP এজ স্থানেই ATP উৎপাদন হয়।

9. প্রতি দুটি প্রোটন F_0 - F_1 কণার ভিতর দিয়ে প্রবাহের সময় ADP ও অজৈব ফসফেটের (Pi) সংযোগে এক অণু ATP তৈরী হয়।

10. অবশেষে $2H^+$, $\frac{1}{2}O_2$ র সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরী করে। জল (H_2O) ভেঙ্গে আবার OH^- এবং H^+ তৈরী হয়। মুক্ত OH^- আয়ন H^+ এর সাথে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে। OH^- আয়নের বহিঃপ্রবাহ এবং H^+ আয়নের অন্তঃপ্রবাহ একই অনুপাতে ঘটে থাকে।

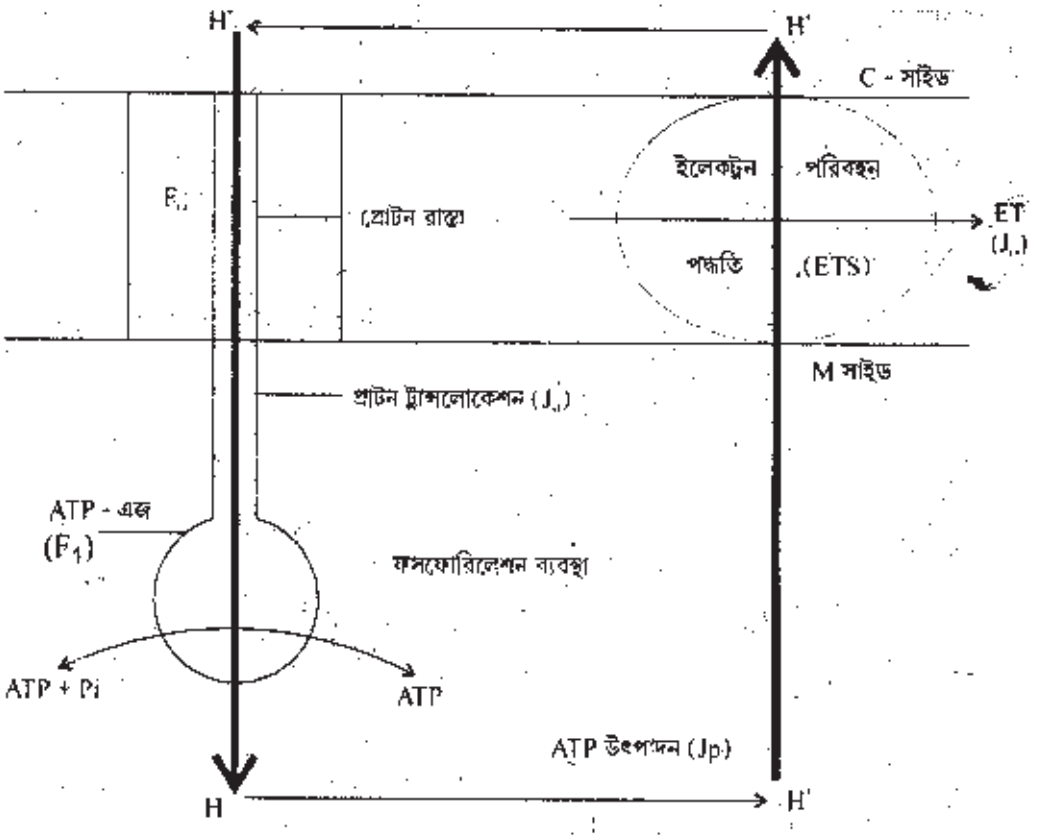

কেমি অসমোটিক তত্ত্ব (chemiosmotic hypothesis)
তিনটি প্রবাহ (J_o, J_H, J_P) (মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের পর্দায়)

C. কনফরমেশনাল কাপলিং তত্ত্ব : (Conformational hypothesis)

এই তত্ত্বের প্রবক্তা বিজ্ঞানী বয়ারস্লেটর (Boyer-Slater, 1974) এই তত্ত্ব অনুযায়ী ATP উৎপাদনে প্রোটনের ভূমিকা কেমিঅসমোটিক তত্ত্বের মত অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটন, F_1 কণার প্রোটন রাস্তার (Proton channel) মধ্যে দিয়ে যাবার সময় প্রোটনের গঠনগত পরিবর্তন (conformational change) ঘটিয়ে দেয়, যে প্রোটনটি আবার ATP উৎপাদনের F_1 কণার active site-এ থাকে। এই স্থানটিতেই ADP এবং অজৈব Pi মিলে কোন রকম মুক্ত শক্তি (free energy) ছাড়াই ATP তৈরী করে।

অবশ্য এই মুক্ত শক্তি পরে F_1 কণায় শক্তভাবে আবদ্ধ ATP কে বাইরে আসতে সাহায্য করে। মুক্ত শক্তি বা H^+, F_1 কণার ATP এজের গঠনগত পরিবর্তন করে ATPকে মুক্ত করে।

1. $ADP + Pi \longrightarrow ATP$ (on active site of F_1)
2. Proton F_1-র সঙ্গে যুক্ত $\longrightarrow$ F_1-র গঠনগত পরিবর্তন $\longrightarrow$ ATP'র মুক্তি।

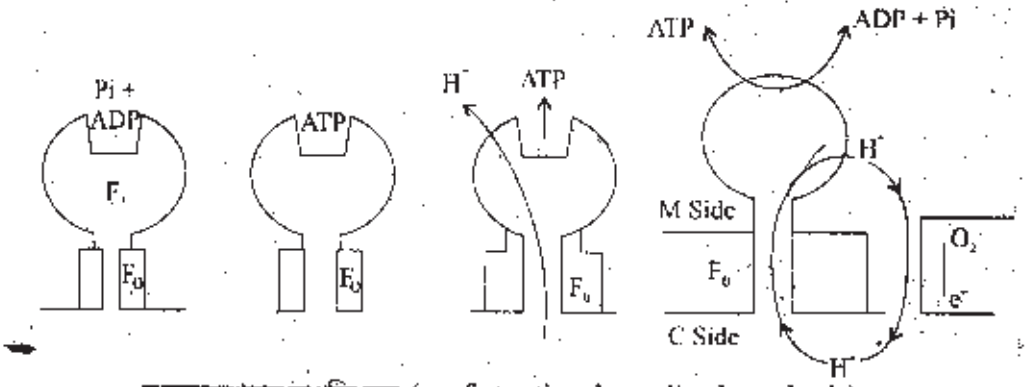

কনফরমেশনাল কাপলিং তত্ত্ব (conformational coupling hypothesis)

14.4 সারাংশ

ট্রান্সফসফোরিলেশন (Transphosphorylation) এবং অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (Oxidative Phosphorylation) উভয়ে মিলে এক অণু গ্লুকোজকে সম্পূর্ণ জৈব জারিত (Biological Oxidation) করে মোট 38 অণু ATP এবং জল (H_2O) ও কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) তৈরী করে।

এই ঘটনাগুলি মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় ঘটে থাকে। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট এবং অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন (ATP উৎপাদন) একই সঙ্গে ঘটে এবংএরা একে অন্যের পরিপূরক। ইলেকট্রন প্রবাহের মাত্রা, অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশনে ADP সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রিত হয়।

শ্বসন (Respiration) একটি জারণ - বিজারণ ঘটনা যেখানে শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট জৈবজারিত হয়ে H_2O ও CO_2 তৈরী হয়। শ্বসনে এই জৈবজারণ (Biological Oxidation) যে শক্তি উৎপন্ন করে তা আলো বা তাপ উৎপন্ন না করে ATP অণুর মধ্যে জমা করে রাখে।

14.5 প্রশ্নাবলী

14.5.1 দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন :-

1) সংক্ষেপে জৈব জারণের সংজ্ঞা কী?

2) জৈবজারণে কার্যকরী কয়েকটি উৎসেচকের নাম কী কী?

3) ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল মাইটোকন্ড্রিয়ায় কোথায় সংঘটিত হয়?

4) ATP র সম্পূর্ণ নাম কী ?

5) অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন পদ্ধতির তত্ত্বগুলি কী কী?

14.5.2 শূন্যস্থান পূরণ করুন :-

(a) মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের _____ বলে।

(b) সাইটোক্রোম হল লৌহঘটিত _____।

(c) জৈবজ্বারণে অংশগ্রহণকারী একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ হল _____।

(d) গ্লাইকোলিসিস পদ্ধতি _____ এর একটি উদাহরণ।

(e) কেমিঅসমোটিক হাইপোথেসিস এর প্রবক্তা বিজ্ঞানী _____।

14.5.3 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী :-

(a) জৈবজ্বারণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উৎসেচকের কার্যাবলীর ব্যাখ্যা করুন।

(b) রেখাচিত্র সহযোগে ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খল বা শ্বসন শৃঙ্খল পদ্ধতিটির বিবরণ দিন।

(c) বিভিন্ন তত্ত্ব ((hypothesis) সহযোগে (Oxydative phosphorylation) পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

14.5.4 টীকা লিখুন :-

(i) ডি-হাইড্রোজিনেজ (dehydrogenase)

(ii) কেমিঅসমোটিক হাইপোথেসিস (chemiosmotic hypothesis)

(iii) ফসফোরিলেশন কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

14.6 উত্তরমালা

14.6.1 a. 14.3 (1st Para) দ্রষ্টব্য

b. অক্সিডেজেস, ডি-হাইড্রোজিনেজ, অক্সিজিনেজ।

c. মাইটোকনড্রিয়াস্থিত ক্রিষ্টিতে (cristae)

d. Adinosine-tri-phosphate

e. কেমিক্যাল কাপলিং (Chemical Coupling), কেমিঅসমোটিক (Chemiosmotic) এবং কনফরমেশনাল কাপলিং (Conformational Coupling) তত্ত্ব।

14.6.2 a. শক্তিঘর

b. হিমো প্রোটিন

c. কো এনজাইম ((e)Co enzyme)

d. ট্রান্সফসফোরিলেশন (Transphosphorylation)

e. মিচেল (Mitchell)

14.6.3 3.(a) 14.3 দ্রষ্টব্য

(b) 14.3.1 দ্রষ্টব্য

(c) 14.3.2 দ্রষ্টব্য

14.6.4 (d) (i) 14.3. দ্রষ্টব্য

(ii) 14.3.2 II B দ্রষ্টব্য

(iii) 14.3.2 I & 14.3.2.II দ্রষ্টব্য